ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

সাধারন নির্বাচিত পাঠ - **৩০১**

GE-301

Women's History in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

<u>বিষয় সমিতিঃ</u>

১) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ জুন ২০২৩ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.06.2023

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

Syllabus

GE-301: Women's History in India

BLOCK 1: Different approaches

Unit-1: Liberal, Marxist, psychoanalytical, socialist, existential, radical, post-modern approaches.

Unit-2: Sources: archival and governmental files, official reports, census, private papers, etc.

Unit-3: Non-archival sources: sacred and non-sacred texts, epigraphs, diaries, memories, autobiography, fiction, songs, folklore, photographs, paintings, oral evidence.

BLOCK 2: Religion and women

Unit-4: Manusmriti and the status of women in a Brahaminical society.

Unit-5: Non-Brahmanical religions and women's question, Buddhism and women.

Unit-6: Status of women in Islam and Christianity.

Unit-7: Women leaders in Vaishnavism, Brahmo Movement and emergence of the bhadramohila in the society of Bengal

Block-3 : Portrayal of women

Unit-8 : Portrayal of women in literary and communicative media and their participation.

Unit-9: Autobiographies and biographies of some leading women in the nineteenth and twentieth century.

Unit-10: Changing faces of Indian women portrayed in different Indian films in modern times.

BLOCK 4: Education of women in 19th and 20th century India

Unit-11: Role of the Christian Missionaries.

Unit-12: Indian and European philanthropists - other voluntary efforts.

BLOCK 5: Women's participation in social and political movements in modem India

Unit-13: Movement against the colonial rulers – Peasant and labour movements- social activism.

Unit-14: Role of the Mahila Atmaraksha Samiti (MARS) and the Communist party & Environmental movements.

BLOCK 6: Customary and legal status of women in different stages of Indian history

Unit-15: Social and marital customs prevalent in both Hindu and Muslim Communities.

Unit-16: changing legal status of Indian women in the professional world status of women in tribal societies of India.

ACKNOWLEDGEMENT

Unit-1: Liberal, Marxist, psychoanalytical, socialist, existential, radical, post-modern approaches		
Unit-2: Sources: archival and governmental files, official reports, census, private papers, etc.		
Unit-3: Non-archival sources: sacred and non-sacred texts, epigraphs, diaries, memories, autobiography, fiction, songs, folklore, photographs, paintings, oral evidence.		
Unit-4: Manusmriti and the status of women in a Brahaminical society.		
Unit-5: Non-Brahmanical religions and women's question, Buddhism and women.		
Unit-6: Status of women in Islam and Christianity.		
Unit-7: Women leaders in Vaishnavism, Brahmo Movement and emergence of the bhadramohila in the society of Bengal		
Unit-8 : Portrayal of women in literary and communicative media and their participation.		
Unit-9: Autobiographies and biographies of some leading women in the nineteenth and twentieth century.		
Unit-10: Changing faces of Indian women portrayed in different Indian films in modern times.		
Unit-11: Role of the Christian Missionaries.		
Unit-12: Indian and European philanthropists - other voluntary efforts.		
Unit-13: Movement against the colonial rulers – Peasant and labour		

movements- social activism.		
Unit-14: Role of the Mahila Atmaraksha Samiti (MARS) and the Communist party & Environmental movements.		
Unit-15: Social and marital customs prevalent in both Hindu and Muslim Communities.		
Unit-16: changing legal status of Indian women in the professional world status of women in tribal societies of India.		

পর্যায় গ্রন্থ - ১

SURVEY OF APPROACHES AND SOURCES

একক - ১

নারীবাদের তত্ত্ব অথবা নারীবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব

বিন্যাসক্রম ঃ

৭.১.১.০ ঃউদ্দেশ্য

৭.১.১.১ ঃউদারতান্ত্রিক নারীবাদ

৭.১.১.২ ঃমার্কস এবং ডুয়াল সিস্টেম্‌স্‌ তত্ত্ব

৭.১.১.৩ ঃউত্তর আধুনিকতাবাদ ও নারীবাদ

৭.১.১.৪ ঃসহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.১.১.৫ ঃসম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১) উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব, নানা বৈশিষ্ট্য এবং নারীবাদী আন্দোলনে এর গুরুত্ব।

২) সমাজতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি কেন্দ্রিয় আমূল সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিকাল নারীবাদীগণ কর্তৃক উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব সমালোচনার প্রকৃতি বা ধরন-ধারণ।

৩) উদারতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট।

৪) মার্কসীয় নারীবাদের ডুয়াল সিস্টেমস্ তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

৫) মার্কসীয় নারীবাদ ও ধ্রুপদী মার্কসবাদ ও মার্কসীয় নারীবাদের পার্থক্য।

৭.১.১.১ ঃ উদারতান্ত্রিক নারীবাদ (Liberal Feminism)

উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারতান্ত্রিক নারীবাদের বা Liberal Feminist দের কাছে সমাজে নারীদের অবস্থানের প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একটি রাজনৈতিক দর্শন রূপে liberalism বা উদারতন্ত্রবাদের কয়েকজন প্রবক্তা ছিলেন থমাস্ হব্‌স্ (Thomas Hobbes), জন লক (John Locke), জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) এবং জেমস স্টুয়ার্ট মিল (James Stuart Mill)। হব্‌স্ ও লক উভয়েই এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন যে Civil Society তথা নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ হচ্ছে এমন একটি ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল যেখানে জনগণ ব্যক্তিগত রূপে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তাদের অধিকারসমূহের স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

তাঁরা মনে করতেন যে নাগরিক সভ্যসমাজ (Civil Society) ও রাষ্ট্রের (State) উদ্ভবের পূর্বে মানুষ একটি প্রকৃতির রাজ্যে বা 'State of Nature' -এ বাস করত। তাদের জীবন সম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধানার্থে মানুষই একটি সামাজিক চুক্তি বা Social Contract দ্বারা স্বেচ্ছায় নাগরিক সভ্য সমাজ (Civil Society) ও রাষ্ট্র (State) প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যই তারা তাদের কিছু অধিকারসমূহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে প্রচার করেন। অ্যাডাম স্মিথের মতে যদি ব্যক্তিগত সুখ (individual happiness) বৃদ্ধি পায় তাহলে সামগ্রিক সামাজিক সুখও (total societal happiness) বৃদ্ধি পাবে। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যখন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্বাধিকতম ব্যক্তিগত লাভ (maximum private profit) -এর জন্য বিনিয়োগ করবার অধিকার পাবেন। এইরূপে দেখা যায় যে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রবাদের / পুঁজিবাদের (Capitalism) উত্থানের সঙ্গে একই সঙ্গে রাজনৈতিক উদারতন্ত্রবাদেরও (Political Liberalism) উত্থান ঘটেছিল। Feminist Theorist বা নারীদের তাত্ত্বিক হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন, প্রায়ই একথা বলা হয় যে ধনতন্ত্রবাদের উত্থানের সঙ্গে উদারতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দর্শনের (Liberal Political

Philosophy) উদ্ভবসমূহ সংশ্লিষ্ট, যাতে করে স্বশাসন (autonomy) ও স্ব-উন্নয়ন (self-improvement) এর ধারণাসমূহ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্পত্তির স্বার্থসমূহের (property interests) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত হতে পারে।

ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারতন্ত্রবাদের প্রেক্ষাপটে উদারতান্ত্রিক নারীবাদ বা Liberal Feminism -এর আবির্ভাব হয়। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত স্বাভাবিক যুক্তির আলোকের সার্বিক কর্তৃত্বের ধারণা গ্রহণ করে, যার দ্বারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তি হিসাবে মানুষ কোনরূপ বহির্বিষয়ক কর্তৃত্ব / কর্তৃপক্ষর (External Authority) সহায়তা ব্যতীত বিশ্বজনীন নিরপেক্ষ পক্ষপাতহীন অখণ্ডনীয় বিচার-বিশ্লেষণে উপনীত হতে পারে। উদারতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের নারীপুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার থাকা উচিত। উক্ত মতানুযায়ী নারীদের ভোটাধিকার, তাদের স্বামীদের ন্যায় সমান আইনগত অধিকার, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হবার অধিকার থাকা উচিত।

এছাড়া উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা আবহমান কাল ধরে নারীদের স্বাভাবিক স্থানরূপে ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য-কেন্দ্রিক পরিমণ্ডলের (private domestic sphere) মধ্যে অবনত করে রাখবার প্রবণতারও সমালোচনা করেন। হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন সার্বজনীন বা সর্বসাধারণের পরিমণ্ডল ও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের ধারণাকে (The concept of public and private sphere) ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিসীমা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের বা সার্বজনীন পরিমণ্ডল (public sphere) অর্থে সামাজিক জীবনযাত্রা (social life) কে বোঝানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বৈধ; অপরদিকে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল (private sphere) বলতে বিমূর্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের (abstract individulism) জগৎকে বোঝায় - যেখানে 'man' বা মানুষ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এখানে 'man' বা মানুষ প্রতিশব্দ / সংজ্ঞাটি সুস্পষ্টভাবে লিঙ্গকেন্দ্রিক করা হয়েছে। এর কারণ সাধারণতঃ পুরুষকে তার বিভিন্ন দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অক্ষমতা, কর্তব্যে অবহেলা বা অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (social interaction) দৃষ্টান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। অপরদিকে নারীকে প্রকৃতিগতভাবে গৃহকোণের গণ্ডীর মধ্যে ও মানব প্রকৃতির (human nature) অযৌক্তিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বলে ধরে নেওয়া হয় যার সঙ্গে সন্তান প্রতিপালন ও আবেগের বিষয়টি জড়িত।

উনবিংশ শতকের একজন নারীবাদী মেরী ওলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের একজন প্রবক্তা ছিলেন। তিনি এমন একটি অপরিহার্য মানবিক প্রকৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত ও যা নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশ্বজনীন (Universal) প্রকৃত যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। ওলস্টোনক্র্যাফটের মতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমাজে স্বাভাবিক অধিকারসমূহ রয়েছে। তাঁর 'A Vindication of the Right of Women' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত নারীরা ভোটাধিকার না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র হতে পারেনা।

এছাড়া ওলস্টোনক্র্যাফট সর্বসাধারণের পরিমণ্ডলের বাইরে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের মধ্যে নারীদের আবদ্ধ করে রাখবার প্রবণতারও নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে নারীর প্রকৃত মর্যাদা কেবলমাত্র শিক্ষালাভের মাধ্যমে ও গৃহকোণের গণ্ডীর বাইরে সর্বসাধারণের কাজের মধ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে আসতে পারে। ফ্রান্সেস রাইট (Frances Wright) উনবিংশ শতকের নারীবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সত্যে উপনীত হবার জন্য নারীদের যুক্তিবাদ ও সমালোচনামূলক চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেন। রাইটের মতে ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীদের অবদমিত করে রাখবার জন্য তৈরী করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর আরেকজন নারীবাদী সারা গ্রিমকে (Sarah Grimke) এই মত প্রকাশ করেছেন যে নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের সমানাধিকার লাভ করা ছাড়াও সামাজিক পরিবর্তন সমূহ আনয়নেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; এর কারণ পুরুষগণ একটি শ্রেণীরূপে নারীদেরও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে নিজেদের অধীনস্থ করে রেখেছে। এছাড়া গ্রিমকে নারীদের ভোটাধিকারেরও একজন প্রবক্তা ছিলেন ও মনে করতেন যে নারীগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বকরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও কর প্রদানজনিত বাধ্যবাধকতার শিকার। তিনি আরও মনে করতেন যে নারীদের পুরুষদের সমতুল কাজের জন্য সমতুল বেতন পাওয়া উচিত এবং তাদের বৌদ্ধিক ও সমালোচনামূলক দক্ষতার বৃদ্ধিকরণের জন্য যথাযথ শিক্ষালাভের অধিকার পাওয়া উচিত। এছাড়া তিনি নারীদের গৃহকোণের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবার প্রবণতারও সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ডোনাভ্যান (Donavan) লিখেছেন যে নারী ও পুরুষদের যথাক্রমে সর্বসাধারণের পরিমণ্ডল (Public Spheres) ও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের (Private Spheres) মধ্যে সমর্পণের বিষয়টি গ্রিমকের মতে একটি স্বেচ্ছাচারমূলক প্রথা (arbitrary matter of custom), এর কারণ যেহেতু নারী ও পুরুষ নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে সমতুল (moral and intellectual equals), সেহেতু তাদের সমতুল অধিকার ও দায়িত্বসমূহ থাকা উচিত।

এলিজাবেথ কেডী স্ট্যানটন (Elizabeth Cady Stanton) নামক উনবিংশ শতকের একজন আমেরিকান নারীবাদী মত প্রকাশ করেছেন যে নারীদের ভোটাধিকার তাদের স্বাভাবিক অধিকার। তিনি নারীদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ভোটাধিকারহীন নারীরা প্রতিনিধিত্বকরণের সুযোগ ব্যতীত বাধ্যতামূলক করপ্রদান (taxation without representation) জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়া তিনিও নারীদের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখবার প্রবণতার সমালোচনা করেছেড়। এই প্রসঙ্গে ডোনাভ্যান (Donavan) বলেছেন যে স্ট্যানটনের (Stanton) উদারনৈতিক নারীবাদের মূল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হচ্ছে এই যে ব্যক্তি হিসাবে নারীদের তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার অর্থাৎ স্ব-নির্ভর হবার জন্য অধিকার লাভ করা আবশ্যক। তিনি চেয়েছিলেন যে নারীদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারসমূহ দেওয়া হোক যাতে তারা নিজেরাই তাদের নিজের সম্পত্তি, সন্তানদের ও বাড়ীঘর দেখাশোনা করতে পারে। লক (Locke) এর দার্শনিক ঐতিহ্যানুসারী স্ট্যানটন সরকারকে (পুরুষতান্ত্রিক) স্বৈরতন্ত্রের (tyranny) বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকর্তা রূপে দেখেছিলেন যা ব্যক্তিগত রূপে নারীদের স্বাধীনভাবে কার্যকলাপের অধিকার প্রদানপূর্বক তাদের স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করতে দেবে। স্ট্যানটনের অচলায়তন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের

উদাহরণস্বরূপ ১৮৫১ সালের সম্মেলনে প্রেরিত তার একটি পত্রের কথা বলা যায় যেখানে তিনি মেয়েদের সাহসিকতার ও স্বানির্ভরতার সঙ্গে শিক্ষা প্রদানের বিষয়টির উল্লেখ করেছেন ও তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল নারীদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য (solitude of self)। নারীদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য (solitude of self) সম্পর্কে তিনি তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন (isolated) সুতরাং একজন নারীর নিজের দায়িত্ব নিতে শেখা উচিত। স্ট্যানটন সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন যে প্রত্যেক মানবিক সত্তার (human soul) ব্যক্তিত্ব, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের আদর্শ, ব্যক্তিগত বিবেক ও বিচার বিশ্লেষণের অধিকারের (the right of individual conscience and judgment) মধ্যে আংশিকভাবে নিহিত।

আর একজন উনবিংশ শতকের নারীবাদী সুজান বি. অ্যান্থনী (Susan B. Anthony) এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে নারীদের স্বাভাবিক ভোটাধিকার থাকা উচিত যা লিঙ্গকেন্দ্রিক অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক কতিপয় ব্যক্তিভিত্তিক একচেটিয়া শাসনতন্ত্রের (oligarchy of sex) এবং নারীদের দাসত্বজনিত পরিস্থিতির অবসান ঘটাবে। আর একজন উদারতান্ত্রিক দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) সমাজে নারীদের অধঃস্তন মূলক / অধীনতা মূলক অবস্থানের (subordinate position) অবসান ঘটানোর জন্য নারীদের আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি নারীদের প্রকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (women's nature) যেমন স্নায়বিক দুর্বলতা (nervousness)। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক অনুভূতি প্রবণতা / অনুমান প্রবণতা (intuitive), প্রণয়োদ্দীপক প্রবণতা (amatory propensities) প্রভৃতির দরুন পুরুষদের থেকে হীনতর (inferior) বলে ধরে নেবার কোন কারণ নেই বলেছেন। এর কারণ কিছু পুরুষদের মধ্যেও উক্ত প্রবণতাসমূহ বিদ্যমান। মিলের মতে সমাজে নারীদের অধীনতামূলক অবস্থান কোনরূপ স্বাভাবিক কারণসমূহের পরিবর্তে সামাজিক প্রথা ও আইনগত পদ্ধতির দরুন হয়েছে। তিনি বলেছেন যে পুরুষেরা নারীদের অধীনস্থ করে রাখবার জন্য তাদের শিক্ষালাভের অধিকার ও সমতুল রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকারসমূহ প্রদান করেনি যার দরুন তাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিবাহিত জীবন যাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা ও তারা নিজের পছন্দমত পথে চলতে / যেতে পারে না।

মিল বলেছেন প্রথম বর্তমান পদ্ধতির অনুকূলে মতামত বা অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর লিঙ্গ (weaker sex) অর্থাৎ নারীদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লিঙ্গ (stronger sex) অর্থাৎ পুরুষদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ করে রাখে, তা কেবলমাত্র তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল, কারণ সেগুলির কোনটিরই কোনরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়নি। সুতরাং উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিহীন তথাকথিত অনুমান-নির্ভর অভিজ্ঞতা যা সেই অর্থে চূড়ান্তভাবে তত্ত্ব-বিরোধী, তার কোনরূপ বিচারের রায় দেবার অধিকার নেই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত অসংগতার নীতি গ্রহণের বিষয়টি কোনরূপ সুচিন্তিত মতামত বা পূর্বচিন্তা বা কোনরূপ সামাজিক মতাদর্শ বা কোনরূপ ধ্যানধারণা যা মানবতার কল্যাণে বা সমাজের শৃঙ্খলার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে তার ফলাফল কখনই ছিলনা। এর উদ্ভব কেবলমাত্র এই কারণে হয়েছিল যে সমাজব্যবস্থার উষালগ্ন থেকে প্রত্যেক নারীই পুরুষসৃষ্ট মূল্যবোধ তার উপর আরোপিত হবার দরুন ও পুরুষের শারীরিক শক্তির তুলনায় তার হীনতার কারণে কোন না কোন পুরুষের নিকট দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং আইনশাস্ত্র ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সূচনা সর্বদাই নারীপুরুষের মধ্যে ইতোমধ্যেই বিদ্যমান উক্ত পূর্ব আরোপিত পারস্পরিক সম্পর্কের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঘটতো। সেগুলি কেবলমাত্র একটি জৈবিক ও শারীরিক সত্যকে আনিগত অধিকারে রূপান্তরিত

করে সমাজের অনুমোদন দিত এবং সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে সামাজিক অনুশাসনহীন অনিয়মিত শারীরিক শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নারীর উপর পুরুষের অধিকারকে কেন্দ্র করে ঘটতো, তার পরিবর্তে নারীর উপর পুরুষের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার ও সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও সংগঠিত সামাজিক অনুশাসন উদ্ভাবনেই মূলতঃ লক্ষ্যায়িত হত। ইতোমধ্যেই যে সকল নারীরা পুরুষের বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হয়েছিল, তারা উক্ত সামাজিক অনুশাসন উদ্ভাবনের দরুন তা মানতে বাধ্য হয়েছে।

নারীদের আইনগত সমতার সমর্থনে মিল এই হিতবাদী বা ইউটিলিটারিয়ান্ (Utilitarian) বক্তব্য ব্যবহার করেছিলেন যে একটি প্রক্রিয়াকে তার বিকল্পের উপর স্থান দিয়ে তখনই বাছাই করা উচিৎ যদি তার ফলাফল সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের জন্য সর্বাধিকতম কল্যাণ (greatest good of the greatest number) আনয়ন করে। উক্ত মতানুযায়ী মিলের মতে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আইনগত সমতার আসনে অধিষ্ঠিত করার অর্থ ছিল সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের জন্য সর্বাধিকতম কল্যাণ সাধন।

মিল বলেছেন নারীদের যা কিছু পরিষেবাই সর্বাপেক্ষা কাম্য হোক না কেন, অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে তা উন্মুক্ত করাই তাদের উক্ত কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উদ্দীপনামূলক / উৎসাহদায়ক হবে। যে সকল কাজের জন্য তারা সর্বাপেক্ষা যোগ্য, সেই সকল ক্ষেত্রেই তারা সর্বাপেক্ষা আকাঙ্খিত। উপরোক্ত কাজের অংশ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবার মাধ্যমেই, সামগ্রিকভাবে নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌথ কর্মশক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে মূল্যবান ফলাফলের জন্য প্রয়োগ করা যাবে।

এছাড়া মিল আরও বলেছেন যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই আধুনিক সমাজে রাজতন্ত্র অথবা ঈশ্বরের প্রভাব ব্যতীত যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, সেহেতু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের নিজ নিজ পেশা বেছে নেবার অথবা সাংসদীয় প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করবার অধিকার থাকা উচিত। যেহেতু নারীও একজন ব্যক্তি (person) সুতরাং তারও সংসদে নিজ পছন্দমত প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। সর্বোপরি মিল নারীদের শিক্ষালাভের অধিকার দিয়েও পুরুষদের নিকট রাজনৈতিক ও আইনগত ভাবে অধীনস্থ করে রাখবার প্রবণতার অসারতার দিকে আমাদের দৃষ্টি নির্দেশ করেছেন।

Criticism of Liberal Feminism by Socialist and Radical Feminists সমাজতান্ত্রিক (Socialist) এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) নারীবাদীগণ কর্তৃক উদারতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি কেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) নারীবাদীগণ কর্তৃক উদারতান্ত্রিক নারীবাদের সমালোচনা (Criticism of Liberal Feminism by Socialist and Radical Feminists) তুলে ধরা হচ্ছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) এবং সমাজতান্ত্রিক (Socialist) নারীবাদীরা উদারতান্ত্রিক নারীবাদীদের নারীদের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের পরিমণ্ডল (public sphere) এবং ব্যক্তিগত তথা গৃহকোণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ পরিমণ্ডল (private sphere) – এই দুই বিপরীতধর্মী শ্রেণীকেন্দ্রিক (dichotomy) পরিমণ্ডলের বিষয়টি ধরে রাখবার এই কারণে সমালোচনা করেছেন যে এর দরুন ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রটি সামগ্রিক পরিবর্তনকামী তাত্ত্বিক সুবিবেচনার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন যে বিষয়টি ধ্রুপদী উদারতান্ত্রিক নারীবাদী (Classical Liberal Feminists) এবং সমাজতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী নারীবাদীদের (Socialist and Radical Feminists) মধ্যে অবধারিত

বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিল - তা হচ্ছে অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের ধারণাটি। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বিষয়টি তাদের বিবাহকেন্দ্রিক ধর্ষণ অর্থাৎ বিবাহিতা নারীদের সম্মতিব্যতীত স্বামীকর্তৃক যৌনমিলনে বাধ্যতাকরণের (marital rape) এবং গার্হস্থ্য হিংসার (domestic violence) ন্যায় সমস্যাবলীসহ গৃহকেন্দ্রিক পরিবেশে নারীদের অস্তিত্বের প্রশ্নটির কোনরূপ সামগ্রিক পরিবর্তনকামী তাত্ত্বিক সুবিবেচনার আওতার বাইরে রাখছে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেটী ফ্রীডেন্ (Betty Freiden) -এর ন্যায় নারীবাদী সমালোচকগণ লিঙ্গকেন্দ্রিক এবং যৌনতাকেন্দ্রীক অসমতার (Gender and sexual inequality) বিষয়টি সম্মুখে আনয়ন করবার জন্য নারীদের গার্হস্থ্য জীবন ও যৌনজীবনের (domestic and sexual lives) চাপা উত্তেজনার বিষয়গুলি (tensions) প্রদর্শনের পক্ষপাতী। যাইহোক কতদূর পর্যন্ত উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা ব্যক্তি হিসাবে নারীদের ব্যক্তিগত সামাজিক পছন্দ / যৌনতাকেন্দ্রিক পছন্দর (private social / sexual choices) ক্ষেত্রে উঁকিঝুঁকি মারবে বা অন্যায় কৌতূহল দেখাবে তার একটি সীমা রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতির দরুন (commitment) অশ্লীলরচনা / চিত্র (pornography) প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোনরূপ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এছাড়া যেহেতু উদারতান্ত্রিক নারীবাদ মুক্ত বাজার (free market) এর উদারতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধ্যানধারণাপ্রসূত, সুতরাং তা বহু নারীর নিকট চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যাদের নিকট অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ সফলতাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। হোয়েলহ্যান (whelehan) বলেছেন, জনগণের জীবনযাত্রার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে উদারতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যা বহুল বলে প্রমাণিত হয়, এর কারণ যেহেতু বহু নারীর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উক্ত পরিষেবার কোনরূপ সংকোচন . হ্রাসমানতার অর্থ ছিল তাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ডর অবনতি। এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকারের প্রতি আবেদন রাখার সাথে সাথে উক্ত অধিকারের স্বীকৃতি ক্রমাগত বিঘ্নিত করার বিষয়ে নারীপুরুষের জৈবিক পার্থক্যসমূহ থেকে আহরিত পুরুষের আধিপত্যবাদী ভূমিকা প্রকটিত করবার প্রচেষ্ঠায় ও একইসাথে রত ছিল।

সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক (socialist) ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (র‍্যাডিকাল / Radical) নারীবাদীরা নির্দেশ করেছেন যে যেহেতু উদারতান্ত্রিক নারীবাদ উদারতন্ত্রবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যা ধনতন্ত্রবাদ / পুঁজিবাদকে সমর্থন করে; যেহেতু উদারতান্ত্রিক নারীবাদ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে ধাবিত হয় এবং কোনরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহ আনয়ন করবার প্রচেষ্টায় রত হয়না। হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন যে যেহেতু উদারতন্ত্রবাদীরা সর্বদাই ব্যক্তি হিসাবে মানুষের আত্ম-উন্নয়নের / স্বীয় অগ্রগতির (self-advancement) অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করেছে, সুতরাং উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা সাধারণত দৃঢ়ভাবে বলে থাকে যদি নারীরা পুরুষ নাগরিকদের ন্যায় সমান সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা ও অবস্থান লাভ করে সেক্ষেত্রে প্রতিভাতন্ত্র (meritocracy) অর্থাৎ নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিভার ভিত্তিতে বাছাই করার বিষয়টিকে লিঙ্গকেন্দ্রিক বলা যায়না। অপরিহার্যরূপে ফ্রীডেন (Freiden) এর রচনায় দেখানো হয়েছে যে উদারতান্ত্রিক নারীবাদ মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের প্রয়োজনীয়তাকেন্দ্রিক এবং সম্ভবত নারীদের স্বীয় অগ্রগতির (self-advancement) পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ শ্রেণীগত অথবা জাতিগত পার্থক্যকে

স্বীকার করবে না।

৭.১.১.২ ঃ মার্কস এবং ডুয়াল সিস্টেম্‌স্‌ তত্ত্ব (Marx and the Dual Systems Theory)

কার্ল মার্কস -এর মতে যে মৌলিক পদ্ধতিতে মানুষ (human) তার মানবিক প্রকৃতির (non-human nature) সঙ্গে সম্পর্কিত তা হচ্ছে খাদ্য (food) এবং আশ্রয় (shelter) এর ন্যায় অপরিহার্য্য বস্তুগুলির উৎপাদনের মাধ্যমে। যে কোন সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি (production system) উক্ত সমাজের অর্থনৈতিক অথবা বস্তুগত ভিত্তি (material base) অথবা পরিকাঠামো (structure) গঠন করে। প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনের জন্য মানুষ প্রকৃতির (nature) সহিত বোঝাপড়া করে প্রকৃতপক্ষে একে অপরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে (social relations) নিয়োজিত হয়ে উৎপাদনের সম্পর্ক (the relations of production) গঠন করে। উক্ত উৎপাদনের সম্পর্ক (the relation of production) আবার একটি সমাজের অ-পার্থিব / অ-বস্তুগত ভিত্তি (non-material base) গঠন করে যার উপর একটি নির্দিষ্ট সমাজের রাজনৈতিক - আইনগত পদ্ধতি (politicolegal system) মতাদর্শ (ideology), দর্শন (philosophy), ধর্ম (religion) এবং সংস্কৃতি (culture) নিয়ে গঠিত সামগ্রিক উপরিকাঠামো (the entire super-structure) নির্ভরশীল।

মার্কস -এর মতে ইতিহাসের গতি সমাজের পরিকাঠামো (structure) এবং উপরিকাঠামোর (super structure) মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য (contradictions) দ্বারা আবর্তিত হয়। মার্কস মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগ বা পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এর প্রথম পর্যায় বা যুগ ছিল শিকার এবং ফলমূল আহরণের (hunting and gathering) আদিম পর্যায়ে (primitive stage), যখন উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রণালী (modes of production) সামাজিক মালিকানার (socially owned) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর নূতন শক্তিসমূহ (new forces) বা উৎপাদনের উপকরণসমূহের (tools of production) আবিষ্কারের সঙ্গে উৎপাদন (production) এবং উৎপাদনের সম্পর্কের (relations of production) মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য (contradictions) দেখা দেয় যার ফলে কৃষিজ উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রণালীর উদ্ভব হয়, যেখানে মানুষ ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনের মাধ্যমে মূলত কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করত। সুতরাং সেখানে অনুরূপ উৎপাদনের সম্পর্ক (relations of production) বিকশিত হয়। মার্কস এর মতে ইতিহাসের পরবর্তী দুটি পর্যায় হল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (feudal mode of production) এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (capitalist mode of production) । উৎপাদন পদ্ধতির প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে যারা উৎপাদনের উপকরণকে (means of production) নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা করে না, তার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাজন (class division) ছিল। পুরাতন সমাজব্যবস্থা থেকে শ্রেণী সংগ্রামের (class struggle) মাধ্যমে একটি নূতন সমাজের জন্ম হয় যেখানে উৎপাদন পদ্ধতির (system production) নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি নূতন শ্রেণী উৎপাদন পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ অধিকার করে।

মার্কস এর মতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি (capitalist systems) হচ্ছে প্রথম উৎপাদন পদ্ধতি যেখানে

পণ্যদ্রব্যসমূহ (commodities), শ্রমের মজুরী (wage labour), পণ্যের ব্যবহারমূল্য এবং বিনিময় মূল্যের স্বতন্ত্রীকরণ (the separation of use value and exchange value) এবং ব্যবহার মূল্যের (use value) উপরে বিনিময় মূল্যের (exchange value) অগ্রাধিকার – প্রভৃতির উদ্ভব দেখা যায়। মার্কস বলেছেন একটি বস্তু তখনই পণ্যদ্রব্যে (commodity) রূপান্তরিত হয় যখন তাকে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনা হয়। প্রত্যেকটি পণ্যদ্রব্যের ব্যবহারমূল্য (use value) আছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন একজনের কাছে টেবিলের ব্যবহারমূল্য (use value) তার বইগুলি রাখবার জন্য রয়েছে, এছাড়া এর একটি বিনিময়মূল্য (exchange value) ও আছে – যার মূল্য অর্থ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মার্কস এর মতে পুঁজি গঠনের (capitalist accumulation) স্ব-উৎপাদনশীল প্রকৃতির চাবিকাঠি সর্বহারার শ্রম (proletariate labour) থেকে অতিরিক্ত শ্রমসময় (extra labour time), যা মজুরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে বলপূর্বক ধার করে শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value of labour), যা সঞ্চিত হতে থাকে এবং যাকে পুঁজিপতি (capitalist) আরও অধিক লাভের জন্য অন্যত্র বিনিয়োগ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন পুঁজিপতি যে ঝুড়ি (baskets) বিক্রয় করে লাভ করেছে সে এরপর জুতা তৈরি ও বিক্রয় করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। এইরূপে দেখা যায় যে উদ্বৃত্তমূল্য (surpluse value) শ্রম শক্তির (labour power) শোষণের (exploitation) মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি করে তাকে বহুগুণ বাড়াতে সাহায্য করে। পুঁজিবাদ / ধনতন্ত্রবাদে (capitalism) শ্রেণীগুলি (classes) অধিকতর মাত্রায় মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে থাকে – যথাক্রমে বুর্জোয়া (bourgeois) এবং সর্বহারা (proletariate)। এক্ষেত্রে শেষোক্ত শ্রেণীটি বৈপ্লবিক শক্তিতে (revolutionary force) পরিণত হয়। মার্কস -এর মতে ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী (proletariate class) পুঁজিবাদী / ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থাকে (capitalist system) উৎপাটিত করে উৎপাদনের উপকরণের (means of production) উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে যার পরিণতিক্রমে একটি শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা (a classloss society) প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীবাদের তাত্ত্বিকরা যাঁরা ডুয়াল সিস্টেম তত্ত্ব (Dual systems theory) প্রচার করেছিলেন, তাঁরা মার্কসীয় তত্ত্বের আদলে (model) পিতৃতন্ত্রের (patriarchy) একটি ভিত্তি (base) ও উপরিকাঠামো (super-structure) নির্মাণ করেছিলেন, যদিও তা বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার থেকে (মূল মার্কসবাদী তত্ত্ব) আলাদা ছিল। তাঁদের মতে নারীদের প্রতি শোষণের উদ্ভব সমাজের বস্তুগত অর্থনৈতিক ভিত্তি (material economic base) এবং পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তির (patriarchal base) থেকে হয়েছে। যার কোনটির উপরই নারীদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হেইডি হার্টম্যান (Heidi Hartmann) তাঁর 'The Unhappy Marriage of Marxism & Feminism নামক বলিষ্ঠ রচনায় পিতৃতন্ত্রর (patriarchy) বস্তুগত ভিত্তির কথা বলেছেন, যা আবার অর্থনৈতিক ভিত্তির থেকে আলাদা এবং যা সর্বসাধারণের পরিমণ্ডলে (public sphere) নারীর যৌনতা (sexuality) এবং শ্রমশক্তিকে (labour power) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত গৃহমধ্যস্থ পরিমণ্ডলে (private sphere) লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

সর্বসাধারণের পরিমণ্ডলে (public sphere) নারীরা কম মজুরীর কাজ করে এবং ব্যক্তিগত গৃহমধ্যস্থ পরিমণ্ডলে (private sphere) তারা গার্হস্থ্য শ্রমদান (domestic labour) করে থাকে যা বিনিময় মূল্যর (exchange value) পরিবর্তে কেবলমাত্র ব্যবহার মূল্য (use value) উৎপাদন করে থাকে।

সুতরাং সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটা সর্বহারার (proletariate) ন্যায়, যার শ্রম যারা উৎপাদনের উপকরণ (means of production) নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। হার্টম্যানের (Hartmann) মতে, পিতৃতন্ত্র (patriarchy) এবং পুঁজিবাদ / ধনতন্ত্রর (capitalism) মধ্যে অংশীদারিত্ব (partnership) পারিবারিক মজুরীর (family wage) মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, যেখানে একজন পুরুষকে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য যথোপযুক্ত মজুরী দেওয়া হয় যার দরুন তার নারী অর্থাৎ স্ত্রী গৃহে থেকে রান্না, ঘরদোর পরিষ্কাব, সন্তান পালনের ন্যায় গার্হস্থ্য শ্রমের কাজ করতে পারে যা উক্ত সর্বহারা (proletariate) পুরুষটিকে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং অপ্রদত্ত / অপ্রদেয় গার্হস্থ্য শ্রম হচ্ছে লুক্কায়িত উদ্বৃত্ত মূল্য (hidden surplus value) যা সর্বহারার (proletariate) পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে শেষ পর্যন্ত পুঁজি পুনরুৎপাদনে ও গঠনে সাহায্য করে।

পিতৃতন্ত্র (patriarchy) কর্তৃক নারীর শ্রমের আত্মসাৎকরণের দ্বারা সঞ্চারিত কাঠামো পুঁজিবাদ / ধনতন্ত্রে একটি অনুরূপ মতাদর্শ সৃষ্টি করে যাতে নারীদের পুরুষদের উপর নির্ভরশীল বলে দেখা হতে থাকে। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজে (feudal societies) নারীদের নির্ভরশীল (dependent) কথার কোন অর্থ ছিলনা। যেহেতু শ্রমের বিভাজন (division of labour) সুনিশ্চিত করে যে নারীরা স্ত্রী এবং মা রূপে পরিবারে গার্হস্থ্যকর্মজনিত শ্রমের ব্যবহার মূল্যের (use value) উৎপাদনের সঙ্গেই কেবলমাত্র জড়িত থাকে, সুতরাং উক্ত গার্হস্থ্য কর্মের হেয় করায় যেমন একদিকে সামাজিক নির্ধারক প্রয়োজন (socially determined need) মেটানোর ক্ষেত্রে পুঁজির অক্ষমতার বৈশিষ্ট্যহীনতাকে প্রকাশ করে, তেমনই একই সঙ্গে তা পুরুষদের নারীদের উপর আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার অন্য একটি যৌক্তিকতা উপস্থাপিত করে। নারীরা সাধারণতঃ শিক্ষিকারূপে, সমাজকল্যাণ কর্মীরূপে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশরূপে কর্মরত থাকে। উক্ত চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীরা যে প্রতিপালনকারী ভূমিকা পালন করে থাকে তা সমাজে নিম্ন মর্যাদার পেশারূপে ধরা হয়। কারণ পুঁজিবাদ সামাজিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে; যে আরোপিত গুরুত্ব যৌথভাবে প্রদত্ত সামাজিক পরিষেবাসমূহের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে।

যতদিন পর্যন্ত প্রতিপালনকারী কার্যাবলীর সামাজিক গুরুত্বকে নারীদের পরিষেবা প্রদানজনিত কারণের জন্য হেয়জ্ঞান করা যাবে, ততদিন পর্যন্ত গার্হস্থ্য শ্রমের ব্যবহারমূল্যের দাবির সঙ্গে বিনিময়মূল্য কেন্দ্রিক শ্রমের উপর পুঁজির অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টির সংঘাত এড়ানো যাবে। হার্টম্যানের (Hartmann) মতে এইরূপে বলা যায়, নারীবাদের (Feminism) পরিবর্তে লিঙ্গবাদ (Sexism) তথা লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনই শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে থাকে।

হার্টম্যানের উপরোক্ত তত্ত্ব ফার্গুসন এবং ফোলবার (Ferguson and Folbre) এর ন্যায় তাত্ত্বিকদের নিকট কিছুটা সমালোচনা সম্মুখীন হয়েছে। ফার্গুসন এবং ফোলবার মনে করেন যে নারীদের প্রতিশোষণের কারণস্বরূপ হার্টম্যান যে সকল উপাদানসমূহকে লিপিবদ্ধ করেছেন তা অপ্রতুল। প্রথমতঃ, এতে দেখানো হয়েছে যে পুরুষদের নারীদের নিয়ন্ত্রণ করবার একটি মৌলিক আগ্রহ রয়েছে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাঁরা যেকোন পদ্ধতি যথা বাড়ির কাজে নারীদের সীমাবদ্ধ রাখা, মানুষের অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুরুষদের নারীদের

প্রতি অকারণ আতঙ্ক / বিতৃষ্ণা / ঘৃণা (homophobia), নারীদের যৌনতার প্রতি নিয়ন্ত্রণ – প্রভৃতিকে ব্যবহার করে থাকে। পুনরায় হার্টম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি / মতামত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং পরিষেবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। ফার্গুসন এবং ফোলবার যেরূপ বলেছেন নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে; সুতরাং নারীদের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরণের ছিল।

এছাড়া ফার্গুসন এবং ফোলবার এর মতে হার্টম্যানের নারীবাদের তত্ত্বে সামাজিক পরিষেবা এবং মাতৃত্বর (mothering) কোনরূপ বিশ্লেষণ অন্তর্ভূক্ত নেই। শুধু তাই নয়, মার্কসীয় উৎপাদন পদ্ধতির ধ্যানধারণা যার মধ্যে সন্তান প্রসব, সন্তানকে মানুষ করা, প্রতিপালন করা, আবেগ বা অনুভূতি, স্নেহ বা অনুরাগ, যৌনতৃপ্তি – প্রভৃতির কোনটাই অন্তর্ভূক্ত ছিল না; হার্টম্যান তার কোন সমালোচনা উপস্থাপিত করেননি। ফার্গুসন এবং ফোলবার হার্টম্যানের পারিবারিক মজুরী (family wage) সম্পর্কে মতামতেরও বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে যদিও ধনতন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্র উভয়ই নারীদের প্রতি শোষণ থেকে লাভ করেছে, কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে সময় (time), শ্রম (labour), অর্থ (money) প্রভৃতির তাৎপর্য এক ছিল না। পুনরায় শিশু শ্রমিক আইন শিশুদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর হতে বাধাদান করত এবং এইরূপে পুঁজিবাদ তথা ধনতন্ত্র ছোট পরিবারগুলিকে উদ্দীপনা (incentive) দিয়ে নারীদের কম শ্রম সময় (less labour time) প্রদান করেছিল।

ফার্গুসন এবং ফোলবার (Ferguson & Folbre) একটি লিঙ্গ-প্রভাবিত পদ্ধতি (sex-affected system) পিতৃতন্ত্রের কাঠামোগত ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন যা মার্কসীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি হতে পৃথক। ইতিহাসে সবযুগে পরিবার একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির স্থান যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সন্তান প্রসব, সন্তানকে মানুষ করা এবং স্নেহ, ভালবাসা সংক্রান্ত মানবিক প্রয়োজনের পরিপূরণ এবং যা বস্তুগত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অপেক্ষা পৃথক। তাঁরা বলছেন এটা একটি লিঙ্গ-প্রভাবিত কাঠামো (sex-affected structure) সৃষ্টি করেছে যার নিজস্ব উপরিকাঠামো (super-structure) রয়েছে এবং যা বস্তুগত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের মাধ্যমে সঞ্চারিত উৎপাদনের সম্পর্ক (the relations of production) হতে পৃথক। লিঙ্গ প্রভাবিত পদ্ধতির (sex-affective system) উপরিকাঠামোগত উপাদান (super-structural component) নিম্নলিখিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান যে প্রথমত শিশু তার জীবনের প্রথম পর্বে তার মায়ের উপর মূলত নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ, লিঙ্গকেন্দ্রিক সত্তার (gender identity) সৃষ্টি, যেখানে নারীরা আদর্শ মাতৃত্বের (ideal motherhood) দিকে পরিচালিত হয়। তৃতীয়ত, সর্বসাধারণের কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত কার্যাবলীর বিভাজন (the division of 'public' and 'private' work) বা পুরুষদের নারীদেহের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয় প্রভৃতি। শেষোক্ত বিষয়টির আবার নারীর লিঙ্গ প্রভাবিত পদ্ধতির (sex affected system) উপর নিয়ন্ত্রণের এবং লিঙ্গ প্রভাবিত এবং অন্যান্য ধরণের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্কের দ্বারা তারতম্য হতে পারে।

এইরূপে ফার্গুসন এবং ফোলবার বলেছেন যে গড়ে বৃহদায়তন পরিবার ও উচ্চ জন্মহার ইউরোপে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ন্যায় অচলায়তন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। পিতৃতন্ত্রর (patriarchy) প্রতিশব্দ বা সংজ্ঞার শব্দতাত্ত্বিক উৎসর (etymological) অর্থ ছিল পিতার

শাসনতন্ত্র ('Rule of the fathers') ইউরোপীয় প্রাক্-ধনতান্ত্রিকগ উৎপাদন পদ্ধতিভূক্ত সমাজব্যবস্থায় পরিবারের পুরুষ গৃহকর্তা তাঁর সন্তানদের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ জারি করতেন যে নিয়ন্ত্রণ আইনগত ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা বর্দ্ধিত হত। পরিবারস্থ জমি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার দরুন গৃহকর্তা পিতা (Patriarch) সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কখন এবং কাকে তার সন্তানরা বিবাহ করবে এবং কখন ও কোন পরিস্থিতিতে তারা ঘর ছাড়বে। যেহেতু সন্তানেরা প্রায় সময়েই তাদের শারীরিক সাবালকত্ব অর্জনের পরেও গৃহের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করত, সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে তাদের অর্থনৈতিক অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গ-প্রভাবিত উৎপাদন (sex-affective production) ব্যবস্থা ও অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সন্তান প্রতিপালনকারী উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ছিল। নারীরা সন্তান প্রতিপালনে যে সময় ব্যয় করত তা গৃহমধ্যস্থ পরিবারের ভবিষ্যৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একধরণের বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করত বলা যায়। এটা ছিল এমন একটি বিনিয়োগ যা উচ্চ নৈতিকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একথা অনুমান করা যায় যে তখন নারীরা তাদের অধিকাংশ উদ্যমসমূহকে সন্তান প্রস্রাব ও সন্তান প্রতিপালনে ব্যয় করা, স্বেচ্ছায় পছন্দ করত। যাইহোক বিষয়টি ঠিক সেরূপ ছিল মনে হয় না। এর কারণ ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক (pre-capitalist modes of production) সাধারণতঃ সামাজিক সম্পর্কসমূহ দ্বারা বিশেষায়িত হত যা সন্তান উৎপাদনকারী সিদ্ধান্তসমূহের ক্ষেত্রে নারীর নিয়ন্ত্রণকে দারুণভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখত।

জুলিয়েট মিচেলের (Juliett Mitchell) মতে নারীদের প্রতি শোষণকে সম্পূর্ণরূপে একটি সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির সহিত পুরোপুরি ভাবে জড়িয়ে রাখা যায় না। মার্কসীয় পদ্ধতিকেন্দ্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহ আনয়নের বিষয়টি আন্তঃ সংস্কৃতিগতভাবে (cross-culturally) নারীদের প্রতি শোষণের ব্যাখ্যা করেনি। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কেন নারীরা শোষিত হয় যদিও সেই শোষণের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকে, তার কোন ব্যাখ্যা মার্কসীয় পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। মিচেল এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যে নারীদের প্রতি শোষণের একটি মতাদর্শগত উপাদানরূপে পিতৃতন্ত্র আন্ত-সংস্কৃতিগত (cross-cultural) ভাবে বিদ্যমান। উৎপাদন প্রক্রিয়া (production process) এবং পিতৃতন্ত্র (patriarchy) নামক দুটি উপাদান নারীদের প্রতি শোষণের বিষয়টি পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার (interact with each other) মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। মিচেল বলেছেন যে পুরুষেরা শ্রেণীগত আধিপত্যকেন্দ্রিক কাঠামোর মধ্যে ইতিহাসে প্রবেশ করে, অপরদিকে নারীরা প্রকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের কাজ যাই থাকুক না কেন, জ্ঞাতিকেন্দ্রিক সংগঠন পদ্ধতির (Kinship pattern of organization) দ্বারা সংজ্ঞায়িত থাকে। শ্রেণীগত, ঐতিহাসিক যুগের পরিপ্রেক্ষিত, নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি নারীত্ব (Femininity) বহিঃপ্রকাশের পরিবর্তন ঘটালেও পিতৃতন্ত্রের আইন সংক্রান্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি নারীদের অবস্থান একটি তুলনাযোগ্য বিষয়।

ইয়ং (Young) সকলরূপের ডুয়াল সিস্টেমস্ তত্ত্বের (Dual systems theory) সমালোচনা করেছেন। ইয়ং এর মতে হার্টম্যান (Hartmann) এবং তত্ত্বের প্রধান দুর্বলতা হল পিতৃতন্ত্র (patriarchy)

এবং ধনতন্ত্র (capitalism) নামক দুই ক্ষেত্রের স্বতন্ত্রীকরণ। ইয়ং বলেছেন হার্টম্যানের মতে যদি সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ধনতান্ত্রিক কর্মস্থলে এবং পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বিদ্যমান থাকে; তাহলে এটা বোঝা কঠিন যে কিরূপ নীতিতে আমরা উক্ত পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহকে ধনতন্ত্রবাদের সামাজিক সম্পর্কসমূহ থেকে পৃথক করতে পারবো? হার্টম্যান মেনে নিয়েছেন যে সমতুল বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন শ্রমের বিভাজন অনেক সময় পিতৃতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র উভয়কেই শক্তিশালী করে এবং একটি পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজে পিতৃতন্ত্রের কার্যসাধারনের বন্দোবস্ত (mechanism) বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ। তা সত্ত্বেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে আমাদের পিতৃতন্ত্রকে স্বতন্ত্র করা অবশ্য প্রয়োজন। যাইহোক মনে হয় এটা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত যে যদি পিতৃতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রে অভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, তাহলে তারা দুটি পদ্ধতির পরিবর্তে একটি পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ফার্গুসন এবং ফোলবার (Ferguson & Folbre) এর তত্ত্ব সম্পর্কে ইয়ং বলেছেন যে যেহেতু তাঁরা মূলতঃ পরিবারের অভ্যন্তরে নারীদের প্রতি শোষণকে নিয়ে চিন্তিত; সুতরাং তাঁদের তত্ত্ব পরিবারের গণ্ডীর বাইরে নারীদের নির্দিষ্ট ধরণের শোষণকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভোগ্যপণ্যের প্রসারের জন্য নারীদের যৌনতার প্রতীকরূপে (as sexual symbols) ব্যবহার যা একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদের (monopoly capitalism) অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে পৃথক কিছু স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ। আরও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে সমসাময়িক কর্মস্থলে (Contemporary workplace) নারীদের প্রতি যে যৌনতাকেন্দ্রিক শোষণ / নিপীড়ন (Sexist oppression) ঘটে থাকে তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার তাত্ত্বিক উপকরণ (theorietical equipment) ডুয়াল সিস্টেম্‌স্ তত্ত্বের আছে বলে মনে হয়না।

ইয়ং (Young) জুলিয়েট মিচেল (Juliett Mitchell) এর তত্ত্বের এই জন্যে সমালোচনা করেছেন কারণ তা নারীদের প্রতি শোষণের তত্ত্বের নির্মাণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছে যে নারীরা একটি বিশ্বজনীন পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির (Universal system of patriarchy) বিভিন্ন ধরণের বহিঃ প্রকাশের সম্মুখীন হয় যা একটি সমাজের বস্তুবাদী পরিস্থিতির সহিত আদান প্রদান করে এবং এইরূপে নারীদের প্রতি শোষণের গভীরতা ও জটিলতাকে তুচ্ছ করে দেখানোর দরুন তা নারীদের প্রতি শোষণে অব-ঐতিহাসিক প্রতিরূপ (de-historicizes) ঘটিয়েছে।

ইয়ং নির্দেশ করেছেন যে ডুয়াল সিস্টেম্‌স্ তত্ত্ব কেবলমাত্র পিতৃতন্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রের সংযুক্তি ঘটিয়েছে এবং তা base and superstructure অর্থাৎ ভিত্তি ও উপরিকাঠামোয় মার্কসীয় মডেল অর্থাৎ মতাদর্শকে প্রশ্ন করেনি। বিপরীতভাবে বলা যায় যে শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্বর মাধ্যমে ইয়ং দেখিয়েছেন যে পিতৃতন্ত্রকে ধনতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই, বরং ধনতন্ত্র স্বয়ং পুরুষদের মুখ্য ভূমিকায় রেখে নারীদের গৌণ ভূমিকায় সংস্থাপিত করে শ্রমের লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে লিঙ্গকেন্দ্রিক স্তরবিভাজনের (gender hierarchy) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইয়ং বলেছেন লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন (gender division of labour) বলতে তিনি সমাজব্যবস্থায় সকল সামাজিক কাঠামো কেন্দ্রিক লিঙ্গভিত্তিক শ্রমের পার্থক্যকরণের (all structured gender differentiation of labour

in society) বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন প্রত্যেকে সমাজের অর্থনৈতিক উপাদান সহ কাঠামো গঠন করে। ইয়ং এর মতে সমাজে একমাত্র উপাদানরূপে অর্থনীতিকে লিঙ্গ (gender) থেকে বিছিন্ন করে মার্কস ভুল করেছেন।

ইয়ং এর মতে ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে নারীরা উপাদানের উপকরণের উপর সকল প্রকারের নিয়ন্ত্রণ হারানোর দরুন গৃহকোণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে; যার ফলে গার্হস্থ পরিমণ্ডল (domestic sphere) নারীর পরিমণ্ডল (women's sphere) রূপে, মাতৃত্ব (motherhood) নারীর প্রকৃত কাজ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নিরীহ ঘরণী (docile house wife) নারীত্বের বহিঃপ্রকাশ (as expression of femininity) বলে প্রচারিত হয়েছে।

লিণ্ডা নিকলসন (Linda Nicholson) এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যে নারীদের উপর বিশ্বজননী শোষণ (universal oppression of women) ব্যাখ্যা করানোর জন্য আমাদের এখন একটি তত্ত্ব প্রয়োজন যা অর্থনীতিকে জ্ঞাতিত্বর পরিকাঠামোর (kinship structure) মধ্যে অঙ্গীভূত করবে। নিকলসনের ঘরে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহ এবং যৌনতা (Marriage and sexuality) সংক্রান্ত নিয়মাবলী অর্থনীতি বেং উৎপাদন পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজনের জমির সঙ্গে অন্যজনের জমি সংযুক্ত করার অথবা ঋণশোধ করার জন্য বিবাহগুলির বন্দোবস্ত করা হত। এছাড়া যেহেতু অর্থনীতি তখন বাজার কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে গৃহকেন্দ্রিক ছিল। সুতরাং উৎপাদন (production) এবং পুনরুৎপাদন (reproduction) জন্য শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন (sexual division of labour) পারিবারিক পরিকাঠামোর (family structure) মধ্যে একত্রিভূত / একত্রিত হয়ে উঠেছিল। ওই ধরণের সংস্কৃতির মধ্যে লিঙ্গই (gender) শ্রেণীর রূপ ধারণ করেছিল। যেরূপ বাজারকেন্দ্রিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল উদাহরণস্বরূপ ইউরোপে, সেখানে গৃহকেন্দ্রিক অর্থনীতি তার অর্থনৈতিক ভিত্তি হারায় ও তার স্থলে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। এইরূপে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জ্ঞাতিত্বর বন্ধনের স্বাতন্ত্রীকরণ এবং জ্ঞাতিত্বর বন্ধনকেন্দ্রিক কাঠামো (kinship structures) থেকে ছিন্ন করে একটি অপরিবর্তনীয় ভিত্তিরূপে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ইতিহাসে সর্বযুগে অবস্থান নির্দেশ করা ছিল এমন একটি ভ্রান্তি যা উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা এবং মার্কস – উভয়েই করেছেন। বাজারকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রবর্তনের পূর্বে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জ্ঞাতিত্বর বন্ধন সর্বদাই সমাজের পরিকাঠামোগত ভিত্তিরূপে কার্যকরী ছিল। পরবর্তী প্রণালীতে (latter system) বিনিময় পদ্ধতি (exchange) অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে জ্ঞাতিত্বর বন্ধন অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। লিণ্ডা নিকলসনের মতে উক্ত স্বাতন্ত্রীকরণের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক অথবা অ-ঐতিহাসিক (ahistorical) ঘটনার পরিবর্তে ঐতিহাসিক সত্যর (historical fact) ফলাফল ছিল।

নিকলসনের মতে জ্ঞাতিত্বর বন্ধন (kinship) নামক একটি উপাদান হতে অর্থনীতি নামক আর একটি উপাদানে স্বাতন্ত্রীকরণের বিষয়টির একটি ঐতিহাসিক উৎস ছিল। নারীদের তত্ত্বের কাছে উপরোক্ত দুটি উপাদানের স্বাতন্ত্রীকরণের ওইরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অপরিসীম গুরুত্ব ছিল, কারণ তা লিঙ্গকেন্দ্রিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ (gender) কে একটি শ্রেণী হিসাবে ধরা যায়, যদি আমরা শ্রেণীর সংজ্ঞাকে শ্রমের সামাজিক বিভাজনের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করি। এর কারণ

জ্ঞাতিত্বর বন্ধন (kinship) সেই যুগে সমাজব্যবস্থার পরিকাঠামোগত এবং গঠনমূলক নীতি ছিল।

নিকলসন বলেছেন লিঙ্গকে (gender) সুনিশ্চিতভাবে সংগঠিত সমাজগুলিতে এবংসম্ভবত বিভিন্ন মাত্রায় পরবর্তীকালের সমাজগুলিতে এমনকি শ্রেণী সংক্রান্ত চিরাচরিত উপলব্ধিবোধ অনুসারে ও একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাজন (class division) হিসাবে দেখা উচিৎ। অন্যভাবে বলা যায় যে খাদ্য এবং বস্তু প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এমন কি যদি আমরা চিরাচরিত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি মেনেও নিই, তাহলেও দেখা যায় যে যেহেতু ঐতিহাসিকতার দিক থেকে লিঙ্গকেন্দ্রিক সম্পর্ক উক্ত কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বিভিন্ন পথ নির্দেশিত করে, যাতে শ্রেণী সম্পর্ক গঠিত হয়।

উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টি আমাদের মার্কসবাদের চিরাচরিত সংশোধনাত্মক বক্তব্যকে অতিক্রম করে অন্য বিন্দুতে পৌঁছে দেয় এই কারণে যে তা উৎপাদন তত্ত্বকেই একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু করেছিল। উক্ত সংশোধনাত্মক বক্তব্যের আংশিক সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে তা মার্কসবাদীদের সঙ্গে উৎপাদনশীল (productive) এবং পুনরুৎপাদনশীল (reproductive) স্বতন্ত্রকরণতা (separability) বিশ্বাসে অংশীদার ছিল। কিন্তু যদি আমরা উক্ত স্বতন্ত্রকরণতাকে (separability) এমন একটি সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত বলে স্বীকৃতি দিই, যার বিনিময় নীতি (the principle of exchange) জ্ঞাতিস্বর বন্ধন (the principle of kinship) নীতিকে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টনের সংগঠিত করবার একটি মাধ্যমরূপে কিছু পরিমাণ বিকল্পস্বরূপ উপস্থাপিত করে, তাহলে মার্কসবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির ক্ষমতা (comprehension) গভীরতর হয়।

নিকলসনের মতে লিঙ্গ (gender) একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী নির্দেশক (class indicator) কি না তাকে প্রত্যেকটি উদাহরণ সহযোগে পরীক্ষামূলকভাবে (empirically) অবশ্যই নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং আমরা অনেক মার্কসবাদীদের মত ধরে নিতে পারিনা যে লিঙ্গ (gender) এবং শ্রেণী (class) সহজাতভাবে স্বতন্ত্র। এর পরিবর্তে গ্রাণ্ড তথ্যানুযায়ী মনে হয় যে বহু প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ (gender) একটি মৌলিক শ্রেণী নির্দেশক; যে সত্যটি পরবর্তীকালের ইতিহাসে সর্বযুগে প্রতিধ্বনি হয়েছে, যদিও তা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে একত্রিত হয়ে বা কোন কোন সময় তাদের অধীনস্থ হয়ে প্রতিফলিত হয়।

যদিও জ্ঞাতিত্বর বন্ধনকেন্দ্রিক অর্থনীতির পরিকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারকেন্দ্রিক পদ্ধতির অভ্যন্তরে অর্থনীতি মানবিক কার্যাবলীর (human activity) একটি স্বশাসিত উপাদান (autonomous component) রূপে ক্রিয়াশীল, তথাপি উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ কৃত্রিম, এর কারণ প্রত্যেক সমাজের মধ্যে তার পূর্বতন সমাজের পদচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। নারীবাদের তত্ত্বর কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি অত্যধিক আধিপত্য বিস্তারকারী পিতৃতন্ত্র যা বিভিন্ন উৎপাদনপদ্ধতিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও অপরিবর্তনীয় ছিল, তার কথা না বলে পিতৃতন্ত্র একটি সমাজব্যবস্থার কাঠামোকেন্দ্রিক নীতি পালনের দায়িত্ব থেকে যে রূপে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি সমাজে আধিপত্য বিস্তারের সহিত কিরূপে পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি একটি উপরিকাঠামোকেন্দ্রিক উপাদানে (a superstructural element) পরিবর্তিত হয় তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নারীবাদের তাত্ত্বিকদের করা উচিৎ।

সুতরাং নিকলসনের মতে, মার্কসবাদ ও নারীবাদের তত্ত্বের মধ্যে 'অসুখী বিবাহ' (unhappy marriage) জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ মার্কস এর এই

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যে মানবিক কার্যাবলীর (human activity) প্রত্যেকটি অংশই প্রত্যেক অপরাংশর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত একই সঙ্গে নারীবাদের তত্ত্বর মধ্যে মার্কস এর এই তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটাতে হবে যে ইতিহাসে সর্বযুগে সমাজের কাঠামো অথবা ভিত্তি অর্থনীতি অথবা উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যেখানে অন্যান্য মানবিক কার্যাবলীর (other human activities) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকেনা।

৭.১.১.৩ ঃ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও নারীবাদ (Post Modernism and Feminism)

উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post-Modernism) সাধারণত আধুনিকতাবাদ (Modernism) এর একটি বৌদ্ধিক সংকটের (intellectual crisis) সঙ্গে জড়িত। আধুনিকতাবাদের চাবি দার্শনিক ধারারূপে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে জানদীপ্তিবাদের (Enlightenment) প্রসারের সঙ্গে উত্থান ঘটে। উক্ত আন্দোলন অনুযায়ী যুক্তি (reason) অথবা যুক্তিবাদ (rationality) মানবিক জ্ঞানের প্রধান সূত্র। একটি ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে অঙ্গীভূত হলেও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যুক্তি প্রয়োগ করে বস্তুকেন্দ্রিক বিশ্বজনীন মুক্ত বিচার বিশ্লেষণে উপনীত হতে পারে যার উপর বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক জ্ঞানের সামগ্রিক স্তম্ভ নির্ভরশীল। উত্তর আধুনিকতাবাদের মতে যেহেতু ব্যক্তিগত বিষয়কেন্দ্রিকতা (individual subjectivity) ভিত্তির পরিবর্তে ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীল বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া যেমন জাতি (race), নৃজাতিগত / জাতিতত্ত্বমূলক (ethnic), লিঙ্গ (gender) প্রভৃতি বিষয়ের ফলাফল ছিল; সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন বস্তুগত বিচার বিশ্লেষণ বলে প্রতীয়মান হয়,তা বিশ্লেষণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক-ঐতিহাসিক বিষয়াবলী যথা শ্রেণী (class) জাতি (race) নৃজাতিগত / জাতিতত্ত্বমূলক (ethnic), লিঙ্গ (gender) কেন্দ্রিক বাসস্থানের ভিত্তিতে আংশিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট বিচার বিশ্লেষণ। এর ফলাফলস্বরূপ উত্তর আধুনিকতাবাদ বিভিন্ন চিন্তাধারা যথা পার্থক্য, বহুত্ববাদ, অ-সামগ্রিকতা নান্দনিক স্ব-প্রচলিত প্রথা / রীতি (aesthetic self fashioning) অনিশ্চিত সম্ভাবনা (contingency) এবং যে কোন ধরণের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ প্রণালী প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

যেহেতু প্রতিনিধিত্ব (agency) অথবা নির্ভরশীলতা / নিয়ন্ত্রণাধীনত্ব / শাসনাধীনত্বর ধারণা (notion of agency or subjecthood) উত্তর-আধুনিকতাবাদ কর্তৃক সমালোচিত সুতরাং নারীদের নির্ভরশীল অথবা প্রতিনিধিত্বকারীরূপে নারীবাদের তত্ত্ব অথবা রাজনীতির নারীদের মূল / অপরিহার্য অবস্থানকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা যা এমনকি নারীদের মধ্যে সকল পার্থক্য মুছে দিচ্ছে – তা স্বয়ং সংকটে। এর কারণ একটি নিশান (banner) এর পরিবর্তে নারীদের বহুমুখী নিশান বা প্রতীক (multiple banners) – যথা উচ্চশ্রেণীর মহিলা (upper class women), নিম্নজাতির নারী (lower caste women), বিকাশশীল নারী (women in development), উপজাতীয় নারী (tribal women) প্রভৃতি। ডি স্টেফানো (Di Steffano) এর মতে নারীদের মধ্যে ও অভ্যন্তরে বহুমুখী পার্থক্যসমূহের বিদ্যমানতার দরুন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী

(category) কেন্দ্রিক ভ্রমাত্মক ধ্যানধারণা দ্বারা পীড়িত। কিছু লেখকগণের মতে (gender) বা লিঙ্গ নারীদের জীবনে দারিদ্র্য, শ্রেণী নৃজাতিত্ব (ethnicity), জাতি (race) যৌনতাকেন্দ্রিক সত্বা (sexual identity) এবং বয়স অপেক্ষা তার মূল বিষয় নয়, এর কারণ নারীরা মনে করেন যে তাঁরা শ্বেতাঙ্গ – অশ্বেতাঙ্গ, বুর্জোয়া - প্রোলেটারিয়েট (সর্বহারা) অথবা অ্যাংলো (Anglo) অথবা অন্যান্য জাতি এবং বিপরীত লিঙ্গর প্রতি স্বাভাবিক যৌন-আকর্ষণপূর্ণ নারীপুরুষদের (heterosexual) মধ্যে বিভাজন অপেক্ষা পুরুষদের থেকে নারীরা নিজেরা কম বিভক্ত। (Hooks, Jordan, Lorde) এক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে এই যে লিঙ্গ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা একটি মৌলিক তত্ত্বরূপে নারী পুরুষের আরোপিত কিংবদন্তীমূলক পার্থক্যকে সমালোচনামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রূপান্তর সাধন অথবা তার থেকে নিষ্কৃতি লাভের পরিবর্তে যখন কেবলমাত্র তাকে বাস্তবায়িত করবার চেষ্টা করে, অপরদিকে যখন তা উক্ত পার্থক্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও আয়ত্বাধীন ক্ষেত্রগুলিকে অবহেলা করে।

যদি নারীদের একটি অভিন্ন শ্রেণী (identical class) রূপে ভাবনার বিষয়টি কেবলমাত্র একটি ভাষাতাত্ত্বিক নির্মাণ (a linguistic construction), একটি সর্বাত্মকভাবে অলীক কাহিনী হয়, তাহলে কিরূপে আমরা নারীদের প্রতিনিধিত্ব নির্মাণ করব, যার থেকে বিশ্বজনীন পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। অ্যালকফ (Alcoff) বলেছেন যদি নারীরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে কিরূপে আমরা নারীদের নাম দাবী করব এবং তাদের নামে দাবী করার অর্থ হল কেবলমাত্র এই কিংবদন্তীকে পুনরায় শক্তিশালী করা যে নারীদের পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান। এছাড়া যদি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে নারীদের অস্তিত্বের বিষয়টি একটি অলীক ধারণা হয় তাহলে কিরূপে আমরা বলব যে লিঙ্গবাদ (sexism) নারীদের স্বার্থের প্রতিবন্ধক? এখন আমরা দেখব যে কিরূপে বহু নারীবাদী উক্ত সমস্যাটিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিকাল (Radical) নারীবাদীরা gender বা লিঙ্গকে একটি মৌলিক শ্রেণী (fundamental category) রূপে গ্রহণ করেছেন যার থেকে তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বহিঃপ্রকাশরূপে মানবিক সংস্কৃতির একটি চমৎকার বর্ণনা (a grand narrative) নির্মাণ করেছেন। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানবিক মুক্তিকে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের অবসানের সহিত সমার্থক ধরা হয়েছে যে বিষয়টি আমরা শুলাস্মিথ ফায়ারস্টোন (Shulasmith Firestone) এর মধ্যেও দেখেছি। ওয়াঘ (Waugh) এর মতে উক্ত বিষয়ে নারীর প্রকৃতি অথবা নারীত্বর অভিজ্ঞতা (Feminine experience) সম্পর্কে সকল অপরিহার্য সত্যের দাবির মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ও যা নারীদের নিজ গোষ্ঠী / জাতি / সমাজ সম্পর্কে শোষণমূলক শ্রেষ্ঠত্বর ও অন্যান্য অনুরূপ গোষ্ঠী / জাতি / সমাজ অর্থাৎ পুরুষদের প্রতি অনুরূপ আনন্দ, ভুল বোঝাবুঝিজনিত বিভিন্ন অবস্থান কেন্দ্রিকতার প্রতি নারীবাদের তাত্ত্বিকদের অন্ধ করে। পুনরায় ওয়াঘ (Waugh) এর মতে নারীদের প্রতি শোষণের রাজনৈতিক ব্যাখ্যার পদ্ধতি হিসাবে আন্তঃ-ঐতিহাসিক কাঠামোসমূহকে (trans-cultural structures) যে কোনভাবে অবলম্বন করার অর্থই হল কেবলমাত্র বিপরীত প্রক্রিয়ায় উক্ত শোষণমূলক পদ্ধতিসমূহের পুনরাভিনয় অনুষ্ঠিত করা।

নারীবাদী রাজনীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের নারীর একমুখী বাস্তব বা কণ্ঠস্বর (one universal objective voice of women) সংক্রান্ত ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়ে নারীদের বহুমুখী কণ্ঠস্বর / ধ্বনি

(multiple women's voices) গ্রহণ করা উচিৎ। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের নিকট নারী একটি অ-প্রাসঙ্গিক / প্রসঙ্গ বহির্ভূত বিশ্বজনীন মৌলিক শ্রেণী নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক শ্রেণী, অর্থাৎ জাতি এবং শ্রেণী নির্দিষ্ট। ('women' for post-modern feminists is not a decontextualized universal essential category but contextual category i.e. will be race and class specific) বহুমুখীনতার স্থান সুনির্দিষ্ট করতে গিয়েও আমরা যুক্তিবাদের আলোকপ্রাপ্ত মতাদর্শের (Enlightenment models of rationality) প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারি যাকে আমাদের অন্বেষণসমূহ একটি বিশ্বাসমূহ এবং কল্পিত আদর্শ রাজ্য বা ইউটোপিয়া (Utopia) অর্থাৎ প্রগতির পথে আমাদের নিয়ন্ত্রণকারী নীতি ও চালিকাশক্তিকে নারীবাদী রাজনৈতিক পদ্ধতির একটি অনুপ্রেরণারূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। উক্ত পথ অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের অব্যবহিত প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেনহাবিব (Benhabib) যেরূপ দেখিয়েছেন সেরূপ একজন যুক্তিবাদী দার্শনিকের ন্যায় আন্তঃসংস্কৃতিগতভাবে (cross-culturally) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমাদের মতাদর্শের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

(Gynocentrist) অর্থাৎ অ্যালকফ (Alcoff) এর মতে গাইনোসেন্ট্রিস্ট অর্থাৎ নারীরচিত বস্তুকেন্দ্রিক নারীবাদের তত্ত্ব ও রাজনীতি মূলত নারীদের পুরুষদের থেকে পৃথক / ভিন্ন (other of man) বলে মনে করে। নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন / পৃথক বলে বিবেচনা করবার মুখ্য উদাহরণ মেরী ডালি (Mary Daly) অ্যাড্রিয়েন রিচ (Adrienne Rich) এর সংস্কৃতি নারীবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ডালি নারীর কর্মশক্তি (feminine energy) ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যা পুরুষতান্ত্রিক শক্তি (Male Power) নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। অ্যালকফ রে মতে যেহেতু ডালি এবং রিচ উভয়েই মূলত নারীদের পুরুষদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (superior) বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেহেতু তাঁরা লোগোসেন্ট্রিজম (logocentrism) বা প্রতীককেন্দ্রিকতার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। নারীদের মূল প্রকৃতিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিপালনকারী (mutinant) এবং মানবিক (humane) বলে সৃষ্টি করতে গিয়ে – গাইনোসেন্ট্রিক ফেমিনিজম (gynocentric feminism) অর্থাৎ নারী রচিত / গঠিত বস্তুকেন্দ্রিক নারীবাদীরা নারীদের অন্যান্য ভিন্ন বা পৃথক গোষ্ঠীর নারীদের বাদ দিয়েছেন। অ্যালকফ জোর দিয়ে বলেছেন যে অপরদিকে উত্তর কাঠামোতন্ত্র / গণতন্ত্রবাদ (Post-structuralism) পুরুষদের দ্বৈত বিরোধিতার্থে নারীদের উক্ত মূলগত দিক থেকে স্বতন্ত্রতার বিষয়টিকে এবং ক্রিস্টোভা (Kristova) -এর ন্যায় দেখিয়েছে যে নারী যা নয়, সে প্রকৃতপক্ষে তাই। পুনরায় এই বিষয়টি যে কোন ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলন চালনার ক্ষেত্রে নারীদের সর্বপ্রকার প্রতিনিধিত্ব করাকে অন্যায় ভাবে ও বলপূর্বক বঞ্চিত করেছে।

ডি লরেটিস্ (De Lauretis) এর মতে নারীদের নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্বর বিষয়টি ইতিহাস বহির্ভূত কিছু বিশ্বজনীন নিরপেক্ষ স্থানের পরিবর্তে সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে। ডি. লরেটিস্ (De Lauretis) বলেছেন যে এটাই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে একটি নারীবাদী তত্ত্বের নির্দিষ্টতাকে অন্বেষণ করতে হবে। উক্ত নির্দিষ্ট নারীত্ব / নারীসুলভ কমনীয়তা যাকে নারীর প্রকৃতির সহিত বিশেষ সুবিধাভোগী নৈকট্যের মধ্যেও যেমন অন্বেষণ করলে চলবে না তেমনই তাকে নারীর শরীর অথবা অবচেতন মন বা অপরিহার্য বৈশিষ্ট যা নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু যার প্রতি বর্তমানে পুরুষরাও দাবি পেশ করে

থাকে, তার মধ্যেও অন্বেষণ করলে চলবে না অথবা তাকে নারীকেন্দ্রিক ঐতিহ্য (female tradition) যাকে সাধারণভাবে, ব্যক্তিগত, প্রান্তিক এবং তথাপি ইতিহাস বহির্ভূতরূপে বিদ্যমান বলে ধরা হয়। কিন্তু যাকে অসম্পূর্ণরূপে সেখানেই অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে আবিষ্কার অথবা পুনরুদ্ধার করতে হবে – তার মধ্যেও অন্বেষণ করলে চলবে না। পুনরায় চূড়ান্তভাবে তাকে পৌরুষত্বর (Masculinity) ছোটখাট ফাটলের মধ্যে (with chinks and cracks of Masculinity) অথবা পুরুষ সত্ত্বার (male identity) সাধারণত দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ মুক্তস্থানের (fissure) মধ্যে অন্বেষণ না করে এবং তাকে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক – আত্ম-বিশ্লেষণী পদ্ধতি যার দ্বারা সামগ্রিক বাস্তবতার উক্ত বিষয়ের সম্পর্কসমূহকে নারীদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে – তার মধ্যে অন্বেষণ করতে হবে। এ সম্পর্কে অনেক কিছু এখনও করা বাকি।

উত্তর-গঠনতান্ত্রিকতত্ত্ব (Post-structuralist theory) অর্থাৎ নারীদের প্রতি শোষণের অধিকাংশ বিষয়ই ভাষার অভ্যন্তরে (in language) নারীর ভূমিকা নির্মাণের মধ্যে নিহিত, তার সঙ্গে একমত হয়ে অ্যালকফ্ (Alcoff) ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে ভাষাই লিঙ্গবাচক অর্থের (meaning) অবস্থান নির্দেশ করার একমাত্র স্থান নয়। কোন একজনের লিঙ্গের (gender) অর্থ অথবা সত্তা (identity) সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে অন্বেষণ করা যেতে পারে। পুনরায় অ্যালকফের মতে নারীরা তাদের সত্তার বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহকে (pockets of identity) আবিষ্কার করতে পারে যেখানে তাদের ভূমিকা এখনও নির্দ্ধারণ করা হয়নি এবং তারপর ওই সব স্থানসমূহ এবং আলোচনাসমূহকে (discourses) চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। ওইরূপ ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ স্থানসমূহে নারীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

কিছু আভ্যন্তরীণ নির্দ্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে নারীদের একটি নির্দ্ধারিত সত্তা বলে ধারণা করার পরিবর্তে আমরা বলতে পারি যে নারীদের সত্তা, জাতি, শ্রেণী ও জাতীয়তা (race, class and nationality) কেন্দ্রিকতার বাহ্যিক বহির্বিষয়ক অবস্থানের মাধ্যমে সতত পরিবর্তনশীল। উক্ত পরিবর্তনশীল সত্তাসমূহের মধ্যে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নারীরা একটি নারীবাদী বা নারী বলতে কি বোঝায় তার অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। সুতরাং একটি নারী অথবা নারীত্ব সম্পর্কে পূর্ব-প্রদত্ত অর্থ অথবা সত্তা প্রদানের পরিবর্তে নারীদের তার বিশেষ জাতিগত (racial), নৃজাতিগত (ethnic), জাতীয় (national) অথবা শ্রেণী (class) কেন্দ্রিক অবস্থানের ভিত্তিতে উক্ত অর্থকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। অ্যালকফ (Alcoff) বলেছেন যে উক্ত সম্পর্কসমূহের বন্ধনী শৃংখলের অভ্যন্তরে (within this network of relations) যদি নারীদের তার স্থানকে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, তাহলে নারীদের অন্তস্থঃ ক্ষমতাসমূহের অগ্রগতির গতিরুদ্ধ করা হয়েছে এই দাবির পরিবর্তে তাদের জন্য এই নারীবাদী অভিমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব পর হবে যে উক্ত বন্ধনীশৃংখল (network) এর সম্পর্কসমূহের অভ্যন্তরে তাদের অবস্থানে ক্ষমতা ও চলমানতার (power and mobility) অভাব রয়েছে যার আসল সংস্কারমূলক পদ্ধতিকেন্দ্রিক সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

ন্যান্সি ফ্রেজার (Nancy Frazer) -এর মতে নারীবাদের তত্ত্বের একটি আলোচনামূলক তত্ত্বের (theory of discourse) প্রয়োজন। এর পূর্বে আমরা দেখেছি যে মার্কস -এর মতে প্রত্যেকটি উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে একটি উৎপাদনের সম্পর্ক অথবা মতাদর্শ পদ্ধতি (system of ideology) উৎপাদিত হয়

যার মাধ্যমে শাসকশ্রেণী জনগণকে শোষণ করে। এই রূপে শ্রমিক পুঁজির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতে থাকে যাতে সে নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে এই কাজ করে। এর কারণ সে উৎপাদনের উপকরণের (means of production) মালিক শাসকশ্রেণী কর্তৃক সঞ্চারিত ছদ্মচেতনার (false consciousness) অধীনে থাকে।

অ্যালথুজার (Althussar) এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যে, কোন উৎপাদন পদ্ধতির (production system) থেকে স্বাধীনভাবে মতাদর্শসমূহ (ideologies) বিদ্যমান থাকতে পারে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে, বিদ্যালয় পদ্ধতির তথা শিক্ষাব্যবস্থার ও পরিবারের মাধ্যমে মতাদর্শসমূহ সঞ্চারিত হয় এবং এইরূপে তা শ্রমশক্তির (labour power) পুনরুৎপাদন করে। একটি সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে শোষণের অপসারণ ঘটে না; এর পরিবর্তে আলোচনাকেন্দ্রিক পরিবর্তন (change in the discourse) অথবা মতাদর্শজনিত পরিবর্তনই কেবলমাত্র সামাজিক পরিবর্তনসমূহ আনয়ন করতে পারে। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা ধরে নেন যে নারীদের প্রতি শোষণ পিতৃতান্ত্রিক আলোচনা (patriarchal discourse) মধ্যে নিহিত যা সমাজের, রাষ্ট্রের, শিক্ষার ও পরিবারের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য নারাবাদী তত্ত্বের একটি বিপরীতমুখী / প্রতিরোধমুখী আলোচনা (counter-discourse) উৎপাদন করা উচিত।

ন্যান্সি ফ্রেজার (Nancy Frazer) -এর মতে ওইরূপ বিপরীতধর্মী প্রতিরোধমূলক আলোচনার তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য আমাদের একটি গঠনতন্ত্রমূলক / কাঠামোতন্ত্রমূলক (structuralist) অথবা একটি বাস্তববাদী (pragmatist) অবস্থান গ্রহণ করতে পারি। একটি গঠনতন্ত্রমূলক (structuralist) অবস্থানের মধ্যে ব্যক্তিগত কথিত অথবা লিখিত শব্দাবলীর কোনই অর্থ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ইংরাজী শব্দ 'cut' জার্মান শব্দ, স্প্যানিশ শব্দ Katz' বাস্তব দিক থেকে পৃথক হলেও তাদের একই অর্থ। আমরা অপরিবর্তনীয় অ-বস্তুগত সমকালীন কাঠামো অথবা ভাষার (in the unchanging non-physical synchronic structure or language) মধ্যে তার অর্থ (meaning) অন্বেষণ করতে পারি। কাঠামো গঠন (structure) একটি প্রতীকধর্মী ব্যবস্থা (symbolic order) যেখানে প্রত্যেকটি প্রতীক এর অবস্থানের দ্বারা এবং একে অপরের সঙ্গে পার্থক্য দ্বারা কেবলমাত্র অর্থ (meaning) অনুভূত হয়।

জ্যাকুই ল্যাকান (Jacque Lacan) সস্যুর (Sasuarre) -এর গঠনতান্ত্রিক / কাঠামোতন্ত্রবাদ (structuralism) -এর উপর নির্ভর করে একটি মনোবিশ্লেষণীতত্ত্ব (psychoanalytic theory) ব্যাখ্যা করেছেন। ল্যাকান (Lacan) -এর মতে প্রতীকধর্মী ব্যবস্থা / শৃঙ্খলা (the symbolic order) অথবা ভাষা ব্যবস্থা / শৃঙ্খলা (the order of the language) স্বয়ং লিঙ্গকেন্দ্রিক (Phallocentric) অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবাধীন যেখানে মানুষ ভাষার দীক্ষা পায় যখন শিশু প্রাক্-অয়েডিপাল (pre-oedipal) পর্যায়ে থেকে অয়েডিপাল পর্যায়ে (Oedipal stage) উপনীত হয় ও যেখানে পিতার অনুশাসন (the law of the Father) কাজ করতে শুরু করে। সুতরাং ল্যাকান এর মতে ভাষা (language) স্বয়ং পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal)।

ল্যাকান (Lacan) কে অনুসরণ করে বহু নারীবাদী তাত্ত্বিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে পিতৃতন্ত্রকে

ধ্বংস বা পরাভূত করবার জন্য নারীবাদের তত্ত্ব অথবা রাজনীতির প্রয়োজন, সব পিতৃতান্ত্রিক আলোচনা এবং ভাষাকে (all discourse and language) সমালোচনা করা। ফ্রেজার (Frazer) -এর মতে গঠনতন্ত্রবাদ / কাঠামোতন্ত্রবাদ (structuralism) -এর উপর নির্ভরশীল একটি সমালোচনার তত্ত্ব (a theory of discourse) অত্যন্ত বিমূর্ত কারণ তা একটি বিমূর্ত কাঠামোর (an abstract structure) মধ্যে অর্থ (meaning) অন্বেষনের চেষ্টা করে। সুতরাং বাস্তববাদের (pragmatics) সহিত সাযুজ্যপূর্ণ একটি আলোচনার তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ যা নারীদের জীবনযাত্রার প্রকৃত রীতিনীতি, প্রথা পদ্ধতির যথাযথ বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্থ অন্বেষণের চেষ্টা করে, যে বিষয়টি নারীবাদী আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ফ্রেজার (Frazer) বলেছেন যে বাস্তববাদী মতাদর্শসমূহ (pragmatic models) সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং যোগাযোগের সামাজিক পদ্ধতির উপর জোর দেয়, কিন্তু তারা বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক দিক থেকে পরিবর্তনশীল অ-প্রাসঙ্গিক স্থানসমূহ ও রীতিনীতিসমূহের পর্যালোচনা করে। এর ফলাফলস্বরূপ উক্ত মতাদর্শকেন্দ্রিক পদ্ধতিসমূহে সামাজিক সত্তাগুলিকে জটিল, পরিবর্তনশীল এবং অ-প্রাসঙ্গিকভাবে নির্মিতরূপে ধারণা করবার সম্ভাবনা উপস্থাপিত করে। সুতরাং বাস্তববাদী মতাদর্শের উপর নির্ভরশীল আলোচনা তত্ত্ব একদিকে যেমন মূলত নারী বলতে কি বোঝায়, সেই প্রশ্ন ব্যতীত নারী কি প্রতীকের প্রতিনিধিত্ব করে তার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করবে অথবা অন্যদিকে নারী নামক সামগ্রিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বর অস্বীকৃত প্রদান বা বিলুপ্তি সাধন করে নারীবাদী রাজনীতিকেই অসম্ভব করে তুলবে।

৭.১.১.৪ (সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী)

Liberal Feminism

1. Whethan, I, Modern Feminist Thought, New York, New York University Press, 1995.
2. Donavan, J. Feminist Theory : The Intellectual Traditions of American Feminism, New York.
3. Jaggar, A & Rothenberg, P (Ed.), Feminist Frameworks : Alternative Accounts of the Relations Between Women & Men, New York : McGraw Hill, 1993.
4. Nicholson, L. (Ed.) The Second wage : A Reader in Feminist Theory, New York, Routledge, 1997.
5. Jackson S & Jones, J (Ed.) Contemporary Feminist Theory, New York Univerisity Press, New York, 1998
6. Mazumder, Rinita, A short Introduction to Feminist Theory, Anustup, Calcutta, 2001.

Marxist Feminism : Marx & the Dual Systems Theory :

1. Nicholson, L (Ed.) The Second Wave : A Reader in Feminist Theory, New York, Routledge, 1997.
2. Jackson, S. & Jones, J (Ed.) Contemporary Feminist Theory, New York :

New York University Press, 1998.
3. Young, I. M. 'Beyond the Unhappy Marriage : A critique of the Dual systems theory, in Sargent, L, Women & Revolution, Boston, South End Press, 1981.
4. Hartmann, H, 'The Unhappy Marriage of Marxism & Feminism' in Nicholson, L, (Ed.) The Second Wage : A Reader in Feminist Theory, 1997.
5. Ferguson, A & Folbre, 'The Unhappy Marriage of 'Patriarchy & Capitalism in Surgent, L. (Ed.) Women & Revolution, Boston, South End Press, 1981.
6. Mitchell, Juliett, 'Women : The Longest Revolution', in New Left Review, 1966.
7. Nicholson, L. 'Marxism & Feminism : Integrating Economy & Kinship, in Nicholson, L. (Ed.) The Second Wave : A reader in Feminist Theory, 1997.
8. O Brien, M, 'Reproducing Marxist Man' in The sexism of social & Political Theory, eds. Lorenne M. G. Clark & Lynda Lange, Toront : UTT Press.

Feminism and Post Modernism :

1. Waugh, P. 'Post-Modernism and Feminism', in Jackson, S. and Jones, J (ed.) contemporary Feminist Theories, New York, New York University Press, 1998.
2. Di Stefano, C. 'Dilemmas of Difference : Feminism, Modernity and Post-Modernism' in Nicholson L. (Ed.) Feminism / Post-Modernism, New York, Routledge, 1990.
3. Alcoff, L. 'The Feminist Standpoint' in The Second Wave : A Reader in Feminist Theory, (Ed.) Nicholson, New York, Routledge.
4. Traser, N. "Structuralism or Pragmatics? : On Discourse Theory and Feminist politics" in 'The Second Wave : A Reader in Feminist Theory' (Ed.) Nicholson, L. New York, Routledge.

৭.১.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

Liberal Feminism

1. Analyse the features of Liberal Feminism. Explain its importance in the Feminist movement.
   উদারতান্ত্রিক নারীবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর। নারীবাদী আন্দোলনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
2. What do you understand by the theory of Liberal Ferminism. How has this theory been criticised by the Socialist & Radical Feminists?
   উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব বলতে কি বোঝ? সমাজতান্ত্রিক (Socialist) এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিকাল (Radical) নারীবাদীগণ কর্তৃক কিরূপে

উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছিল?

3. Do you agree with the view that Liberal Feminism sprang within the context of economic & political liberalism in England?
তুমি কি এইমত মেনে নেবে যে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারতন্ত্রবাদের প্রেক্ষাপটে উদারতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভব হয়েছিল?

Marxist Feminism : Marx & the Dual Systems Theory :

1. Do you agree with the view that the feminist theorists propagating the Dual systems theory, draw the Marxian model although deviate from the latter.
2. Explain the Dual systems theory of the Marxist Feminism as propounded by Hartmann, Fergusson, Folbre and Juliet Mitchell.
3. What do you understand by the 'erm Marxist Feminism? Is there any difference between the classicial Marxism and Marxist Feminism?

১। তুমি কি এই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত একমত যে ডুয়াল সিস্টেম্‌স্‌ তত্ত্ব প্রচারকারী নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মার্কসীয় মডেল অনুসরণ করলেও তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে?

২। হার্টম্যান, ফার্গুসন, ফোলবার এবং জুলিয়েট মিচেল কর্তৃক উত্থাপিত মার্কসীয় নারীবাদের ডুয়াল সিস্টেম্‌স্‌তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩। মার্কসীয় নারীবাদ বলতে তুমি কি বোঝ? ধ্রুপদী মার্কসবাদ ও মার্কসীয় নারীবাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

Feminism and Post Modernism :

1. Explain the linkage between Post-Modernism and Feminism. Explain the resultant crisis in Feminism in this contest.
উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং নারীবাদের মধ্যে সম্পর্কসমূহ ব্যাখ্যা কর। উক্ত প্রসঙ্গে নারীবাদের সংকটজনিত ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

SURVEY OF APPROACHES AND SOURCES

একক - ২

Sources

(i) Archival — Government files, Official reports, Census, Private papers, etc.

(ii) Non-archival — sacred and non-sacred texts, epigraphs, diaries, memoirs, autobiographies, fiction, songs, folklore, photographs, paintings, oral history

---

বিন্যাসক্রম ঃ

৭.১.২.০ ঃউদ্দেশ্য

৭.১.২.১ ঃমহাফেজখানার সাক্ষ্য

৭.১.২.২ ঃমহাফেজখানা / অভিলেখ্যাগার বহির্ভূত — পবিত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহ

৭.১.২.৩ ঃশাসন (প্রস্তর বা তাম্র) / লেখগুলির সাক্ষ্য

৭.১.২.৪ ঃচিত্রকলা -- Non-archival

৭.১.২.৫ ঃতথ্যসূত্র হিসাবে Photograph (ফটোগ্রাফ)

৭.১.২.৬ ঃসহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৭.১.২.৭ ঃসম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) মহাফেজখানার সাক্ষ্য

(২) ইতিহাস রচনার উপাদান -- মহাফেজখানা/অভিলেখ্যাগার বহির্ভূত -- পবিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহ -- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিকযুগ

(৩) শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) লেখগুলির সাক্ষ্য

(৪) লেখ্যাগার বহির্ভূত উপাদান -- চিত্রকলা ও Photograph -- তথ্যসূত্র হিসেবে এর গুরুত্ব।

৭.১.২.১ ঃ মহাফেজখানার সাক্ষ্য

মেয়েরা সাধারণভাবে ইতিহাসের তথ্য থেকে মুছে গেলেও, কোথাও কোথাও অশ্চর্যজনকভাবে তাদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মহাফেজ খানায় আধুনিককালে নতুন ধরনের গবেষণায়/ মানবীচর্চার তাগিদে তথ্য বেরিয়ে আসছে। এখানে আমরা একটি বিশেষ বিষয়ের উপর নজর দেব :

ঊনবিংশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকে ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনীর বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের স্বাস্থের ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন / বা অবিবাহিত থাকতে বাধ্য হতেন। ফলে শারিরিক চাহিদা মেটাতে অধিকাংশই 'লালবাজারে' যেতেন (শ্বেতাঙ্গদের দেহোপজীবীদের কাছে গেলেও যাতে যৌন রোগ না হয় তার জন্য সরকার থেকে বেশ্যাদের উপর নজরদারী রাখতে এই ধরনের 'লালবাজার' সব বড় বড় সেনাছাউনীতেই খুলতে হয়েছিল। শেষে এল 1868 'চৌদ্দ আইন' যার পোষাকী নাম হল 'Contagious Diseases Act' বা Act XIV । এতে বেশ্যাবৃত্তির উপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং ডাক্তারী পরীক্ষার নামে গরীব যৌনকর্মীদের উপর নানারকম নির্যাতন করা হয়। এখানেই শেষ নয়, 70র দশকে পতিতাবৃত্তি নিবারণের প্রথম ধাপ হিসাবে পতিতাদের হেফাজতে থাকা কম বয়সী মেয়েদের নাম/বয়স নথীভুক্তির কথাও ভাবা হয়েছিল। এর প্রস্তুতি হিসাবে পতিতারা কোথা থেকে আসে (তাদের সামাজিক অবস্থান) এবং অন্যান্য তথ্য সংকলনের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরী করে জেলাশাসকদের কাছে পাঠান হয়েছিল।

প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ :

(ক) জেলায় বৃত্তিটি (দেহব্যবসা) যথেষ্ট ব্যাপক কি না ?

(খ) বৃত্তিটি রদ করতে গেলে বড়সড় বাধার সম্মুখীন হতে হবে কি না ?

(গ) পতিতাদের হেফাজতে থাকা মেয়েদের জাত/ধর্ম কি ?

(ঘ) তারা কিভাবে পতিতাদের হেফাজতে আসে ?

(ঙ) এই মেয়েগুলির জীবনে শেষপর্যন্ত কি ঘটে ?

(চ) পতিতারা মূলতঃ কোন জাতির ? বংশানুক্রমিক কোন পতিতা শ্রেণী আছে কিনা ? তাদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে ?

(ছ) এর সঙ্গে অপহরণের ঘটনা জড়িত কি না ?

এর উত্তরে জেলাশাসকরা যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন তার থেকে (ক) কুলীন প্রথা ও তার কুফল (খ) হিন্দু বিধবাদের করুণ অবস্থা (গ) দারিদ্র (ঘ) কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় এর ভূমিকা সম্পর্কে একটি অনবদ্য ছবি পাওয়া যায়।

এই ছবিটি আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যখন আমরা সমসাময়িক সাহিত্য বিশেষতঃ উপন্যাস গুলির সাক্ষ্যের সাথে তাকে মেলাই।

এইভাবে মহাফেজখানার সাক্ষ্য আমাদেরকে নতুন তথ্য দেয় বা দিতে পারে।

❑ Census Report

আজকের মানবী চর্চায় একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল 'নিরুদ্দিষ্ট নারী'। সর্বশেষ জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র কেরালা বাদ দিলে ভারতের আর প্রায় সব প্রদেশে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা কম (যদিও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটা উল্টো হয় — প্রতি হাজারে মেয়েদের সংখ্যাই একটু বেশী হবার কথা) অবস্থা সবচেয়ে খারাপ পাঞ্জাব, হরিয়ানার মত প্রদেশগুলিতে যেখানে প্রতি হাজারে মেয়েদের সংখ্যা 700 র কিছু বেশি। এই লাখ লাখ মেয়ে তাহলে গেল কোথায় ? ঘটনাটা ঘটেছে কন্যাভ্রুণ হত্যার মাধ্যমে এবং এর ফলে ভারতে অদূর ভবিষ্যতে এক সাংঘাতিক সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে। এছাড়াও Census আরো কিছু বিস্ময়কর তথ্য দেয় বিশেষতঃ মেয়েদের কাজ সংক্রান্ত (দ্রষ্টব্য নারীশ্রম সংক্রান্ত unit টি)।

ইতিহাস রচনার উপাদান

৭.১.২.২ ঃ মহাফেজখানা / অভিলেখ্যাগার বহির্ভূত — পবিত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহ

নারীর ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদান একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবক্ষেত্রে সরাসরি ঐতিহাসিক ঘটনা না হলেও বিগত দিনের সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। নারীদের ইতিহাসে অবহেলিত হবার একটা কারণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, পটপরিবর্তন বা বিপ্লবের ক্ষেত্রে নারীদের অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতি (আধুনিক সময়ের আগে) তাদেরকে,

তাদের কণ্ঠস্বরকে ইতিহাসে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সেটা হবার কথা নয়। আর তাই সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে সামাজিক ইতিহাস রচনা করলে নারীদের অস্তিত্বহীনতা অন্ততঃ কিছুটা হলেও কমত। কিন্তু সাহিত্যেও নারীদের এই অনুপস্থিতি ঘোচেনি। পিতৃসূত্রী (Patriarchy) মতাদর্শ যেমন সমাজে নারীদের কণ্ঠরুদ্ধ করেছে, একই প্রক্রিয়া চলেছে সাহিত্যের আঙিনাতেও। তবে সাহিত্যের সাক্ষ্য আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে এই নারীদের অবদমনের প্রক্রিয়া চলেছে। ফলে ধর্মশাস্ত্রই হোক বা লোকজ উপাদানই হোক সেগুলির পর্যবেক্ষণ নারীদের ইতিহাস নির্মাণের বা অনস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানে সহায়ক।

এছাড়া বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন থেকে নারীমুক্তি আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠল তখন থেকে মানবী চর্চার চৌহদ্দিতে সাহিত্যক্ষেত্রে অশ্রুত নারীকণ্ঠের খোঁজ শুরু হয়। সাধারণভাবে নারীকণ্ঠ কম হলেও একেবারে ছিল না তা নয়। ঘোষা বা লোপামুদ্রার মত ব্যতিক্রম ছাড়াও ছিল বৌদ্ধ থেরীদের রচিত গীত **থেরীগাথা**, মধ্যযুগীয় ভক্তিসাহিত্যে মীরা বা লাল্লার মত সাধিকা কবিদের গীতে আমরা নারী কণ্ঠের ছবি পাই। তার মধ্য দিয়েও পিতৃসূত্রী মতাদর্শের বিরুদ্ধে নারীদের স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য কিভাবে রক্ষিত হয়েছে তা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে।

James Mill এর সময় থেকেই এই ধারণা বদ্ধপরিকর হয় যে — যেহেতু একটি সংস্কৃতি বা সভ্যতার উৎকর্ষ/অপকর্ষের মাপকাঠি হল সমাজে নারীর স্থান এবং ভারতীয় সভ্যতা এই বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে তাই এটি খারাপ সংস্কৃতি। কিন্তু পাশাপাশি প্রাচ্যবাদী গবেষকদের/চিন্তাবিদ্‌দের রচনা থেকে যে মতটি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা হল ঋগ্বেদের যুগে সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে কিন্তু পরে এর ক্রমাবনতি ঘটে। বিশেষতঃ মুসলমান আক্রমণের ফলে পর্দা প্রথা থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষতিকর অনুশাসন মেয়েদেরকে সামাজিক নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য, তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী প্রনোদনার অনুসন্ধান বেশ কিছুটা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে, তবে বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের ভারতীয় সাহিত্যের সাক্ষ্য এই ধারণাকে কিছুটা প্রমাণ করে।

প্রাচীন যুগ

ঋগ্বেদের রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় যে ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ "পরিবার মণ্ডলে" (২-৭ম) নারীদের মুক্ত জীবনের ছবি দেখতে পাই। নারীর শরীর, যৌনতা নিয়ে এই পর্যায়ে রচিত ঋক্ গুলির মধ্যে অসংকোচ উক্তি দেখা যায়। দেবী উষাকে কখনো কুমারী কখনো সূর্যের বধু হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সূর্যের পশ্চাতে নয়, তার স্থান সূর্যের আগে। নাভানেদিষ্ঠ সুক্তে পিতাপুত্রীর এবং যমযমী সুক্তে ভাইবোনের অবৈধ প্রণয় চিত্রিত হয়েছে।

নারীর গৃহকর্ম সম্পর্কে তথ্য ঋগ্বেদে নেই। ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও যোদ্ধী নারীর উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন মুদগলিনী [নামের আক্ষরিক অর্থ যিনি মুগুর ব্যবহার করতে পারেন] তবে শিক্ষায় নারীর

অধিকার সম্ভবতঃ প্রাগার্য, আর্য সংমিশ্রণের যুগেই হরণ করা হয়েছিল কারণ এই সময় নারীদের উপনয়নের অধিকার চলে যায়। আর যেহেতু উপনয়নই বেদপাঠের দ্বার স্বরূপ তাই উপনয়নের অধিকার চলে গেলে শিক্ষার অধিকার মেয়েরা হারিয়ে ফেলে। তবে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার হারালেও কোন সদয় পিতা, সহানুভূতিশীল ভ্রাতা বা স্বামীর সাহায্যে মেয়েদের কেউ কেউ শিক্ষা অধিগত করে 'আচার্যা', 'উপাধ্যায়া' পদ সিদ্ধ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাঁর পত্নি মৈত্রেয়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ঋগ্বেদে বিশ্ববারা, শাশ্বতী, ঘোষা, অপালা, গার্গী ইত্যাদি 'ঋষিকা' বা নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। 'সোহহম্' তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তার নাম অম্ভৃণ মুনির কন্যা বাক্। তবে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যে খুব প্রশস্ত ছিল না তা প্রমাণিত হয় যখন সেই যাজ্ঞবল্ক্যই গার্গীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাঁকে হুমকি দেন যে প্রশ্ন করলে তাঁর মাথা খসে পড়বে।

বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগে নারীরা প্রধানতঃ বধু বা জননী হিসাবেই চিত্রিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অবিবাহিতা নারীর উল্লেখ কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায় — যেমন জরৎকুমারী, বৃদ্ধকুমারী ইত্যাদি কিন্তু পরে মহাকাব্যের যুগে মেয়েদের বিবাহ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বৃদ্ধা তপস্বিনী কুনিগর্গের কন্যাকে বলা হয় যে বিবাহ না করলে তাঁর সারা জীবনের সমস্ত তপশ্চর্যা ব্যর্থ হবে তাই তিনি একরাতের জন্যে হলেও বিবাহ করতে বাধ্য হন।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে 'নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতি সেবা বেদাধ্যায়ন এবং পতিগৃহে বাসই গুরুগৃহে বাস।' অর্থাৎ নারীর পক্ষে বিবাহ, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির পরিচর্যাই হল শিক্ষার বিকল্প। গৃহকর্ম ও কিছুটা বাদ্য গীতে শিক্ষা ছাড়া নারী মোটের উপর অশিক্ষিতই থেকে যেতেন ফলে স্বাধীন কোন বৃত্তিতে অধিকার না জন্মানোয় তিনি সম্পূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। একমাত্র গণিকাকেই রাষ্ট্র নিজ খরচে চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত করে তুলত।

গৃহ্যসূত্র গুলিতে বধূকে সম্পূর্ণভাবে গৃহকর্মে নিবেশিত পতির ইচ্ছার অনুবর্তিনী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এছাড়াও পুরুষের বহুবিবাহের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে একজন পুরুষই বিধেয়। একদিকে ব্যক্তি মালিকানার উৎপত্তির ফলে একগামীতার, নিজ ঔরসজাত সন্তান (অবশ্যই পুত্রসন্তান) এর চাহিদা, অন্যদিকে নারী স্বাধীন বৃত্তিহীন, নিজ দেহ রক্ষার কৌশল জানা নেই, ফলে যখন একের পর এক যবন, শক, পহ্লব বা হুন আক্রমণ হয়েছে তখন এই একান্ত পুরুষনির্ভর নারীর যৌনশূচিতা রক্ষায় যৌবনের পূর্বেই বিবাহ দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে এবং তাকে দৃঢ় অবরোধে রুদ্ধ করে রাখা শুরু হয়। নারী হয়ে ওঠে নরকের দ্বার —

শতপথ ব্রাহ্মণ এ বলা হয়েছে "নারী, কুকুর, কালো পাখী — এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয় ; নইলে আলো ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ সব একাকার হয়ে যাবে।" নারী শুধু যে নিজে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত না তাই নয়, তার সম্পর্কে অনুষ্ঠানগুলিতেও কোনো মন্ত্রোচ্চারণ নেই। শুধু গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন ছাড়া তার নিজস্ব কোনো অনুষ্ঠানও নেই — অনুষ্ঠানগুলির একটিই উদ্দেশ্য জাতকটি যেন কন্যা না হয়ে পুত্র হয়।

মহাভারতে দেখতে পাই শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম উপদেশদান কল্পে যুধিষ্ঠিরকে বলেন "নারীর চেয়ে অশুভ আর কিছুই নেই, পুত্র, পুরুষের উচিত সর্বদা নারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা।" আশস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে "কালো পাখি, শকুনি, বেজি, ছুঁচো, কুকুর, শুদ্র ও নারী" হত্যার জন্য একদিনের প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট। নারী পণ্যের মতই বিনিময়যোগ্য পদার্থ — শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী সারস্বতানাময়ন যজ্ঞের দক্ষিণা হল একটি মাদি ঘোড়া ও সন্তানবতী একটি নারী।

তবে এক্ষেত্রে বলা উচিত যে মহাকাব্য দুটিতে নারী চিত্রনে দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরটিতে নারী তুলনায় স্বাধীন — সাবিত্রী একাই স্বামী সন্ধান করতে বেরিয়েছিলেন, অম্বা নিঃসঙ্কোচে নিজের নির্বাচিত বরের নাম ভীমকে প্রকাশ করে এবং তার আপত্তি স্বীকৃতও হয়। শকুন্তলাও সন্তান সমেত দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হন এবং তাঁকে বিস্তর কটুবাক্য বর্ষণ করেন। দ্রৌপদী কীচককে পদাঘাত করেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটিতে নারীর অবমাননা চরমে উঠেছে — ব্রহ্মচারী গালব রাজা যযাতির কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে যযাতি তাঁকে নিজের সুন্দরী তরুণী কন্যা মাধবীকে দেন। গালব মাধবীকে তিন বছরে তিনজন রাজাকে ভাড়া দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। পরে মাধবী তপশ্চারিণী হয়ে যান। যখন স্বর্গারোহণকালে যযাতি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর পুণ্যে কিছু কম পড়েছে তখন তিনি মাধবীরই সঞ্চিত পুণ্যের কিছু অংশ নিয়ে স্বর্গে যান। ফলে নারীর দেহ, মন বা আধ্যাত্মিক কোন স্বাধীনতাই ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে যখন ব্রহ্মণ্যবাদী যাগযজ্ঞভিত্তিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটি ধর্ম আন্দোলনের সূচনা হয়। তখনও সামগ্রিকভাবে এই অভিমতই জোরালো ছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রৌঢ়া গৌতমীকেও দীক্ষা দিতে চাননি। পরে অবশ্য বৌদ্ধ সংঘে সন্ন্যাসিনী বা থেরীদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। এদেরই রচিত 522 টি পংক্তি, যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, বলা যায় নারীদের নিজস্ব রচনার প্রাচীনতম সংকলন। এই রচনার সাথে সংযুক্ত **পরমত্ত দিপনী** - তে থেরীগাথার রচয়িত্রীদের জীবন বৃত্তান্তও রয়েছে। এর থেকে বা গানগুলি থেকে দেখা যায় সন্ন্যাসিনীরা তেল নুন লকড়ির প্রাত্যহিকতায় বা স্বামীর জ্বালায় বা অন্তরের কোন গোপন তাড়নায় ব্যথিত হয়ে পাগলিনীর মত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই যন্ত্রণার থেকে মুক্তিদাতার সন্ধান পেয়েছেন এবং সংসার ত্যাগ করে জীবনের বৃহত্তর সার্থকতার সন্ধান করেছেন।

বৌদ্ধ/জৈন ধর্মের প্রাধান্য খর্ব করেই গুপ্তযুগ থেকে আবার নবরূপে ব্রহ্মণ্য অভিমত জোরদার হয়েছে। এই সময়কালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে পিতৃসূত্রি মতাদর্শকে জোরদার হতে দেখা যায়। এর মধ্যেই আসে ইসলাম এবং এমন এক ঐতিহাসিক অভিমত দেওয়া হয়ে থাকে যে এর ফলে সামাজিক অনুশাসনের নিগড় মেয়েদের উপর আরো চেপে বসে। কিন্তু এই সময়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটছিল ভারতের প্রায় সর্বত্র তাতে একটি প্রক্রিয়া বিভিন্ন রুপে প্রায় সর্বত্র প্রতিয়মান — আগেকার উপজাতি সমাজের দেবীদের ব্রহ্মণ্য দেবদেবীর গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে দক্ষিণে যে ভক্তি আন্দোলনের উৎপত্তি এবং পরে বিভিন্ন রুপে সারা ভারতে বিকাশ ঘটল সেখানেও সমাজে নারীর ঐতিহ্যগত অবস্থান বড় সড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়ল। এই দিক পরিবর্তন আঞ্চলিক সাহিত্যগুলিতে খুবই

স্পষ্ট।

❑ মধ্যযুগ

মধ্যযুগের ভক্তি সাধিকাদের একটি বড় অংশই হল নারী যারা তাঁদের সাধনার কথা, ঐশ্বরিক প্রেমাষ্পদের প্রতি ব্যাকুলতার কথা অপূর্ব কাব্যে বা গানে লিখে গেছেন। এই ভক্তিগীতি তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস বিশেষতঃ মানবীচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর। কাশ্মীরে লাল্লা বা লাল বৈদ তাঁর গানে শাশুড়ির গঞ্জনা বা ঘরকন্নার কাজের তুচ্ছতাকে তুলে ধরেছেন। মহারাষ্ট্রের ভক্তি সাধিকা বহিনাবাঈ ও সংসারের প্রাত্যহিকতায় পিষ্ট হতে হতে তুকারামের স্বপ্নাদেশে কিভাবে 'মুক্তি' ঘটল তার বর্ণনা দেন। মীরাবাঈ ও সংসার। পিতৃসূত্রী মনোভাব এর চাপ সয়েছেন। এঁদের রচনায় তাই খাঁচায় বন্দী নারী মনের যন্ত্রণা ও তার থেকে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। এছাড়াও মনে রাখতে হবে যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে যে হস্তশিল্পের বিপুল বিকাশ ঘটেছিল, ভক্তি আন্দোলনের বস্তুগত ও সামাজিক ভিত্তি ছিল সেই বিপুল হস্তশিল্পী শ্রেণী। এই পরিবারগুলিতে — গৃহশ্রমভিত্তিক হস্তশিল্প উৎপাদনে মহিলাদের শ্রম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই এই সমাজের নারীরাও তুলনায় যথেষ্ট আত্মসচেতন (ব্যতিক্রমও আছে — অন্যান্য দিকে কবীরের দূরদৃষ্টি — তাঁর আলোকপ্রাপ্ত মনের তুলনা না থাকলেও তাঁর মধ্যে পিতৃসূত্রী মানসিকতা সুস্পষ্ট — তিনি ছিলেন জুলাহ্ বা তাঁতি)।

বাংলায় মধ্যযুগের সাহিত্যও নারী ইতিহাস, রচনার গুরুত্বপূর্ণ আকর। **ব্রতকথা** গুলিতে ব্রহ্মণ্যধারা বহির্ভূত ব্রাত্য স্ত্রীলোকেদের উৎপাদন ও প্রজনন সম্পর্কিত পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মণ্যধারার দেবতাদের বদলে যুয়া-ভাদালি, ধাতা-কাতা, সেঁজুতি, ইতু প্রভৃতি মেয়েদের দ্বারা সৃষ্ট দেবী/দেবতাদেরই পূজা করা হয়েছে। এই প্রাচীন নারীদের দ্বারা সংরক্ষিত কাহিনীগুলিই পরে হিন্দু-মুসলমান যৌথ উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। চন্দ্রাবলীর পুঁথি, মধুবালার কেচ্ছা (কিস্‌সা), মালঞ্চ কন্যার কেচ্ছা ইত্যাদিতে কথক বা গায়ক মুসলমান, শ্রোতা নারী। এই ধরনের সাহিত্যে মেয়েদের অনেক রকমের স্বাধীনতা ভোগ করতে দেখা যায়। এই লোকধারার আরেকটি উপাদান হল নাথপন্থী সাহিত্য যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল **ময়মনসিংহ গীতিকা**। এখানে প্রধান চরিত্র ময়নামতী হাড়িসিদ্ধা, তিনি তাঁর স্বামীর গুরুপদ লাভের অভিলাষী এবং পতিহন্তারিকা বা ব্যাভিচারিণী হবারও ইঙ্গিত রয়েছে। তথাপি তিনিই এই রচনার শ্রেষ্ঠ নায়িকা। এই ধরনের রচনায় পৌরাণিক মতাদর্শের প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না এবং নারী ভাবনাও অধিক মানবিকতাবোধসম্পন্ন। তবে এই সাধনার গুহ্যপদ্ধতি ধীরে ধীরে এদের সাধারণ মানুষের অগম্য করে তোলে। এই লৌকিক সম্প্রদায়গুলি পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানের সাথে বিশেষতঃ নিত্যানন্দের পরবর্ত্তী সময়ে মূলধারায় মিশে যায় — অষ্টাদশ শতকের বাংলায় লৌকিক ধর্মচর্চার যে বিস্ময়কর বিস্ফোরণ ঘটে — আউল, বাউল, ফকিরী, নেড়ানেড়ি, বলাহারি, সাহেবধণা ইত্যাদির মধ্যে এদের গুহ্যসাধনা বিকশিত হয়। এই লৌকিক সম্প্রদায়গুলির জীবনচর্যা, ধর্মমার্গ ব্রহ্মণ্যবাদের মানদণ্ডে ভ্রষ্টাচারের লক্ষণ হলেও মানবিক চেতনায়

বিশেষতঃ নারীর প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গীতে উন্নত ছিল যা এই সম্প্রদায়গুলির সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছিলাম যে মধ্যযুগে লৌকিক দেবদেবী বিশেষতঃ দেবীদেরকে পৌরাণিক দেবতাগোষ্ঠীতে স্থান দিয়ে উপজাতিদের সমাজে আত্মীকরণ একটি সর্বভারতীয় প্রক্রিয়ার অঙ্গ এবং এর প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা হল মঙ্গলকাব্য — মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের মধ্যে এই আত্মীকরণ এর প্রক্রিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান। এর ফলে এই সাহিত্যে একটি মিশ্র ধারা গড়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যের বেহুলা চরিত্রে একদিকে দৃঢ়চেতা স্বাধীন রমণীর সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করবার মধ্যে আর্যেতর কৌম জীবনের ছাপ। অন্যদিকে সতীত্ববোধ এবং বিবাহিত স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠায় পৌরাণিক আদর্শের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

পুরুষের একাধিক বিবাহের ফলে সতীনের প্রতি বিদ্বেষ, স্বামীকে স্ববশে রাখার জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ জাতীয় জিনিষ যেমন ছিল তেমনি মেয়েদের কিছু কিছু স্বাধীনতার আভাসও মেলে।

লৌকিক ধারায় **বারমাস্যা** গুলিতে মেয়েদের সুখদুঃখের রোজনামচা পাওয়া যায় — চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও ফুল্লরার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বারমাস্যা, আলাওলের পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা ইত্যাদি।

সেন বংশের সময়তে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হলে বা পরে স্মার্ত রঘুনন্দনের নিয়মকানুন এর ফলে নারীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। রঘুনন্দন খাদ্যাখাদ্য বিচার, নিরম্ব উপবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে সহমরণে প্রাণত্যাগ না করলে বিধবাদেরকে জীবন্মৃত করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যেই এলেন চৈতন্যদেব। তাঁর সংকীর্তনে পরিচয় অপরিচিতের ভেদ ভুলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নগরবাসী অংশগ্রহণ করেছেন — 'বুলে স্ত্রী-পুরুষ সর্বলোক প্রভুর সঙ্গে / কেহ কাহ নাহি জানে পরমানন্দ রঙ্গে।' ফলে মেয়েরা ধর্মীয় কারণে হলেও কিছুটা গতানুগতিকতা ভুলতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। এই সময় রচিত মহাপ্রভুর জীবনী বা বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা এর ছাপ দেখতে পাই। তত্বগতভাবে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিচারে বৈধী প্রেমকে (স্বকীয়া) রাগানুগা প্রেম এর (পরকীয়া) পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে বৈষ্ণবমত প্রচারের জন্য পাঠাচ্ছেন এই নির্দেশ দিয়ে — 'যতেক অস্পৃশ্য, দুষ্ট, যবন, চণ্ডাল / স্ত্রী, শুদ্র, আদি যত অধর্ম রাখাল' — কে উদ্ধার করতে হবে। ফলে নারীদের অন্তত ধর্মক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। এটি অন্ততঃ গৌড়ীয় মতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিকযুগ

ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। আগেই দেখেছি James Mill এর মতে সামাজিক উন্নতির মানদণ্ড সমাজে নারীর স্থান ফলে সংস্কারপন্থী উপযোগিতাবাদী এবং ঐতিহ্যপন্থী প্রাচ্যবিদ্‌দের মধ্যে বা রামমোহন রায়ের মত পরিবর্তনকামী বা রাধাকান্ত দেবদের মত স্থিতাবস্থার সমর্থকদের মধ্যে নারী হয়ে ওঠে বিতর্কের

কেন্দ্রবিন্দু। এর প্রতিফলন সাহিত্যেও পড়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার একটি চরিত্রলক্ষণ হল Novel (বাংলায় উপন্যাস)। প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে এই সাহিত্য-রুপটির আদলটি কিছুটা তৈরি হলেও পরিপূর্ণতা পায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর হাতে। সাহিত্যের এই নবতম সংযোজনের সাথে প্রথম থেকেই নারী সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ ছিল প্রথমত পাঠিকা হিসাবে ও পরে স্রষ্টা হিসাবে। উপন্যাসের উৎপাদন ও বণ্টনের সাথে প্রথম থেকেই মেয়েদের যোগাযোগ থাকায়, প্রগতি ভাবনার সাথে নারীর প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থান বা নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে নগর কলকাতার সামাজিক বিকাশ, নবজাগরণ বা বাবু সংস্কৃতি সবের সাথে জড়িয়ে থাকে বিধবাদের অসহনীয় কষ্ট, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নববাবুবিলাস) বা কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচার নক্সা) বলছেন যে নব্যবাবুদের একটা বড় চরিত্র লক্ষণ হল বেশ্যাবাড়ী যাওয়া।

> "বেশ্যাবাজীটি আজকাল এ শহরের বাহাদুরির কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোশাখের মধ্যে গণ্য অনেক বড় মানুষ বহুকাল হল মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরনার্থে রয়েছে ..... কলকেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েচে ....."

ইংরেজ সরকার নিজের গোরা পত্তনদের যৌন ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতেই মূলতঃ 1868 সালে Contagious Disease Act বা Act XIV বাংলায় 'চৌদ্দ আইন' চালু করে। এমনকি ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে পতিতাবৃত্তি নিবারণের কথাও ভাবতে থাকেন। এতে সামিল হন পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই সময়ে তাই পতিতাদেরকে নিয়ে ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি তারা কোথা থেকে আসে এ নিয়েও আলোচনা হয় এবং দেখা যায় অল্পবয়সী হিন্দু বিধবারা বিরাট সংখ্যায় দেহব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছেন। বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে নারী বিশেষতঃ বিধবা নারীদের অবমাননা এবং সবশেষে পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হওয়ার কাহিনী ফুটে উঠেছে।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' এর মত উপন্যাসে কুলীনপ্রথা, কুলীনদের বহুবিবাহ, বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং পতিতা বৃত্তির মধ্যে কার্যকারণ সূত্রগুলি বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখতে পাই —

> "শ্রীমতি বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিশদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্যমুখীর পিতার গৃহত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, কেহ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতি আর ফিরিয়া আসিল না।"

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দেখা যায় স্বামী পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীকে বিরিঞ্চি দত্তের পাচক

এক ভঙ্গ কুলীনের সাথে বিয়ে দিলেন (বা দিতে বাধ্য হলেন)। বিয়ের দিন সত্তর টাকা বরপণ নিয়ে লোকটি সেই যে গেল আর ফিরল না। এই পরিস্থিতিতেই পরিস্থিতির তাড়নায় শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী দেহোপজীবিনীতে রূপান্তরিত হয়।

❑ আত্মজীবনী

উপন্যাস ছাড়াও মেয়েরা অনেকেই নিজেরাই কলম ধরেছেন। একাধারে দেহব্যবসায় জড়িত, আবার অন্যদিকে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ-এর শিষ্যা হিসাবে রঙ্গমঞ্চের সফল অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী বা 'নটী বিনোদিনী' লিখেছেন 'আমার কথা'। এছাড়া প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্বকথা', কৈলাসকামিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধুর ডায়েরী', হেমন্তবালা দেবীর 'নিজের কথা', সুধীর গুপ্তার 'আমার সেদিনের কথা' ইত্যাদি আত্মজীবনীগুলিতে মেয়েদের নিজের জবানীতে তাদের কথা জানা যায়।

মেয়েদের লেখা উপন্যাসও সমাজ জীবনের একটা ছবি তুলে ধরেছে। গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' বা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' যৌথ পরিবারের হই চৈ এর মধ্যেও কিভাবে নারী জীবনে শৃঙ্খল পরিয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। গিরিবালা দেবীর বিমু বা আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী শেষপর্যন্ত এই অর্গল খুলে বাইরে বেরনোর চেষ্টা করেছে।

ধর্মীয় বা কাব্য অথবা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মহিলারা যে ভাবে চিত্রিত হন তা ঘটে সমাজ বাস্তবতা, সামাজিক মতাদর্শের এক জটিল মিথষ্ক্রিয়ার ফলে। এই সাহিত্যিক উপাদান মেয়েদের না বলা ইতিহাস পুনর্গঠনে নব উন্মেষ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে।

৭.১.২.৩ ঃ শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) / লেখগুলির সাক্ষ্য

আমরা দেখেছি যে ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, মহিলাদের ধর্মক্ষেত্রে জনসমক্ষে ভূমিকা ছিল খুবই নগন্য। **ধর্মশাস্ত্র** গুলিতে হিন্দু রমণীদেরকে মূলত পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় ধর্মীয় অংশগ্রহণ বা দান ধ্যানের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন স্বামী বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল। ধর্মশাস্ত্রে বা **আগম** সাহিত্যে পুরুষদের ক্ষেত্রে যাজ্ঞিক, পুরোহিত সন্ন্যাসী বা শাস্ত্রী হবার (নৈতিক বা সামাজিক) মানদণ্ড বেঁধে দিলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বজনসমক্ষে পালনীয় ভূমিকার ব্যাপারে এই কেতাবগুলি নিরব। জৈন বা বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলিতে মহিলাদের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী হবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে (বৌদ্ধ ধর্মে) সন্ন্যাসিনীরা সন্ন্যাসীদের অধিনেই থাকবে। তাদের কার্যকলাপ, গতিবিধির উপর কিছু গণ্ডী টেনে দেওয়া হয়েছিল।

তবে এই ধরনের নীতিমূলক বই (normative text) থেকে আমরা সমাজে মহিলাদের অবস্থান বিষয়ে যে ছবি পাই তা অবশ্যই একপেশে। অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের গায়ে খোদাই যে

প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় তার অধ্যয়ন করলে সমাজে বিশেষতঃ ধর্মীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে সাবেক ধারণা অনেকটাই বদলে যাবে।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মন্দির বা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মক্ষেত্রগুলিতে দান বা দক্ষিণা দেবার কথা মন্দির গাত্রে বা ধর্মীয় স্থানে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে ফলাও করে বলা আছে। বস্তুতঃ এই লিপিগুলি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস — সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকর উপাদান ইদানিংকালে একটি ঐতিহাসিক অভিমত ক্রমেই জোরদার হচ্ছে যে নীতি গ্রন্থ (normative text) গুলি, যার উপর ভিত্তি করে এতদিন ভারতীয় সমাজপদ্ধতির ইতিহাস লেখা হয়েছে, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলিতে যে আদর্শায়িত সমাজের ছবি দেখা যায় ভারতীয় সমাজ ছিল বাস্তবে তার থেকে অনেকটাই আলাদা। এই অভিমতের প্রবক্তারা তাদের অভিমত প্রমাণের জন্য বেছে নিয়েছেন এই লেখ বা শাসন যার মধ্যে সমাজের বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে। Cynthia Talbot বা Leslie orr এর মত গবেষিকারা বর্ণ/জাতি বা নারীর স্থান নিয়ে যে প্রথাসিদ্ধ ধারণা ছিল তার পুনর্লিখন করতে চাইছেন লেখ - এর সাক্ষ্য প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে।

দক্ষিণ ভারতে যেহেতু এই সাক্ষ্যের পরিমাণ প্রচুর (প্রায় ২০,০০০ লেখ এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে) তাই এই বিপুল তথ্যরাজির ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস নতুন করে দেখাই যেতে পারে। এই লেখ গুলিতে কি বলা থাকত ? মূলত ধর্মীয় স্থান গুলিতে পুণ্যার্থে দান বা ধর্মীয় স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার কথা মন্দির / ধর্মীয় স্থানগুলিতে উৎকীর্ণ থাকত। কারা এই দান করতেন ? মূলতঃ সমাজের উঁচুতলার মানুষ — রাজা, রাজন্যবর্গ, জমির মালিক, বণিক, রাজমহিষি বা রাজপরিবারের মহিলারা এবং অবশ্যই সাধারণ মহিলারাও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেন। Leslie Orr তাঁর গবেষণায় দেখেছেন যে মন্দির এর মহিলারা — যারা দেবদাসী নামে পরিচিত তারাও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিষ দান করেছেন। জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও মহিলাদের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। বস্তুতঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে দানের ক্ষেত্রে রাজ পরিবারের মহিলাদেরকে বাদ দিলেও মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

এই অনুসন্ধান কিভাবে আমাদের নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা বদলাতে পারে ? গতানুগতিক চিন্তায় দান সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বা সংসারত্যাগী ধর্মসাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেই করার কথা ধর্মশাস্ত্র বা জৈন, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে দান এর উপলক্ষ মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের উপস্থিতি অকিঞ্চিৎকর নয়। এদের অনেকেই অর্থনৈতিক ভাবে যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলেন।

দান সম্পর্কে আলোচনায় অনেকেই একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন — যাদের পক্ষে সন্ন্যাস বা ত্যাগের কঠিন পথে পুণ্যার্জন সম্ভব নয় (মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধও ছিল) তারাই কিছু কাঞ্চনমূল্যে সহজ রাস্তায় পুণ্যার্জনে নেমেছেন এমন একটা ধারণা কখনো কখনো দেবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে দাতা দান করেছেন অন্য কোন ব্যক্তির পুণ্যাভিলাষে কাজেই

স্বার্থপরতার দাবি ধোপে টেঁকে না। দ্বিতীয়তঃ মধ্যযুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে দান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

লেখ এর সাক্ষ্য পুর্ণাঙ্গ নয়। সমাজের উচ্চবর্গীয়দের ক্ষেত্রে কিছু কথা বললেও লোকজ উপাদান সম্পর্কে এই উপাদান তুলনায় কম কথা বলেছে। তথাপি ধর্মশাস্ত্র বা সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে সাধারণতঃ যে ছবি ভেসে ওঠে, লেখমালার সাক্ষ্য তাকে আংশিকভাবে হলেও বদলাতে পারে। বিশেষতঃ মধ্যযুগে মন্দির বা ধর্মস্থান গুলিতে মহিলাদের উপস্থিতি একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয় বলেই মনে হয়।

৭.১.২.৪ ঃ NON-ARCHIVAL – চিত্রকলা

❑ Paintings

চিত্রকলায় নারীর রূপ চিত্রণে যুগে যুগে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্য দিয়ে আর্টের সংজ্ঞা, তার পৃষ্ঠপোষকতা, শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার উভয় পক্ষেরই দৃশ্য মতাদর্শ (visual ideology) -র পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ছবি নারীদের ইতিহাস রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ আকর।

প্রথাগতভাবে নারীর চিত্রণে— তা সে দেবীর রূপই হোক বা প্রেমের প্রতীক রাধাই হোক, কতগুলি type তৈরি করা হত। এর পেছনে বিভিন্ন শাস্ত্রের নির্দেশিত বিধি কাজ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে — যেমন **কামশাস্ত্র**, নারী, পুরুষকে তাদের দৈহিক গড়ন, চরিত্র লক্ষণ অনুযায়ী কতগুলি টাইপ-এ ভাগ করা হত। যেমন 'শঙ্খিনী', 'পদ্মিনী' ইত্যাদি এবং চিত্রশিল্পেও এই চরিত্র লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাহিত্যে নারীর রূপ বর্ণনায় যেমন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চিত্রকল্প হিসাবে উঠে এসেছে — যেমন মৃণাল গ্রীবা, বা পটলচেরা চোখ ইত্যাদি, ছবিতেও তেমনি সেগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিল্প শাস্ত্রের নিয়ম মেনে।

আদি মধ্যযুগে তন্ত্রের প্রভাবে নারীর চিত্রণ করা হয়েছে শক্তিরূপিনী হিসাবে। তন্ত্রে নারী ছিলেন পুরুষের আধিদৈবিক ক্ষমতা উপার্জনের 'যন্ত্র' স্বরূপা। বৌদ্ধ সহজিয়ারাও মোক্ষ অর্জনে যে বিভিন্ন যৌন-যৌগিক ক্রিয়াকলাপ চালাতেন নারী সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বামাচারী তান্ত্রিকরা নিচুজাতের মেয়েদের (ডোমনী, চণ্ডালিনী) এই কাজে নিয়োগ করেছেন। এই যুগের শিল্পে এই প্রভাবশালী মতাদর্শের ছায়া পড়েছে।

মধ্যযুগে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক নাগাদ তন্ত্র-এর প্রভাব কাটিয়ে দেখা দিল ভক্তির প্রভাব। মতাদর্শগত এই পরিবর্তন দৃশ্য মতাদর্শ (visual ideology) পরির্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল যার প্রভাব আমরা 'নায়িকা'-র চিত্রণে দেখতে পাই। বাংলা তথা পূর্ব ভারতে এই সময়ে চৈতন্য ও তার পর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাবে 'যুক্তি' ও 'জ্ঞান' এর উপর স্থান পেল 'ভক্তি'। ভক্ত এক অতিপ্রিয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজের ভিতর ঈশ্বরকে অনুভব করেন যার বিভিন্ন রূপ হল 'দাস্য', 'সখ্য' 'বাৎসল্য' ও 'মাধুর্য্য' ইত্যাদি। চৈতন্য নিজে রাধাভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেন। এর প্রভাবে

দেখা যায় পদাবলী সাহিত্যে 'অভিসারিকা' রাধা একটি প্রধান চরিত্র। কীর্তন এবং বাউল গানের মধ্য দিয়ে রাধার অভিসারকেই ভক্তের ভগবৎ উপলব্ধির প্রধান দ্যোতক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

এই ভাবনার প্রভাবে 'নায়িকা'র বিভিন্ন ভাব উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কতগুলি টাইপ তৈরি হল — যেমন 'বিপ্রলব্ধ' (হতাশাগ্রস্ত), 'উৎকণ্ঠিতা', 'খণ্ডিতা' (কুপিত) ইত্যাদি। এই সময়ে আঁকা **রাগমালা** বা **বারমাস্যা** বা 'পাহাড়ী' অনুচিত্রে (miniature বা painting) ছবিতে সেইভাবে সময় এবং পারিপার্শ্বিকের তারতম্য অনুযায়ী 'নায়িকা'র রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্য উত্তর যে সমস্ত উত্তরাধিকারী (successor) রাষ্ট্রগুলি তৈরি হল যেমন মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক বাংলার নবাবী, সেখানকার দরবারে এই ধ্রুপদী 'নায়িকা' চরিত্রের সাথে, বৈষ্ণব ভক্তি ও সুফী ধর্মভাবনার মেলবন্ধনে তৈরি হল আরেকটি নতুন শিল্পভাষা। শিল্পীদের মডেল ছিলেন দরবারের বারাঙ্গনারাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণবিযুক্ত এক আদর্শ নারীর খোঁজ শুরু হল। মোটিফ উঠে এল কৃষ্ণলীলা বা নল দময়ন্তির মত উপকথাগুলি থেকে। মুর্শিদাবাদ শৈলীর একটি ছবিতে দেখি যে 'পাহাড়ী' মিনিয়েচার-এর আদলে আঁকা রাধাকে মুর্শিদাবাদ-এর নবাবী প্রাসাদ-এর পরিসরে (space) উপস্থাপিত করা হয়েছে। নবাব সিরাজউদদৌলাকেও এইভাবে **রাগমালা** (ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ রাগিণীর চিত্রে উপস্থাপনাকে **রাগমালা** পেইন্টিং বলা হয়), ছবিতে নায়ক বেশে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রশৈলীকে এইভাবে সমসাময়িক দর্শকের চাহিদা মোতাবেক অদলবদল করা হয়েছিল তবে দৃশ্য মতাদর্শ নারীর অলঙ্করণে খুব বেশি পরিবর্তন করেনি।

ঔপনিবেশিক শাসনের সময় 'নায়িকা'-র রূপ নির্মাণের যে প্রথাসিদ্ধ প্রকরণ ছিল বা নারীদের যে ভাবে দেখান হয়েছে তাতে প্রথম জোরালো ধাক্কা লাগে। শুধু তাই নয় ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ইউরোপীয় শিল্পীরা যে সমস্ত নতুন ধারণা এবং প্রকরণ কৌশল (technique) আমদানি করলেন — অবয়বের বাস্তবতার (reality) ধারণা বা তেলরঙ (oilpainting), তাতে 'প্রথাগত' এবং 'আধুনিক', 'ধ্রুপদী' ও 'বাজারী' শিল্পের ফারাক গড়ে উঠল।

1780 র দশক থেকে যে সমস্ত ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী খোদাই শিল্পী (etching) -বা ভারতে এসেছেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রভাবে তাঁরা আমদানি করলেন আরেক ধরনের চিত্রভাষা, দৃশ্য মতাদর্শের। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক কেন্দ্রের পতনে/অবসানে দরবার আশ্রিত শিল্পীদের মর্যাদার অবনতি হল। তারা রূপান্তরিত হল 'কারিগর' এর স্তরে। এরা সৃষ্টি করল 'বাজার' (bazzar) এর চিত্রশৈলী যা দেশজ উৎপাদনকে টিকিয়ে রাখল। এদেরকে দিয়েই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতি / বর্ণের নারী পুরুষদের টাইপ / ছাঁচে ঢালা কিছু ছবি আঁকিয়ে নথি নির্মাণের (documentation) এর কাজে লাগালেন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ শিল্পীরা এক অবক্ষয়ী সমাজের বিলাসজর্জর নবাব, বাদশাহদের প্রতিকৃতি অঙ্কনের পাশাপাশি নর্তকী বা ইংরেজ সাহেবদের 'দেশী' বিবিদের চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে রহস্যসঙ্কুল, কামনা মদির 'প্রাচ্যে'র প্রতিরূপ নির্মাণের কাজে লাগলেন — তৈরি হল 'নাচ গার্ল' (nautch girl) এর টাইপ। অন্যদিকে জোফানী বা অন্যান্য শিল্পী অঙ্কিত ইউরোপীয় পরিবারগুলির চিত্রে ভারতীয় নারী

পরিচারিকা হিসাবে চিত্রিত — সামাজিক ব্যবধান যথেষ্ট স্পষ্ট।

ভারতীয় 'কারিগর'-দেরকে দিয়ে যে 'কোম্পানী পেইন্টিংস' আঁকানো হল তাদের দক্ষতা বা সম্মান উপরোক্ত শিল্পীদের থেকে কম ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার ছাপ পড়ল এই প্রতিকৃতিগুলিতে। রেনাল্ডী বা টিলি-র ছবিতে 'প্রাচ্য নারী'র কমনীয়তা বা নারীত্ব (femininity) এই সব ছবিতে অন্তর্হিত। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত — যেমন ধোপা, নাপিত ইত্যাদি, এইসব ছবিতে ফুটে উঠেছে।

এর পাশাপাশি উঠে এল কালিঘাটের পটুয়ারা। এরা জাতিভিত্তিক সংহতি (caste solidarity) বা বেরাদরী নিয়মে আবদ্ধ এবং পট আঁকার প্রকরণকে ব্যবহার করে কলকাতা শহুরে সমাজের নীতি, নৈতিকতাকে ছবিতে ব্যাঙ্গ করেছেন। পরে ছাপাই ছবির প্রযুক্তি এলে বটতলার ছাপাখানার দৌলতে এই শৈলীর ছবি সাধারণের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। একদিকে দ্রুত হারিয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্যদিকে ইঙ্গ ভারতীয় কলকাতার সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কালিঘাট শৈলীতে আঁকা হয়েছে বেশ্যার প্রতিকৃতি যাঁরা পুরুষ মানুষকে বশ করেছে। নব্যধনী 'বাবু'র ফোতোয়ানী যদি কালিঘাটের পটুয়াদের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়ে থাকে তেমনি সামাজিক মূল্যবোধের অধঃপতন এবং ধ্বংসের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল অধঃপতিত নারী (ধ্রুপদী শিল্পের 'নায়িকা'র অল্টার ইগো alter ego)। বাবুবেশি পুরুষের বুকের উপর নৃত্যরত বেশ্যারূপী নারীর ছবি এই উল্টে যাওয়া সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন। কালিঘাটের পট-এ আগেকার নান্দনিকতার বদলে মূল্যবোধের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আগেকার ছবিতে 'নায়িকা' পুরুষ দৃষ্টি (male gaze)-এর আজ্ঞাবহমাত্র। বটতলা বা কালিঘাটের ছবিতে কিন্তু নারী পুরুষের এই আজন্মলালিত সম্পর্কের ছাঁচটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল।

উনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদ-এর প্রভাবে বাংলায় শিল্পে আবার সেই ধ্রুপদীরূপকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসাপেক্ষে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার 'প্রগতিশীল' উপাদানকে আত্মস্থ করে এবং 'বাজার' শিল্পের অবক্ষয়ী উপাদানগুলি থেকে নিজেদের সচেতন ব্যবধান সৃষ্টি করে এই নতুন শৈলী নিজেদের আলাদা শিল্প ভাষা তৈরি করতে চাইলেন। একদিকে যেমন ব্রিটিশ আর্ট স্কুলের শিক্ষায় 'বাস্তবতা' (reality) আত্মস্থ করলেন তেমনি ব্যক্তিসত্ত্বার, সৃষ্টিশীলতার নতুন মূল্যবোধকে রপ্ত করতে হল। এখানেই ভারতীয় শিল্পীর মধ্যে এক তীব্র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ঔপনিবেশিক শিল্পের 'বাস্তবতা' অন্যদিকে 'বাজার' শিল্পের স্থূলত্ব অশ্লীলতাকে অস্বীকার করে যে নতুন নান্দনিকতার মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চলল তাতে নারীত্বের নতুন প্রতিমা নির্মাণই হল প্রধান মাধ্যম।

জাতীয়তাবাদী শিল্পের প্রথম পর্যায়ে এই নতুন ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের উপাদান সংগৃহীত হয় পশ্চিমী নব্য-ধ্রুপদী ঐতিহ্য থেকে। এর উদাহরণ হল 1880-90 এর দশকে ত্রিবাঙ্কুরের রবি বর্মার ছবি। 'হংস-দময়ন্তি' বা 'শকুন্তলার' ছবিতে এই নতুন শৈলীর ছাপ পাওয়া যায়। এই ছবিগুলিতে ভারতীয় মিথ গুলির সাথে ইউরোপীয় শৈলীকে মেশানো হয়েছে। দময়ন্তিকে প্রতীক্ষারত অবস্থায় একটি ইউরোপীয় ছাঁদের দালান বাড়িতে অপেক্ষারত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়াও রবি বর্মার প্রভাবে আরেক ধরনের

শৈলী তৈরি হচ্ছিল যেখানে উপকথার আঙ্গিকের বাইরে প্রাত্যহিকতার গণ্ডীতে ঘরকন্নার কাজে ব্যাপৃত 'ভারতীয় নারীর' আরেক প্রতিরূপ নির্মাণের কাজ চলছিল। রবি বর্মার ঘরানার ছবি নকল তেলছবি - (oleograph) র মাধ্যমে ক্যালেণ্ডার এর পাতায় জনসাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বিংশ শতকের গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর অনুপ্রেরণায় যে আরেকটি 'ভারতীয় ঘরানার' ছবি উঠে এল তাতে রবি বর্মার শৈলীকেও সম্পূর্ণ নাকচ করে 'ভারতীয় নারীর' প্রতিমা রূপটির যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

নারী প্রতিমার চিত্রণে / চিত্রায়নে পশ্চিমী প্রাকরণিক শিক্ষা প্রভাবিত বাস্তবতা থেকে সরে আসার কারণে শরীরী অবয়ব ও যৌনতার অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করে নারীকে ক্রমেই সূক্ষ্মদেহী অতিন্দ্রিয় ভাব-এর বহিঃপ্রকাশ হিসাবে উপস্থাপিত করাটা এই নতুন 'ভারতীয় ঘরানার' প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই ধারার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ হল অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'অভিসারিকা'। এই কালিদাস বিরচিত ঋতুসংহার-এর একটি উপস্থাপনা। এখানে ভারতীয় শিল্পের অভিসারিকা নায়িকার আদর্শকে 'পাহাড়ী' শৈলীর পেইন্টিং-এর ধারায় আঁকা হয়েছে। ছবির পরিসরে (space) চরিত্রটি যে নিরালম্ব অবস্থায় দোলায়মান। এখানে রবি বর্মার শকুন্তলা বা দময়ন্তির সাথে তফাৎটা স্পষ্ট। দুর প্রাচ্যের উত্তরাধিকার বিশেষতঃ ওয়াশ প্রকরণ (wash technique) -কে রপ্ত করে এই ভাবে নারীকে এক নিগুঢ় রহস্যময় ধোঁয়াটে / দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় অস্তিত্বের প্রতীক করে তোলা হয়েছে। নন্দলালের আঁকা ছবিতেও একই শৈলী দেখা যায়। এইভাবে নারীকে পুরুষের কামনার বস্তু থেকে কামনা রহিত একটি অবয়বে / প্রতিমাতে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। নারীর এই উপস্থাপনা তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আলোচনায় বিম্বিত হয়েছে সর্বংসহা জগজ্জননীরূপে। 1905 এ অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'ভারতমাতা' এমনই এক ছবি যাকে সিস্টার নিবেদিতা বর্ণনা করেছেন জাতীয়তাবাদের ধারণার রক্তমাংসের চেহারা হিসাবে। এই ছবি আঁকার সময় অবনীন্দ্রনাথ নিজের মেয়ের মুখ মাথায় রেখেছিলেন। এইভাবে দেবী, মাতা কন্যা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে 'ভারতীয় নারী'কে নতুন আঙ্গিকে উদ্ভাসিত করেছে।

৭.১.২.৫ ঃ তথ্যসূত্র হিসাবে Photograph (ফটোগ্রাফ)

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে Her story, His story র চাইতে উহ্যই থেকেছে এই বক্তব্য 'এহ বাহ্য'। অন্য সমস্যা হল তথ্য হিসাবে দৃশ্য শ্রাব্য উপাদান-এর চাইতে লিখিত উপাদানের গুরুত্ব বেশি মাত্রায় স্বীকৃত। ফলে মেয়েদের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে Photograph/ ক্যামেরায় তোলা ছবি বা আঁকা ছবি / Painting -এর গুরুত্ব ছিল লিখিত উপাদানগুলির সহায়ক হিসাবে, কিন্তু ইদানিংকালে Photograph বা Painting এর স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে উপলব্ধির মধ্যে আসছে।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে ফরাসী নাগরিক ডাগুরে আবিষ্কৃত পদ্ধতি daguerreotype একটি বিপ্লব সৃষ্টি করবার কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতা ও মুম্বইতে এই প্রাকরণিক কৌশল পৌঁছে যায়। প্রাথমিক

ভাবে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ উপনিবেশ বাসীদের উপর তথ্যসংগ্রহের জন্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার করলেও খুব তাড়াতাড়ি নতুন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়। ভারতীয়দের কাছে ফোটোগ্রাফি ছিল, একাধারে আধুনিকতা ও যন্ত্র সভ্যতার মূর্তপ্রতীক। সুকুমার রায়ের মত ব্যক্তি এই শিল্পে নতুন পদ্ধতি রপ্ত করেন। ধনী অপেশাদাররা অত্যাধুনিক দামী যন্ত্রপাতি আমদানি করে এই শিল্পে হাত পাকান, বিভিন্ন ফোটোগ্রাফি সোসাইটি গড়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে Bourne and Shepherd বা Edna Lorenz -এর মত স্টুডিওগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের পরিবারের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখার জন্য ছবি তোলাতে শুরু করে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে এই ফোটোগ্রাফগুলি আজন্মলালিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ গুলিকেই জোরদার করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন বিবাহযোগ্যা মেয়ে, পাত্রপক্ষকে দেখানোর জন্য ছবি তোলার রেওয়াজ শুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে। এই ছবি বা এমন অনেক পারিবারিক মুহূর্তের ছবি এই সময় থেকে মধ্যবিত্ত বাড়িগুলির নিজস্ব 'অভিলেখ্যাগারে' জমা হয়েছে। একটি বা দুটি ছবি বড় করে বাঁধিয়ে রাখা হলেও তুলনায় উচ্চবিত্তদের বাড়িতে ছবির Album রক্ষিত হয়ে এসেছে। সাধারণভাবে ছবিগুলির ছবির বাক্সে বন্দী থেকেছে।

ছবি কোন একটি বিশেষ মুহূর্তকে বন্দী করবার প্রচেষ্টা হলেও ছবিগুলির কুশিলবদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব কাহিনী থাকে বা বলা যায় কুশিলবরা প্রত্যেকে নিজের মত করে ছবিটির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপরিচিত ব্যক্তিকে ছবিটি / ছবিগুলি দেখানোর সময়তে সেই অকথিত কাহিনীগুলি বেরিয়ে আসতে থাকে ফলে ছবিগুলি আর স্থানু না হয়ে বাঙ্ময় / চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। এই বিশেষ মুহূর্তগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের জাঁতাকল থেকে মেয়েরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পান। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রথাগত অভিলেখ্যাগারগুলির ছবির তুলনায় পারিবারিক অ্যালবামগুলির ছবি এ বিষয়ে অনেক সহায়ক কারণ অনেক সময়তেই প্রথমোক্ত ছবিগুলি তোলার স্থান এবং সময় থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু শেষোক্ত ছবিগুলি অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি উসকে দেয়, গল্পের ঝাঁপি খুলে বসে যেগুলি আনন্দ বিষাদের এমন এক জগতের চাবিকাঠি যার ঐতিহাসিক মূল্য সবে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসছে।

তাই ছবি নিজে কথা বলে না, তাকে কথা বলতে হয়। এই কথা বলানোর ক্ষেত্রে ছবির ব্যক্তিত্বটির সঙ্গে ব্যাক্তিগত আলাপচারিতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে যাঁদের গবেষণা পথিকৃত তাদের একজন Jeraldine Forbes দেখিয়েছেন যে ছবিগুলির না বলা কথা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এমন একটি উদাহরণ হলেন লতিকা ঘোষ। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও কবি মনমোহন ঘোষ -এর কন্যা এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এর ভাইঝি। বিদেশে পড়া শেষ করে দেশে ফিরে যখন তিনি রাজনৈতিক কাজে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছিলেন তখন 1928 সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সুভাষ চন্দ্র বসু একটি সামরিক কুচকাওয়াজ এর ব্যবস্থা করেন। লতিকা ঘোষ এর উপর একটি মহিলা বাহিনী সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায়। সুভাষচন্দ্র মেয়েদের জন্যেও সামরিক পোষাক পছন্দ করলেও ঐতিহ্যগত ধারণায় আঘাত লাগবার ভয়ে / ভাবনায় লতিকা ঘোষ লাল পাড় সবুজ শাড়ির সাথে সাদা ব্লাউজ পরিয়ে মহিলা বাহিনীকে গড়ে তোলেন। পরে

বাসন্তীদেবীর সমর্থন নিয়ে শরৎ বসু মেয়েদের কুচকাওয়াজ বন্ধ করে দিতে পরামর্শ দেন কারণ এতে কংগ্রেস নেতাদের রক্ষণশীল অংশের মনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লতিকা ঘোষ রুখে দাঁড়ান। তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের অন্যান্য সমস্ত কাজ থেকে মহিলা সেচ্ছাসেবকদের প্রত্যাহার করার হুমকি দেন এবং শেষপর্যন্ত শরৎ বসু নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। এর ফলে অধিবেশনের দিনে 300 মহিলা সেচ্ছাসেবী দৃপ্ত ভঙ্গীতে পুরুষদের পাশে কুচকাওয়াজ করে। পরবর্তী কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনী ঝাঁসীর রানী রেজিমেন্টের অধিনায়িকা লক্ষ্মী সেহগাল (স্বামীনাথন) ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সেই কুচকাওয়াজের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। অধিবেশনের ছবিতে বিশেষতঃ অধিবেশনের সভাপতি মতিলাল নেহেরুর অভিবাদন গ্রহণরত অবস্থার ছবিতে একদম বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান দুই মহিলার ছবি ছাড়া মেয়েদের আর কোন দৃশ্যমান উপস্থিতি নেই (এই ঘটনার যে ছবি সাধারণতঃ দেখা যায় তাতে মেয়েদেরকে বাদ দিয়েই ছবিটি develop করা হয়েছে) কিন্তু লতিকা ঘোষের সাক্ষাৎকার, তাঁর প্রতিবাদ সেদিনের ঘটনার পেছনে সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান এর পাশাপাশি মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করে তোলে। এইভাবে যদি ছবিকে 'কথা বলানো' যায় তাহলে নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সাদামাটা পারিবারিক ছবিগুলিও মেয়েদের প্রাত্যহিক সংগ্রামের কথা বলবে।

এই কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। মূলতঃ C.S. Lakshmi, Neera Desai এবং Maitreyi Krishnaraj এর উদ্যোগে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) তে তৈরি হয়েছিল Sound and Picture Archives for Research on Women সংক্ষেপে SPARROW। এরা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ থেকে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-এর ভিত্তিতে একটি 'মুখের কথায় ইতিহাস' এর সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন তেমনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণ করবার ছবি থেকে মহিলা ছবি তুলিয়েদের তোলা বিভিন্ন ছবিতে সেজে উঠেছে এই অনন্য অভিলেখ্যাগার। এছাড়া রয়েছে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামী এবং তুলনায় অনামী মহিলা শিল্পীদের ছবির সংগ্রহ।

এই ধরনের উদ্যোগগুলির মধ্য থেকেই ছবির মাধ্যমে মেয়েদের না বলা ইতিহাস রচনার এক অসাধ্যসাধন প্রক্রিয়া চলছে।

৭.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। বিদিশা চক্রবর্ত্তী, সরকারী নথিতে উনিশ শতকে বাংলার নারী, কলকাতা, ২০০২

২। সুকুমারী ভট্টাচার্য, **'প্রাচীন ভারতে নারী ঃ বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ'** দ্রষ্টব্য **ভারত ইতিহাসে নারী** (সম্পাদনা) রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী, কলকাতা, 1989

৩। রীণা ভাদুড়ী, **'মধ্যযুগে বাংলায় নারীভাবনা ও নারীর স্থান'** দ্রষ্টব্য ঐ

৪। যশোধরা বাগচী, **'নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য ঃ দু চারটি কথা'** দ্রষ্টব্য ঐ

৫। Susie Tharu, K. Lalitha, *Women Writing in India,* Vol I, *600 BC to Early Twentieth Century.* 'Introduction'

৬। Leslie Orr, 'Women's Wealth and Worship ; Female Patronage of Hinduism, Jainism, and Buddhism in Medieval Tamilnadu in Mandakranta Bose (ed), *Faces of the Feminine in Ancient, Medieval and Modern India,* OUP, 2000 pp. 124-147.

৭। Ratnabali Chattapadhyay and Tapati Guha Thakurta, 'The Woman Perceived ; The Changing visual Sconography of the Colonial and Nationalist Period in Bengal' in Jasodhara Bagchi (ed.) *Indian Women ; Myth and Reality*, Hydrabad, 1995 pp. 147-167.

৮। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, 'নায়িকা থেকে নচ গার্ল ঃ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে রাজনর্তকী' শেখর ভৌমিক (সম্পাদিত) **সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা**, কলকাতা, 2005 পৃঃ 189-196.

৯। Jiraldine Forbes, 'Small Acts of Rebellion : Women Tell their Photographs.' in Anindita Ghosh (ed.), *Behind the Veil ; Resistance, Women and the Everyday in Colonial South Asia.* Permanent Black Delhi. 2007. pp. 58-82.

১০। *Sound and Picture Archives for Research on Women* (SPARROW website.)

৭.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। আধুনিককালে নতুন ধরনের গবেষণায় কিভাবে নারী জাতি সম্পর্কে তথ্য বেরিয়ে আসছে?

২। নারী জাতির ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে মহাফেজখানার বিভিন্ন তথ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) লেখগুলির সাক্ষ্য থেকে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কি কি জানা যায়?

৪। নারীর রূপ চিত্রণে চিত্রকলার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। নারী জাতির তথ্যসূত্র হিসেবে Photograph-এর মূল্যায়ণ কর।

———

পর্যায় গ্রন্থ - ২

RELIGION AND WOMEN

একক - ১

(a) **Brahmanical and non-Brahmanical**

(b) **Jainism**

(c) **Buddhism**

বিন্যাসক্রম ঃ

৭.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৭.২.১.১ ঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্য সূত্রে নারী

৭.২.১.২ ঃ গণিকা

৭.২.১.৩ ঃ মাতৃ-আরাধনা

৭.২.১.৪ ঃ জৈন ধর্মে নারী

৭.২.১.৫ ঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারী

৭.২.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্যসূত্রে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা।

২। ভারতীয় ধর্মচেতনায় নারীত্বের স্বরূপ।

৩। জৈন ধর্মে নারীর স্থান কিরূপ।

৪। বৌদ্ধ ধর্মে নারীর সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল।

৭.২.১.১ ঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্য সূত্রে নারী

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি নানান ধর্ম তথা দর্শন চিন্তার মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের একটি জটিল সংমিশ্রণ হিসাবে সামাজিক জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ধর্ম হল আচার আচরণ, নানান মিথ ও সর্বোপরি সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সৃষ্ট এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সামাজিক স্তরে বহুক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। Durkveim বলেছেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ধর্মের সূত্রপাত হয়, অপরদিকে Levi Strauss নানান ধরণের আদিম প্রথা ও মিথের মধ্য দিয়ে এর সূত্র সন্ধান করেছেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে Henry Thomas Colebrooke প্রাচীন ভারতের বৈদিক ধর্মের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। Adulbest Kunu ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "Redic Mythology" সংক্রান্ত গবেষণাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। ওপনিবেসিক ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন তথা ধর্ম সম্পর্কে যে আলোচনার অবতারণা করেন সেখানে মহিলাদের অবস্থান তথা ধর্মীয় জীবনে তাদের অংশগ্রহণের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তবে এই আলোচনা ছিল একান্তভাবে পুরুষকেন্দ্রিক। হপকিন্‌স ও জোহান জেকব মেয়রের মতো ঐতিহাসিকরা মূল ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃত গ্রন্থ ও মহাকাব্যের আলোকেই তৎকালীন নারীর অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণগুলি ছিল মূলত পুরুষ সর্বস্ব, যেখানে সহধর্মিনী হিসাবে নারী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারলেও তার সামাজিক জীবনের ধারা স্বেচ্ছাধীনভাবে প্রবাহিত হতে পারত না। এজন্য ব্রাহ্মণ সমাজে বহু নীতিও নির্ধারিত হয়েছিল। এই সময় থেকে স্ত্রী হিসাবে নারীর ভূমিকাই সমাজে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, ঋগ্বেদে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে গার্হস্থ্য জীবন প্রবেশের দ্বার রূপে বর্ণনা করা হয়। শিক্ষার উপরেও ধীরে ধীরে পুরুষের (বলা শ্রেয় উচ্চবর্ণের পুরুষের) একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও বৈদিক যুগের প্রথমদিকে নারীও সমানভাবে শিক্ষা লাভের অধিকারিনী ছিলেন এবং সে যুগে গার্গী, লোপামুদ্রা, অপালা প্রমুখরা জ্ঞানচর্চার প্রথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সমাজে এঁদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট কম। পরবর্তী ঋগ্বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক অধিকারগুলি সীমিত হয়ে পড়ে ও সে কোন না কোনভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই বৈদিক ধর্মসূত্র থেকে শুরু করে পুরাণে বারংবার যে বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে তা হল, "পিতা রক্ষাতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষত যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্র ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি"।

মনুসংহিতায় এক জায়গায় বলা হয়েছে – "নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যায়ন এবং পতিগৃহে বাসই হল গুরুগৃহে বাস।" শতপথ ব্রাহ্মণ উল্লিখিত আছে কয়েকটি যজ্ঞে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরবর্তীকালে যাগযজ্ঞে পুরোহিতদের ভূমিকা অধিক বৃদ্ধি পায় এবং বৈদিক ধর্মে যাগযজ্ঞের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নারীর অবস্থানগত অবনয়ন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রেও নারীর পক্ষে বিবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মনুর প্রবচন থেকে জানা যায় পুরুষের পক্ষে বংশরক্ষা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ ও পূর্বপুরুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য দার পরিগ্রহ করা প্রয়োজন। যাজ্ঞবল্ক্যেও এই একই বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা হয় সন্তান সন্ততির জন্মদানের মধ্য দিয়েই যথার্থ স্বর্গলাভ সম্ভব, এবং নারী সেখানে সন্তানকে গর্ভে ধারণের মাধ্যম। সুতরাং নারীর পক্ষে বিবাহ একান্ত আবশ্যিক ছিল। থেরিগাথায় কিন্তু এর বিপরীত চিত্রই পাওয়া যায়। বহু অবিবাহিত নারী বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করতে পারত।

প্রাচীন ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিকটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত এবং বিবাহের আচার, মন্ত্রচ্চারণের মধ্য দিয়ে নারীর সাংসারিক কর্তব্যগুলিকেই তুলে ধরা হত। গুহ্যসূত্রেও বিবাহকে ধর্মীয় আচার হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বৈদিক যুগে নারী নিজের সঙ্গী নির্বাচন করতে পারলেও পরবর্তীকালে ধর্মের অনুমোদনক্রমে তার সেই অধিকারও সংকুচিত হয়ে আসে ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা হিসাবে 'কল্যাদানে'র রীতি বৈবাহিক আচার আচরণের সাথে একান্তভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ধর্মাচরণেও উল্লিখিত আছে আদর্শ স্ত্রী হিসাবে নিজ ধর্মপালন ছাড়াও নারীর অপর প্রকৃষ্ট কর্তব্য হল পুত্রোৎপাদন করা। অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে তাই উল্লিখিত আছে 'পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়াই নারীর প্রধান কর্তব্য'। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে স্বামী অনায়াসেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের জন্য পাত্র খোঁজার অধিকার নারীর জন্য সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিলনা। ধর্মশাস্ত্রে বিবাহের নিয়ম স্পষ্ট করে বলা আছে, যেমন – 'সপিণ্ড' বিবাহ নিষিদ্ধ বলে বর্ণিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যে এই ধরণের একই পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুর প্রবচনে এই ধরণের বিবাহ শুধু নিষিদ্ধই নয় শাস্তিযোগ্যও বটে। ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে নারীর পক্ষে বিবাহের রীতি আবশ্যিক তো বটেই, তাকে সামাজিক অনুশাসন মেনেও হতে হবে। বৈদিক ধর্মে আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে – ব্রহ্ম, প্রজাপত্য, আর্স, দৈব, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রথম চারপ্রকার বিবাহই কেবল সমাজ সিদ্ধ কারণ এই বিবাহের রীতিগুলি ধর্ম দ্বারা অনুমোদিত ছিল এবং বিবাহকালে ধর্মীয় যাগযজ্ঞের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অপরদিকে শেষ চার প্রকার বিবাহের ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না, যেমন – গান্ধর্ব বিবাহ সংঘটিত হল নারী ও পুরুষের সম্পতিক্রমে একটি চুক্তির মাধ্যমে। তাই ধর্মশাস্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যদি কোন নারীকে গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ মতে বিবাহ করা হয় তবে তা সমাজসিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হবেনা। এই চারপ্রকার বিবাহের দ্বারা নারী তার স্বামীর গোত্রে প্রবশাধিকার পাবেনা। অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতির বিষয়টি ছিল গৌণ। এক্ষেত্রে ধর্ম ও কন্যার পিতার অনুমোদনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত।

দৈব বৈবাহিক পদ্ধতির সাথে 'দক্ষিণা' প্রদানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। বৌধায়ন ধর্মসূত্র দৈব বিবাহের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে যজ্ঞের সময়ে কন্যাকে দক্ষিণা বা

দান হিসাবে পুরোহিতকে প্রদান করা হত। বিশ্বরূপের মতে যেহেতু ব্রাহ্মণরাই কেবলমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারতেন সেহেতু এই ধরণের বিবাহ ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা সত্য যে ব্রাহ্মণকে 'দক্ষিণা' হিসাবে কন্যাদানের রীতি বৈবাহিক আচারের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। তবে ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে কন্যা বা পুত্রের ক্রয় বিক্রয় ধর্মসাপেক্ষ নয়। বৌধায়ন উল্লেখ করেছে যে নারীকে ক্রয় করা হয়েছে তাকে কখনোই সহধর্মিনীর মর্যাদা দেওয়া যায়না। কাশ্যপের মতে এই নারী দাসী। বৈদিক ধর্ম গান্ধর্ব বিবাহকে যথেষ্ট সমালোচনা করেছে, কারণ এই ধরণের বিবাহে অভিভাবকের ভূমিকাটিকে কোনভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হতনা। একমাত্র কামসূত্রেই এই বিবাহ পদ্ধতিকে আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়েই বিবাহে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অভিভাবকরা আপত্তি জানালে যে হরণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে ছিল রাক্ষস ধরনের বিবাহ। মনুর মতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গান্ধর্ব ও রাক্ষস ধরণের বিবাহ ধর্মসাপেক্ষ।

অধ্যাপক এ. এস আলতেকর সমাজ তথা বৈদিক ধর্মের পরিকাঠামো নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথার উপর আলোকপাত করেছেন। ঋগ্বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে সতীদাহ প্রথাটি সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে ওঠে। তবে আলতেকরের মতে, সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার সূচনা সম্ভবতঃ প্রাগার্য সময় থেকেই। তিনি বর্ণনা করেছেন আর্যদের মধ্যে প্রথমদিকে এই প্রথার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়না। ঋক্‌বেদে এই সংক্রান্ত কোন মন্ত্র উচ্চারিত হয়নি। তবে অথর্ববেদে সতীদাহ, বহুপতিত্ব ইত্যাদি বেশ কিছু অপ্রচলিত রীতি নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত অর্য-প্রাগার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের শেষ পর্বে অথর্ববেদ রচিত হয়। ফলতঃ এই প্রথাগুলির অস্তিত্ব প্রাগার্য সমাজেই লক্ষ্য করেছিল অথর্ববেদ। ৫০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই প্রথাটি প্রচলিত ছিলনা, কারণ মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের রচনায় এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না। যদিও মহাভারতে এই প্রথা সম্পর্কিত কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এই প্রথায় অংশগ্রহণ করা বা না করা ছিল নারীর স্বেচ্ছাধীন, তখনো পর্যন্ত এই প্রথা নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতীদাহ প্রথাটির অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। 'স্মৃতি রচয়িতারাও এর উল্লেখ করেন। ক্রমে নারীর পক্ষে সহমরণ হয়ে ওঠে স্বামীর চিতায় আত্মনিবেদনের একটি গৌরবান্বিত পথ। প্রকৃতপক্ষে সমাজে সম্পত্তির ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে সতীদাহ প্রথাটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ থেকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কঠোর ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হয়। স্মৃতি রচয়িতারা উল্লেখ করেন বিধবাদের সম্মুখে দুইটি পথই খোলা, স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দানের মধ্য দিয়ে চিরসতীত্ব লাভ অথবা বহুবিধ আচার আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে কঠোর সংযমের ব্রত পালন। অথচ ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল স্বামীর মৃত্যু হলে সেই নারী স্বামীর ভ্রাতা বা জ্ঞাতি সম্পর্কিত কাউকে বিবাহ করতে পারে। অর্থাৎ পরবর্তীযুগে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অবনয়ন ঘটিয়ে নারীর উপর নানাবিধ ধর্মীয় অনুশাসন চাপানো হয়। ২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিধবা বিবাহের বিষয়টি সমাজে হ্রাস পায় ও বিষ্ণু বিধবাদের জন্য কঠোর সংযম পালন করতে বলে। মনুতে উল্লিখিত আছে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহের বিষয় সম্পর্কে ভাবাও উচিত নয়। নারদ স্মৃতিতে বলা হয় নারী একবারই বিবাহের উপযোগী। যদিও এক্ষেত্রে নারদ স্মৃতিতে উল্লেখ করা হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত হ্রাস পেলেও, অন্যান্য বর্ণের মধ্যে এর

প্রচলন আছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫ - ৪১৪ খ্রীঃ) কথা, যিনি জন্মসূত্রে বৈশ্য ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। কুমারগুপ্ত ছিলেন তাঁদের সন্তান এবং তাঁর সিংহাসনে আরোহন ধর্মের অনুমোদনক্রমেই ঘটেছিল।

পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার বৈদিক ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করলেও নারীর ক্ষেত্রে তা ছিল না। মহাভারতেই কেবলমাত্র দ্রৌপদীর উপাখ্যানে পঞ্চপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও সেখানে অনেক ক্ষেত্রে দ্রৌপদী দ্বারা পঞ্চপতী গ্রহণের বিষয়টি নিন্দিত হয়েছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্বে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'সাধারণী' বা গণিকার সাথে তুলনা করেছেন। অপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে প্রথাটির সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে 'নিয়োগ' প্রথাটি করা হয়েছে, যেখানে সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীকে কোন ব্যক্তির কাছে পাঠানো হত। মহাভারতেও নিয়োগ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যদিও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের সমগ্র রচনায় এর কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত আর্য সমাজের এই অচিরাচরিত প্রথাগুলি তখন বিলুপ্তির পথে, কারণ যৌনতাকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টা সূচিত হয়েছে। কালক্রমে নারীর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকারও সীমিত হয়ে আসে। সমাজে শুচি, অশুচি ইত্যাদি বিষয়গুলি মুখ্য হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদের সময় থেকেই ঋতুকালীন অবস্থায় নারীরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত। পরবর্তীকালে অপরিচ্ছন্নতা অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আরো প্রকট হয়ে গর্ভবতী মহিলারাও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অধিকারী ছিলেন না। এই প্রকার বিবিধ ধর্মীয় রীতিকে কেন্দ্র করে নারী সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় নারীর সামাজিক জীবন যে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তাই নয়, ধর্মের সাথে যুক্ত নানান প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি নারীকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার অধিকারীও ছিল। এই বিষয়টি সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে 'দেবদাসী' প্রথার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ধর্মগ্রন্থে দক্ষিণা প্রদানের যে উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়, সেখানে বস্তুসম্ভারের তারিসায় হস্তী, অশ্ব, রথ, ভূমি ও নানাবিধ অলংকারের সাথে নারীর উল্লেখও পরিলক্ষিত হয়। যজ্ঞের পুরোহিতকে এই দক্ষিণা প্রদান করা হত। এই নারীরা সকলেই ছিলেন ভোগ্যা। সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের মতে এঁদের বেশীরভাগেরই স্থান হত গণিকালয়ে। অথবা এরা ক্রীতদাসী হিসাবে জীবন নির্বাহ করত। পুণ্যার্জনের জন্য সুন্দরী নারী কিনে দেবালয়ে দান করা হত। এরা দেবদাসী হিসাবে ঈশ্বর ও মন্দিরে আগত উচ্চবর্ণের পুরুষদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। দুঃস্থ পিতামাতার কন্যাদের ক্রয় করে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরে দান করা হত। আবার অনেক সময়ে দেবদাসীদের কন্যারাই বংশপরম্পরায় মন্দিরের সাথে যুক্ত থাকতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কালিদাসের রচনায় এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা নৃত্যগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মন্দিরে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। দক্ষিণভারতে ভারতনাট্যম নৃত্যের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত এই দেবদাসী প্রথাকে কেন্দ্র করেই। এই দেবদাসীদের আকর্ষণে মন্দিরে বহু লোক সমাগম হত। ধর্মের বকলমে এই প্রকার একটি প্রথাকে সমাজ পরিপুষ্ট করে তুললেও, ব্রাহ্মণ্যধর্ম কখনোই এই গণিকাদের সামাজিক পরিকাঠামোয় আত্মস্থ করেনি, বরং ধর্মশাস্ত্রকারগণ গণিকাসংসর্গে পাপের উল্লেখ করেছেন (বিষ্ণুপুরাণ, অত্রিসংহিত পরাশর সংহিতা)। অথচ প্রাচীন ভারতে এই দেবদাসীদেরই মন্দির তথা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিসহ অন্যান্য সম্পত্তি দান করতে দেখা যায়।

৭.২.১.২ ঃ গণিকা

গণিকা প্রথাটি ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একটি অতিপ্রাচীন পেশা হলেও, সমাজ বা ধর্ম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের প্রয়োজনে এর সাথে যুক্ত নারীদের ব্যবহার করেছে, কিন্তু এদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে ভারতীয় সমাজ হয় নিশ্চুপ অথবা সমাজের মূলস্রোত থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করার বিধান দিয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ভারতীয় সমাজকে যে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল সেখানে গণিকাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিলনা। এই পেশার সাথে যুক্ত অনেকেই তার বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে সামাজিক মর্যাদার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বৈশালির প্রখ্যাত গণিকা আম্রপালি, বারাণসীর সামা, সিরিমা, সুলসা, সালবতী এই প্রকার অসংখ্য গণিকার উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধসাহিত্যে, যাঁরা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৌষট্টি কলায় পারদর্শী এই নারীরা সামাজিকভাবে সর্বজনের দ্বারা গ্রহণীয় না হলেও, এদের জীবন ছিল ধন ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু শেষ জীবনে বহুক্ষেত্রেই এরা সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আত্মনিবেদন করেন ও সম্পত্তির একটি বড় অংশ দান করেন বৌদ্ধ মঠ ও সংঘগুলিকে।

৭.২.১.৩ ঃ মাতৃ-আরাধনা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির মতো যে মাতৃ আরাধনার গৌরবজ্জ্বল ঐতিহ্য ছিল তার উপর আলোকপাত করেন। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মধ্যেই লুকিয়ে সৃষ্টির আদিম রহস্য, যা তান্ত্রিকতাবাদের মূল নির্যাস, তার মধ্য দিয়েই সম্ভবত অনুধাবন করা যায়, ভারতে মাত আরাধনার স্বরূপটি। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও সর্বোপরি ধর্ম -এর প্রভাব মুক্ত নয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে কৃষিজ অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাথমিক স্তরে এখানে মাতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর অস্তিত্ব থাকলেও, বৈদিক যুগের পশুচারী যাযাবর সম্প্রদায়ের সমাজ ছিল প্রধাণত পুরুষতান্ত্রিক। এই মাতৃপ্রধান সমাজ ক্রমেই অবদমিত হয় পুরুষ প্রাধান্যের দ্বারা, বৈদিক দেবলোকও একান্তভাবে হয়ে ওঠে পুরুষ প্রধান। নারী কেবলমাত্র তখন দেবতাদের সঙ্গিনী মাত্র, (আনি প্রত্যয় যোগে ইন্দ্রাণী বরুণানী) তার নিজস্ব কোন পরিচয় নেই। ঋগ্বেদে উল্লেখযোগ্য দেবী বলতে অদিতি এবং উষা। অদিতি ঋগ্বেদে প্রায় সর্বত্রই আদিত্যজননী হিসাবে বর্ণিত। অপরদিকে কোশাম্বির মতে উষা মাতৃদেবী হলেও ''তার স্থান বৈদিক দেবলোকে নয়'' – বরং তিনি হলেন সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবী। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের একটি সূক্তে ইন্দ্রের দ্বারা উষার আক্রান্ত ও ধর্ষিত হওয়ার যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে পুরুষ প্রধান বৈদিক ধর্মের দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাস আক্রান্ত ও অবদমিত হয়েছিল ও 'মাতৃ' রূপটি সুপ্তভাবে উপজাতিক বিশ্বাসের মধ্যে কোনক্রমে টিকে ছিল। পরবর্তীকালে এই মাতৃত্বের ভাবমূর্তি নানারূপে নানাধর্মের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে।

বহু ঐতিহাসিকের মতে এই মাতৃ আরাধনার বিষয়টি বহুক্ষেত্রেই উর্ব্বরতা, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক্ষেত্রে হরপ্পার সীলে শাকম্ভরীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দেবী বলতে এখানে বসুমাতা বা পৃথিবী। শাকাদি বা উদ্ভিদ মার গর্ভপ্রসূত। নারী এক্ষেত্রে উৎপাদনের

একটি মাধ্যম হিসাবে কল্পিত হলেও পরবর্তীকালে তার অবস্থানের যে অবনয়ন ঘটে তা বৈদিক যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিকাঠামোর দ্বারা পরিস্ফুট হয়। এমনকি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদের "দেবীসুক্ত" অনেক পরবর্তীযুগে রচিত হলেও একে কৃত্রিমভাবে ঋগ্বেদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এখানে মূলতঃ শক্তির আরাধনা করা হয়েছে। বলা যায় আকস্মিকভাবে কোন একদিন দেবী মাহাত্ম্যের ধারণাটি গড়ে ওঠেনি। এটি আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সামাজিক ক্রমবিবর্তনের একটি ফসল।

বৈদিক যুগে অপর দুই প্রকার মা -এর সন্ধান আমরা পাই। একদিকে সরস্বতী বা যিনি জ্ঞানের দেবী হিসাবে বর্ণিত। অপরদিকে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ বৈদিক সমাজে পুরুষ স্বীকৃত হলেও নারীর বিভিন্ন রূপ ও তার প্রকাশ তারা একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি।

বৈদিক ধর্ম ছাড়া ও অন্যান্য অপ্রধান ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাসে মাতৃ আরাধনা প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ রচনায় 'সিরি লক্খী" -র উল্লেখ পাওয়া। অপরদিকে প্রজ্ঞাপারমিতার ধারণাটি জ্ঞানের সাথে নারীত্বের সংযোগের বিষয়টিকেই আরো গভীরভাবে প্রথিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল এই বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অভিঘাত ও চাহিদার মধ্য দিয়ে মহিষাসুরমুর্দিনী অসুর ঘাতিনী দেবীরূপটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুধু দেশীয় ও বৈদেশিক ধর্মীয় উপাদানও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে দেবীর এইরূপ যে সমাজে চরম আদরণীয় সে বিষয়ে সহজ সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। দেবী, মানবীর ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্তরে চিন্তনীয় এমনকি ব্রাহ্মণ্য শৈব বা বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনাতেও দেবী অলৌকিক এবং মানবী সম্পর্কে সমাজের শাস্ত্রানুগ ধারণার প্রায় বিপ্রতীপ বললেও চলে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মাতৃদেবীর ধারণার যে বিকাশ তা ছিল একটি জটিল পদ্ধতি। বহু যুগের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক সংঘর্ষ দ্বারা লালিত ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক নৈতিকতা দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে এই ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছিল। সময়ের অভিঘাত ও সামাজিক ক্রমবিবর্তন নারীত্বের এই ধারণাটিকে কখনো নিয়ে গেছে বিলয়ের পথে, কখনো আবার নতুন রূপে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়েছে।

বর্তমানে আমরা আঞ্চলিক ও লৌকিক দেবী আরাধনার মধ্য দিয়েও এর আভাস পাই। যেমন – সন্তোষীমাতা, মা শীতলা, বনবিবির আরাধনার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক বা সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই -এর প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মচেতনায় নারীত্বের এইরূপগুলির বিকাশের ধারাকে পর্যালোচনা করতে হলে তৎসম্পর্কিত সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ এই সংক্রান্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ভারতীয় ধর্মচেতনায় নারীত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের পাশাপাশি, ভারতীয় সভ্যতার নানা পর্যায়ে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও আমাদের সচেতন করে তোলে, যার গুরুত্ব অপরিসীম।

৭.২.১.৪ ঃ জৈন ধর্মে নারী

জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শাস্ত্র ও চর্যাগত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল সম্ভবত মহাবীরের মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকেই। কিন্তু শেষ অবধি খ্রীষ্টপূর্ব-তৃতীয় শতকে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল জৈন ধর্মের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে। ঘটনাটি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে ঘটেছিল এবং মহামতি ভদ্রবাহু তখন জৈন ধর্মের প্রধান তাত্ত্বিক ছিলেন। এই বিভাজনের প্রথম সাহিত্যিক উল্লেখ পাওয়া যায়

খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে প্রাকৃত ভাষায় রচিত কুণ্ডকুণ্ডের 'সুত্তপাহুদা' গ্রন্থে। এই দুই সম্প্রদায় একে অপরের তত্ত্বগত অবস্থান ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার সিদ্ধতা অস্বীকার করে এবং এদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল বিষয় ছিল দীক্ষিত জৈন শিষ্যদের বস্ত্রপরিধানের প্রশ্নকে ঘিরে। স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু সে সময়ে ভিক্ষুণীরাও জৈন ধর্মে প্রবেশ করেছেন বস্ত্র পরিধান এবং তার সাথে সাথে স্ত্রী-নির্বাণ অথবা স্ত্রী-মোক্ষ বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত এই বিতর্ক সংক্রান্ত নানা বিষয় ও মতামত যেভাবে জৈন সাহিত্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে সেই সূত্র ধরেই জৈন ধর্মের চোখে নারীর অবস্থান সম্পর্কে চিন্তাধারা সম্বন্ধে জানতে পারা যায়।

প্রথমত বস্ত্র পরিধানের ক্ষেত্রে বিতর্কটি যেভাবে এগিয়েছিল তা লক্ষ্য করা যাক। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত একই ছিল – সে মহাবীর নিজে অচেলক বা চেলিহীন অবস্থাতেই থাকতেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর মতে সে সময়েও বস্ত্র পরিধান বা নগ্নভাব গ্রহণ সম্পর্কে শিষ্যদের নিজস্ব বিচারই বহাল থাকত শারীরিক চর্যা বা উপবাস সম্পর্কেও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এই মতামতেই বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে দিগম্বর সম্প্রদায় নগ্নতা ও মুনি-লিঙ্গ উন্মুক্ত রাখাই ধর্মচর্যার মুখ্য বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মহাবীরের 'নগ্নভাব' সংক্রান্ত ধর্মাদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তাকেই মোক্ষলাভের মূল উপায় রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শ্বেতাম্বর মতে মহাবীরের সময়কালে যে চর্যা সম্ভব ছিল তা সমকালীন সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) পালন করা সমীচীন নয়। তাঁদের শাস্ত্রে এও দাবী করা হয় যে মহাবীরের মৃত্যুর পরে পরেই নগ্নতা চর্যা অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল এবং পরিবর্তিত সময়ে, নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সেই চর্যার পুনঃপ্রচলন যথাযথ নয়। এই ব্যাখ্যায় – বরং দিগম্বর জৈনরা যে 'নগ্নভাব' কে পুনরায় প্রচলিত করলেন তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে দাবী করা হল।

স্পষ্টতই 'নগ্নভাব' চর্যার এই বিষয়টি ভিক্ষুণী বা শ্রবিকা'র ধর্মীয় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিগম্বর জৈনরা ভিক্ষুণীদের বস্ত্রাবৃত থাকার কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁদের মতে ভিক্ষুণীগণ মোক্ষলাভের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলেন। ভিক্ষুণীদের যদিও আর্যিকা, সাধ্বী ইত্যাদি নানা সম্মানজনক অভিধা দেওয়া হত কিন্তু তাঁরা ভিক্ষু সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের অন্তর্ভূক্ত বলে স্বীকৃতি পাননি। কেবলমাত্র কুমারী এবং সাধনার পথগামী উৎকৃষ্ট শ্রবিকা রূপেই তাঁরা মর্যাদা পেতেন। শ্বেতাম্বর ভিক্ষুদের প্রতিও একই কারণে দিগম্বর ধর্মাবলম্বীগণ এই মত পোষণ করতেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ - বস্ত্র পরিত্যাগ না করতে পারলে দেহ ও মনের মধ্যে অন্তর্নিহিত যৌনতা যা কিনা লজ্জার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় – দূর হয় না।

অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় যেহেতু বস্ত্রকে সাংসারিক সম্পদ বলে গণ্য করেনি বরং ধর্ম উপকরণ বলেই গ্রহণ করেছে তাই ভিক্ষুণীদের বস্ত্রপরিধানের নির্দেশ দিলেও তাঁদের ভিক্ষুদের মত একইরকমভাবে মর্যাদা দেওয়া হত এবং মোক্ষলাভের পূর্ণ অধিকার ও স্বীকৃত হয়েছে।

আদিতে মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে নিগ্রন্থি চর্যা প্রধান বিধিরূপে গণ্য হওয়ায় নারীর মোক্ষলাভ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি। কিন্তু নারী সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত হয়েছে নানাভাবে। মহাবীরের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজে নারীর নগ্নতা স্বীকার্য নয় সুতরাং নারীর মোক্ষলাভও সম্ভব নয়। মহাবীর এও বলেছেন যে নারী পৃথিবীর সবচাইতে বড় মোহের কারণ এবং জৈন ভিক্ষুগণের প্রতি তাঁর কঠিন নির্দেশ ছিল নারীর সাথে বাক্য বিনিময়, তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত বা সম্পর্ক স্থাপন অথবা তাঁদের জন্য কোনরূপ কর্মসাধন

থেকে বিরত থাকার। নারীর সংশ্রব সাধনার পথে চরম বিপত্তিরূপে গণ্য করেছেন বৌদ্ধ ও জৈন – এই দুই ধর্মেই। তার সবচাইতে বড় কারণ হিসাবে ব্রহ্মচর্যার উপর গুরুত্ব আরোপের প্রথাকেই চিহ্নিত করা যায়। এই বিশেষ কারণেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে নারী এবং বিশেষত নারীদেহের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অনীহা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দিগম্বর জৈন মতে নারী স্বভাবতই ক্ষতিকারক। নারীর রজস্বলা অবস্থার প্রতি ঘৃণাজনিত নানা বক্তব্য জৈন শাস্ত্রীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। কুণ্ডকুণ্ড রচিত সুত্তপাহুদাতে নারীদেহের অপবিত্রতা সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে নারীর যৌনাঙ্গ, নাভি ও বক্ষদেশে নানা জীবাণুর জন্ম হওয়ার কারণে নারীর মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য ও যৌনভাবের উদ্রেক হয়। তাঁরা প্রতি মাসে রজস্বলা হন এবং সাধনার ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণভাবে ভীতিমুক্ত হতে পারেন না। সুত্তপাহুদার এই মত মূলত দিগম্বর সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরেছে।

সাহিত্যিক সূত্র ধরে দেখলে দিগম্বর সম্প্রদায়ের এই ধরণের মতামতের বিরোধীতা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় – শ্বেতাম্বর নয় – জপনীয় নামক একটি স্বল্প মত সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়। সম্ভবত এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটেছিল খ্রীষ্টিয় শ্লোক ও স্বোপজ্ঞাবৃত্তি টীকা সম্বলিত "স্ত্রী নির্বাণ প্রকরণ" নামক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে। এই সম্প্রদায়ের মতে যৎসামান্য বস্ত্রাবরণ মোক্ষলাভের অন্তরায় নয় – যদিও ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে নিরাবরণতাই সাধারণ রীতি রূপে প্রচলিত। নারীরা একবস্ত্রাবৃত থাকবেন এবং তার জন্য তাঁরা মোক্ষলাভ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সাথে জপনীয় সংঘের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং দেখাই যাচ্ছে পরবর্তীকালে দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাথে পরিব্রজ্যালাভের ক্ষেত্রে 'নগ্নভাব' এর বিরোধীতায় তাঁরা বক্তব্য রেখেছিলেন জপনীয় সম্প্রদায়েরই অনুসরণ করে। শ্বেতাম্বর দার্শনিক যথা হরিভদ্র (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ), অভয়দেব (১০০ খ্রীঃ), শান্তিসুরি (১১২০ খ্রীঃ), মলয়গিরি (১১৫০ খ্রীঃ), হেমচন্দ্র (১১৬০ খ্রীঃ) প্রমুখ এই বিতর্ক জারী রেখেছিলেন, তাঁদের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। অপরদিকে দিগম্বর তাত্ত্বিকদের মধ্যে ছিলেন বীরাসন (৮০০ খ্রীঃ), দেবসেন (৯৫০ খ্রীঃ), নেমিচন্দ্র (১০৫০ খ্রীঃ), প্রভাবচন্দ্র (৯৮০ - ১০৬৫ খ্রীঃ), জয়সেন (১১৫০ খ্রীঃ) প্রমুখ নারী জন্মগতভাবে পুরুষের থেকে হীন অর্থাৎ 'হীনত্বৎ'। তাঁরা পুরুষের মত তাঁদের বস্তু সম্পদ তথা বস্ত্র ত্যাগে অসমর্থ বিতর্ক ইত্যাদি নানা বিদ্যায় পারদর্শীতাহীন; ধর্মীয় শাস্ত্র ও সামাজিক বিধিমতে মর্যাদাহীন এবং সর্বোপরি নিকৃষ্টতম পাপকর্মজনিত অপরাধে অপারগ, এই শেষ কারণে তাঁরা সবথেকে নিকৃষ্ট সপ্তম নরকলোকে কখনোই গমন করতে পারেন না। দিগম্বর সম্প্রদায়ের অদ্ভুত বিচারে এই একই যুক্তিতে নারীর এই অক্ষমতার অপরদিকে তাঁদের চরম উৎকৃষ্ট পুণ্য অর্জনে অক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে, এবং তার ফলে সৎকর্মজনিত কারণে সর্বার্থসিদ্ধি স্বরূপ উত্তর স্বর্গলাভ থেকেও তাঁরা 'যুক্তিপূর্ণভাবেই' বঞ্চিত।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় দিগম্বর দার্শনিকদের মতোই বিশ্বাস করেন যে নারী স্বভাবগতভাবেই হীনতম পাপকর্মে লিপ্ত হতে অক্ষম সুতরাং তাঁরা সবথেকে নিম্নে অবস্থিত সপ্তম নরকলোকে গমন করেন না। কিন্তু তাঁদের মতে নারী স্বর্গের পুণ্য সাধনে সক্ষম এবং ফলত সর্বার্থসিদ্ধি রূপ উৎকৃষ্ট সাধনালভ্য স্বর্গে গমন করতে পারেন। তবে এই দুই সম্প্রদায়ের বিচারেই নারী পুরুষের মধ্যে নীতিবোধ গত অসামঞ্জস্য স্বীকৃত। এই যুক্তি ধরেই দিগম্বর সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকগণ শ্বেতাম্বর মতকে খণ্ডনে উদ্যত হয়েছেন। তাঁদের

বক্তব্য শ্বেতাম্বর মতে যখন স্বীকার করা হচ্ছে যে নারী চূড়ান্ত পাপ সংগঠনে অসমর্থ এবং সপ্তম নরকলোকে গমন করেন না তখন একই যুক্তিতে এও মেনে নিতে হবে যে চূড়ান্ত পুণ্য অর্জনেও তাঁরা অসমর্থ। সুতরাং নারী সর্বার্থসিদ্ধি ও মোক্ষও অর্জন করতে পারেন না। চূড়ান্ত নৈতিক অবস্থান থেকে চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করা যায়। নারীরা কোন ক্ষেত্রেও এই অবস্থানে পৌঁছন না।

ধর্মীয় বাদানুবাদের সাথে সাথে সাধারণভাবে নারীর চরিত্র ও দেহ সংক্রান্ত নানা ধারণার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। **কুণ্ডকুণ্ডের** দ্বারা ব্যক্ত নারীদেহ, জীবাণু ও যৌনতা সংক্রান্ত পূর্বে আলোচিত বিষয়টির রেশ টেনে পরবর্তীকালে শ্বেতাম্বর তাত্ত্বিকেরাও বক্তব্য রেখেছেন। খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতকে শ্বেতাম্বর উপাধ্যায় মেঘবিজয় তার রচিত 'যুক্তি প্রবোধ' এ লিখেছেন যে দেহের ঐ সব অংশে জীবাণু জন্মানোর কারণেই নারীরা ঐ অংশ সম্পর্কে সজাগ হন ও পরে সামনা বোধ করেন। মেঘবিজয় দিগম্বর সম্প্রদায়ের নানা মতামত ব্যক্ত করলেও তা খণ্ডনে অনেক ক্ষেত্রেই বিরত থেকেছেন। তবে পুরুষদেহে সাধ্বী তীর্ঙ্কর মল্লি'র বিগ্রহ পূজার সে প্রচলন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় করেছিল – তা সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে মল্লি'র বিগ্রহ পূজার পিছনে শাস্ত্রীয় ও সাধারণ মতামত কাজ করেছিল। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যুক্তি ছিল যে শাস্ত্রমতে নারীর উন্মুক্ত বক্ষদেশ প্রদর্শন বৈধ নয়। সুতরাং দেহ সংক্রান্ত নিষিদ্ধতা দুই সম্প্রদায়ের চোখেই নারী পুরুষের সাম্য স্বীকারের অন্তরায় ছিল। মানবিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে শ্বেতাম্বররা নারী এগারোটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিম সংস্কারে অঙ্গীকারের সামর্থ্য স্বীকার করেছেন।

সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতে সর্বধর্ম মতেই নারীর রজস্বলা অবস্থা অপবিত্র গণ্য হয়েছে। জৈন মতে মনে করা হত যে নারীর মাসিক রক্ত ক্ষরণের ফলে দেহের মধ্যেকার জীবাণুর মৃত্যু ঘটে। চরম অহিংসবাদী জৈনধর্মে নারীদেহের এই জৈবিক প্রক্রিয়াগত হিংস্রতার লক্ষণ নারীর মোক্ষলাভের চরম অন্তরায় রূপে দৃষ্ট, তবে অন্য একটি অপেক্ষাকৃত কুসংস্কার-মুক্ত যুক্তিপূর্ণ মত অনুযায়ী নারী সংসারধর্ম ও শিশুদের লালন পালনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার ফলে সংসার ত্যাগ ও মোক্ষলাভের পথ তাঁদের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য নয়।

৭.২.১.৫ ঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারী

খ্রীষ্ট পর্ব ষষ্ঠ শতকের পর থেকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক তথা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়া তথা সামাজিক চাহিদার মধ্য দিয়ে যে অপ্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা কেবলমাত্র সমাজের প্রান্তিকগোষ্ঠী, যেমন - গণিকাদের প্রতিই নয়, সমাজে নারীর প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব যা কখনোই লিঙ্গ বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং এক্ষেত্রে জ্ঞান ও ভক্তিকেই পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম কেবলমাত্র নারীকে স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতই করেনি, ধর্মীয় জীবনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণকেও নিশ্চিত করেছিল।

গৌতম বুদ্ধকে "the first urban man" হিসাবে বর্ণনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল এমন একটি সময়ে যখন ভারতে 'দ্বিতীয় নগরায়ণের' সূচনা হয়েছিল। রাজগৃহ বৈশালি ইত্যাদি

নগরকে কেন্দ্র করে এইসময়-স্বতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক পরিণ্ডল বিকাশ লাভ করে, যেখানে নতুন মাত্রা যুক্ত করে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে সরে এসে বৌদ্ধধর্ম নারীর প্রতি অনেক বেশী উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। হরনারের মতে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নারী তার কণ্ঠস্বরকে নানাভাবে ধ্বনিত করতে পেরেছিল। এই সময় থেকে কন্যাসন্তানের জন্মকে আর দুঃখের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হত না। সমাজে "মাতা" হিসাবে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা কেবলমাত্র সন্তানের জন্মদানের মধ্যে সীমিত ছিলনা। গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে নানা কর্তব্য পালন করতে দেখা যায় নারীকে। এমনকি অবিবাহিত মহিলারাও গৃহে ও সমাজে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার লাভ করতেন। হরনারের মতে বিবাহে ইচ্ছুক ধনী পরিবারের মহিলারা নিজেদের জন্য পাত্র নির্বাচন করার অধিকারী ছিলেন। এই সময় সাধারণের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিলনা। তবে স্ত্রী সন্তানের জন্মদানে অক্ষম হলে স্বামী বহুক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতেন। বৌদ্ধধর্ম মহিলাদেরও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদন করেছিল। ইসিদাসীর কাহিনিতে বিবাহ বিচ্ছেদের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে নগর সভ্যতার বিকাশ তথা বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন যে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা নারীর সামাজিক অবস্থানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তবে এই সময় থেকেই মূলতঃ পুরুষের পাশাপাশি নারীও বৌদ্ধ মঠ সংঘে প্রবেশের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে ধর্মীয় জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করে। সমাজের নানা অংশের প্রতিনিধিত্বকারী মহিলারা সতঃস্ফূর্তভাবে মঠের সংঘজীবনে প্রবেশ করেছিলেন, যেমন – রাজপরিবার ও অভিজাত বংশের মহিলারা, ধনী বণিক পরিবারের মহিলারা, প্রথিতযশা ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলারা, সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলারা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলারা অন্যান্য বর্গের অন্তর্ভুক্ত মহিলাগণ ও সর্বোপরি গণিকা পেশার সাথে যুক্ত একটি অংশ এই ধর্মের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মহিলাদের সংঘজীবনে প্রবেশকে কেবলমাত্র ধর্মীয় আধারে বিচার করলে ভুল হবে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে অনেকের কাছেই এটি ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ, যার উপর এক সময়ে উচ্চবর্ণের পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষুণীরা একটি স্বয়ংক্রিয় সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, যদিও তা সম্পূর্ণভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রণ বর্জিত ছিলনা।

এর পূর্বে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরও মহিলাদের জন্য সংঘের দ্বারা উন্মোচিত করেছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। দিগম্বরদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এক্ষেত্রে যথেষ্ট রক্ষণশীল এবং তাঁরা নারীদের সংঘজীবনে প্রবেশাধিকার দেননি, তাঁরা মনে করতেন নারীরা মোক্ষ লাভের উপযোগী নয়। তবে শ্বেতাম্বররা পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সংঘজীবনে স্বাগত জানায় এবং ছত্রিশ হাজার মহিলা জৈন সংঘভিত্তিক জীবনে প্রবেশ করেছিল যা ছিল সংখ্যাগত দিক থেকে পুরুষ শ্রমণদের প্রায় দ্বিগুণ। এই বিষয়টিই প্রমাণ করে অপ্রচলিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন তৎকালীন সমাজ জীবনের চাহিদা অনুযায়ী যে বিকল্প পরিকাঠামো নির্মাণ করেছিল তা নারী সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের আবেদন ছিল এক্ষেত্রে আরো বেশি।

এই ধর্ম যে কতটা সময়োপযোগী ছিল তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল বৌদ্ধধর্ম নারীর শ্রমের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই বোধহয় এই ধর্ম উচ্চবর্গের পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আকৃষ্ট করেছিল সমাজের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অংশকে। এই জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ জুড়ে ছিল নারী, যারা গ্রামজীবন থেকে নগরজীবন – এই যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন তার সাথে মানিয়ে নেওয়ার ও নিজেদের অস্তিত্বকে কোনক্রমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এরা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হন। নানান পেশার সাথে যুক্ত মহিলারা, যেমন – নর্তকী, সংগীত পরিবেশক, গণিকা ও সর্বোপরি দাসীবৃত্তির সাথে যুক্ত শূদ্র মহিলাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গৌতম বুদ্ধ আস্থা প্রকাশ করেন যে পুরুষের মত নারীও সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে সক্ষম। পুরুষের মত নারীও যদি মুক্তির পথ অনুসরণ করে কঠোর ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে তবে সে জ্ঞানদীপ্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। বৌদ্ধ নথিতে এই ধারণার সবিস্তার উল্লেখ পাওয়া যায় –

"Straight' is the name that Road is called, and 'free from fear' the Quarter written thou art bound. *They Chariot* is the 'Silent Runner' named, with wheels of Righteous Effort filled well, conscience the Learning - board; the Drapery is Heedfulness, the Driver is the Dharma, I say, and Right views, they that run before. And be it woman, or be it man for whom such a chariot doth wait, by that same car into Nirvana's presence shall they come".

সুতরাং নারী এক্ষেত্রে শুধুমাত্র জ্ঞান লাভে সমকক্ষই নয়, সে একই পথে মুক্তি লাভের আস্বাদও লাভ করতে পারে। এই কারণেই সম্ভবত বুদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের উভয়ের জন্যই সংঘের দ্বারা উন্মুক্ত করেন। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়কেই নিজের জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই কারণে অচিরেই তাঁর মহিলা শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

তবে পালি সাহিত্য থেকে জানা যায় সংঘ জীবনে প্রবেশের পথটি - নারীদের পক্ষে তত সহজ ছিলনা। যদিও বুদ্ধ স্বয়ং বলেন যে নারীও সন্ন্যাস গ্রহণে সক্ষম, কিন্তু তাঁর বিমাতা প্রজাপতি ও বহু নারীকে তিনি প্রাথমিকভাবে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেননি। কিন্তু তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দ-র আবেদনে তিনি সাড়া দিতে বাধ্য হন। বহু ঐতিহাসিক এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের মতে এই ঘটনাটিকে পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুণীদের অবস্থানগত অবনয়নকে যথার্থতা প্রদানের জন্য। সাধারণভাবে বলতে গেলে বুদ্ধ স্বয়ং নারী ও পুরুষকে সমমর্যাদায় স্থাপিত করেছিলেন –

"they are capable" (অনুত্তর নিকয়)। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ সংঘে নারীর মর্যাদা হ্রাস পায় এবং সমাজের নানান নিয়ম তথা বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে সংঘজীবনেও এমন কিছু রীতি নীতি প্রণয়ন করা হয়, যেখানে ভিক্ষুদের প্রতি ভিক্ষুণীদের আনুগত্যকে আবশ্যিক করে তোলা হয়। এই কারণেই হয়তো নানা কাহিনিকে পরবর্তীকালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, কারণ বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় চারশ বছর পর বৌদ্ধ নথিগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ হয়। ফলে এই ব্যাপক সময়ের মধ্যে নারীর অবস্থানগত বহু পরিবর্তনকেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের একাংশ এই কাহিনীটিকে সর্বোতভাবে সত্য আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভিক্ষুণীদের সংঘকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমাজের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। এই কারণেই তিনি ভিক্ষুণীদের জন্য স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম প্রচলন করেন যেগুলি পালনের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুণীদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এবং তাঁর বাস্তবক্ষেত্রে ভিক্ষুদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহা প্রজাপতি এবং অন্যান্যরা যখন সংঘজীবনে প্রবেশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তখন বুদ্ধ বলেন যে কেবলমাত্র আটটি প্রধান নিয়ম (Eight Chief Rules) বা Garudharma পালন করলেই তাঁরা সংঘজীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। এইভাবে সংঘজীবনে কেবলমাত্র মহিলাদের উপর কিছু বাধ্যবাধকতা বা শর্ত আরোপ করা হয়। কুল্লভগ্য বিনয়ে (Cullavagga Vinaya) উল্লিখিত এই নিয়মগুলি হল –

১। একজন ভিক্ষুণীর পক্ষে ভিক্ষুদের যথাযথভাবে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন একান্তভাবে আবশ্যিক। সে ভিক্ষুদের প্রতি সমস্ত প্রকার ধর্মীয় কর্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য।

২। ভিক্ষুদের অনুপস্থিতিতে কোন ভিক্ষুণী একা কোন স্থানে বর্ষাকালে (Vassa) অতিবাহিত করলে, তা গর্হিত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩। অর্ধমাসিকভাবে (arvaddhamasam) যে ধর্মীয় উপাচারগুলি হবে তা পালনের জন্য ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের অনুমতি ও উপস্থিতি প্রার্থনা করবেন। ভিক্ষুদের অনুমোদন ব্যতিত উপসথ আচার (Uposatha Ceremony) পালন সঙ্গত নয়। অপরদিকে Ovada-র মত ধর্মীয় আচরণ পালন ভিক্ষুণীদের প্রতি আবশ্যিক, যেখানে তাঁরা প্রধান আটটি নিয়ম মেনে চলেছেন কিনা তা ভিক্ষুদের দ্বারা বিশ্লেষিত হবে। অর্থাৎ ভিক্ষুক ভিক্ষুণীদের সমালোচনা করতে পারবে। এই ধরণের আচারগুলি পালনের জন্য ভিক্ষুরাই সময় ঠিক করে দেবে।

৪। Vassa বা বর্ষাকালের পর Pavarana নামক আচারটি মধ্য দিয়ে যাচাই করা হবে যে ভিক্ষুণীরা সমস্ত নিয়ম সঠিকভাবে মান্য করেছেন কিনা। সংঘে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সভার সামনে এর বিশ্লেষণ হবে।

৫। কোন ভিক্ষুণীর পক্ষে গর্হিত অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে অপরাধ স্বীকার করতে হবে এবং ('Mannatha') 'মান্যতা' বিধানটি অনুসরণ করতে হবে।

৬। Six Rules বা ষষ্ঠ বিধানের যথাযথ অনুশীলনের মধ্যে দুই দিয়ে বছর পরই ভিক্ষুণীরা উপসম্পদা (Upasampada initiation) -এর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

৭। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের কোন দোষে অভিযুক্ত করতে পারবে না।

৮। ভিক্ষুদের সংঘ পরিচালনায় ভিক্ষুণীদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হলেও, ভিক্ষুণীদের সংঘ পরিচালনায় ভিক্ষুরা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন।

অর্থাৎ উপরোক্ত বিধানগুলিই প্রমাণ করে সংঘজীবনেও ভিক্ষুদের তুলনায় ভিক্ষুণীদের অবস্থান নিম্নে ছিল এবং ভিক্ষুদের মত তাঁরা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত না। তবে বুদ্ধ কখনোই নারীর জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনার দ্বারা রুদ্ধ করে দেননি, তিনি নারীকেও একটি বিকল্প জীবনের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি সামাজিক রীতি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে অস্বীকার করে দেননি, বরং

তাকে সময়োপযোগী করে তুলে সামাজিক ও ধর্মীয় পরিসরে নারীর যে 'স্থান' তাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই বহু সংখ্যক মহিলা "শ্রমণা" হিসাবে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। আগুত্তর নিকয়তে উল্লিখিত আছে দুইজন দেবতা বুদ্ধের সম্মুখে আভির্ভূত হয়ে বলেন যে কয়েকজন নারী সমপূর্ণভাবে মুক্তি তথা নিধান (anupadisesa, suvimutta) লাভ করেছেন। সংযুক্ত নিকয়তেও নারীর মুক্ত লাভের সপক্ষে যথেষ্ট বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। নারী সম্পর্কে বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী আরোও স্পষ্ট হয় জাতকের একটি উপাখ্যানে। যেখানে বর্ণিত আছে পুনর্জন্ম ও দীর্ঘ ক্লেশ ভোগের মধ্য দিয়ে নারী পুরুষ উভয়েই মুক্তি লাভ করে এবং দেবলোকে প্রবেশ করে। সেখানে তারা পরম গৌরব লাভ করে। বাস্তবক্ষেত্রে তৎকালীন নারীর কাছে সংঘজীবনে প্রবেশই ছিল মুক্তি স্বরূপ। সমাজের অন্যত্র যে কোনো জায়গার তুলনায় এখানে তাঁরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। সংঘজীবনে প্রবেশ ছিল তাদের কাছে (Samsara) সংসার থেকে মুক্তির পথ।

মূলতঃ বিনয় পিটক ও মুত্ত বিটক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান বিষয়ক তথ্যগুলি পাওয়া যায়। বিনয় পিটকে ভিক্ষুণীবিভাঙ্গ (Bhikkhunivibhanga) এবং ভিক্ষুনিখন্ডক (Bhikkhunikhandak) -তে শ্রমণাদের যে সমস্ত রীতি নীতি মেনে চলতে হত। সেই সমস্ত বিধান নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এছাড়া সংযুক্ত নিকয়-র একটি অংশ ভিক্ষুণীসংযুক্ত (Bhikkhuni-Samjukta) এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করতে সাহায্য করে।

ভিক্ষুণী ব্যতিত সাধারণ নারীর প্রতি বৌদ্ধধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মে নারীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যিক ছিল না। বহু অবিবাহিত নারী পরবর্তীকালে সংঘে যোগদান করেছিল। বৌদ্ধধর্মেও মাতৃত্বের ধারণাকে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় এই সময় গণিকা পুত্রদের হত্যার ঘটনাও হ্রাস পায়, অর্থাৎ তারাও সামাজিকভাবে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আম্বপালী গণিকার কথা মিরি অভয়ের মাতা হিসাবেও পরিচিত হন। বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমান মর্যাদার কথা বলা হয় বৌদ্ধধর্মে। তবে বহুক্ষেত্রেই এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে সংঘে প্রবেশকালে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম নারীর প্রতি কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল, যেমন – রাণী মল্লিকা কন্যাসন্তানের জন্মদান করেছেন শুনে বুদ্ধ রাজা প্রসেনদিকে বলেন –

"A woman child, O Lord of men, may prove Even a better of spring that a male" কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বৌদ্ধধর্ম পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব মুক্ত ছিল। Navey Folk তাঁর প্রবন্ধ "An Image of Women in Old Buddhist Literature : the Daughters of *Masa*" -তে উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধ সাহিত্যের আবির্ভাবের সময় থেকে নারীর অবস্থানগত অবনয়ন লক্ষ্য করা যায়।

আসুত্তর নিকয়তে পাওয়া যায় –

"Womenfolk are uncontrolled, Ananda. Womenfolk are envions, Ananda. Womenfolk are greedy, Ananda, Womenfolk are *neeak* in Wisdom, Ananda".

পলি গ্রন্থ আসুত্তর নিকয়তে আরোও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় যে, একজন নারী কখনোই যোগ্য রাজা হতে পারে না। তবে কোনো পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব "Monks it is impossible that a woman

can be a wheet turning king; this status can not be found. But monks it is possible that a man can be a wheet - turning king" বৌদ্ধ সংঘের পুরুষতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বুদ্ধের পরবর্তী সমস্ত দলাই লামারাই ছিলেন পুরুষ এবং তাঁরাই প্রধান হিসাবে সংঘ পরিচালনা করেন।

৭.১.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঃ

R. M. DAs, Women in Manu and his seven Commentators, Varanasi, 1962.

Shakuntala Rao Shastri, Women in the Vedic Age, Bombay, 1952.

David Kinsley, Hindu Goddesses : Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Berkeley : University of California Press, 1986.

Uma Chakrabarty, "Conceptualizing Brahmanical Patriarchy in Early India, Gender, Caste, Class and State", Economic and Political Weekly 28 : 579 - 85.

বৌদ্ধ ধর্ম ঃ

Bimala Churu Law, ed., Women is Buddhist Literature, Varanasi, 1927, reprint 1994.

I. B. Horner, Women under Primitive Buddhism : Laywomen and Alms Women, London, reprint Delhi, 1975.

Uma Chakravarti, "The Rise of Buddhism as Experienced by Women", Manushi, 8, 6-10.

Kathryan R. Blackstone, Women in the Footsteps of the Buddha, Delhi, 2000.

Diana Y. Paul, Women in Buddhism : Images of the Feminine in Mahayana Tradition, Berkeley, 1979.

Nupur Dasgupta, "Toils untold : An Appraisal of the Attitude Towards Women and Their Work in Early Pali Buddhist Literature", in Anuradha Chanda, Mahua

Sarkar, Kunal Chattopadhyaya, eds, Women in History, Kolkata, 2003, 1943.

জৈন ধর্ম ঃ

Padmanabha S. Jaini, The Jaina Path of Purification, Berkeley, 1981.

Padmanabha S. Jaini, Gender and Salvation : Jaina Debates on the Spiritual Liberation of Women, Berkeley, 1991.

প্রাচীন ভারতে নারী; সাধারণ তালিকা।

৭.২.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা কিরূপ ছিল তা আলোচনা করা।
২। প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক জীবন কি কেবল ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত?
৩। ভারতীয় ধর্মচেতনার নারীত্বের বা মাত-আরাধনার স্বরূপটি ব্যাখ্যা কর।
৪। জৈন ধর্মে নারীর সামাজিক মর্যাদা কেমন ছিল?
৫। বৌদ্ধ ধর্মে নারীর সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল? এই ধর্মে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ কেমন ছিল তা আলোচনা কর।

৭.২.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। খ্রীষ্টধর্মে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে আলোচনা কর।

২। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

৩। ধর্মীয় তথা সামাজিক ইতিহাসে খ্রীষ্টান মহিলাদের কি কোন ইতিবাচক ভূমিকা আছে ?

৪। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে আলোচনা কর।

৫। আধুনিক ভারতে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কি মুসলিম নারীর মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে ?

৬। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিম নারী সংক্রান্ত বিতর্কের কয়েকটি দিক আলোচনা কর।

৭। শিখ ধর্মে নারীর মর্যাদা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখ।

———————

৩। Rebecca Merrill Groothuis, *Good News For Women*, (Baker Books, 1997)

৪। প্রবন্ধ ঃ Alister McGrath, "*In what way can Jesus Be a Moral Example for Christians* ?" Journal of Evangelical Theological Society, vol. 34, no. 3 (September 1991) : p. 295.

৫। Website : http://www.ivpress.com/groothuis/doug/archives/000134.php

৬। Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengali, 1849-1905*, Princeton, 1984.

৭। Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women In Colonial Bengal, 1876-1939*, Leiden, 1996.

৮। Anowar Hossain, *Muslim Women's Struggle For Freedom In Colonial Bengal* (1873-1940), Kolkata, 2003.

৯। Amit Dey, *Sufism in India*, Kolkata, 1996.

১০। Amit Dey, *The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety, 1850-1947*, (Chapter V), Kolkata, 2005.

১১। Gail Minault edited, *The Extended Family*; *Women and Political Participation In India and Pakistan*, Delhi, 1981.

১২। Asghar Ali Engineer edited, *Problems of Muslim Women in India*, Bombay, 1995.

১৩। Shahida Lateef, *Muslim Women in India*, *Political and Private Realities* : 1890-1980s, New Delhi, 1990.

১৪। Sunita Puri, *Advent of Sikh Religion* ; *A Socio-Political Perspective*, New Delhi, 1993.

নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নানক মহিলাদের শাস্ত্র পাঠে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রার্থনা সভায় পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে অংশগ্রহণ করার কথা বলেছেন। এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কেননা হিন্দু নারীর বেদ পাঠের অধিকার ছিল না এবং তাদের শুদ্ধ মনে করা হতো না বলে মন্দিরের বিভিন্ন আবার অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হতো না।

সতীদাহ বা বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে গুরুনানক নীরব। তবে পরবর্তী শিখ গুরুগণ নানক কর্তৃক নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রয়াসে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশুকন্যা হত্যা বা সতীদাহকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তৃতীয় শিখ গুরু অমর দাস বলেছেন ঃ "প্রকৃত সতী হলেন সেই নারী যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করেন। প্রকৃত সতী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাপিয়ে পড়েন না ....." (আদি গ্রন্থ, রাগ সূহি, সুনীতা পুরী কর্তৃক উদ্ধৃত)। শিখ ধর্মে বিধবা বিবাহে অনুমোদন আছে অবশ্য বিধবাদের যদি তাতে সম্মতি থাকে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে হিন্দু বিধবার তুলনায় শিখ বিধবা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। গুরু অমর দাসের আরেকটি কৃতিত্ব হল এই যে তিনি যোগ্য শিখ মহিলাদের ধর্মপ্রচার কার্যেও নিয়োগের অনুমতি দেন এবং সাবেকী ধর্মীয় ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে মহিলাদের যুক্ত করার কথা ভাবেন। শিখ ধর্মশাস্ত্রে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। গুরু নানক এই সমতার উপর গুরুত্ব দিলেও মনে রাখা দরকার যে সেই যুগে নারী স্বাধীনতা বলে যা বোঝাতো তা বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতার ধারণার থেকে পৃথক। নানকের চেতনায় আদর্শ নারীর যে ভাবমূর্তি তার সঙ্গে গতানুগতিক সমাজে নারীর ভাবমূর্তির মৌলিক পার্থক্য নেই। নারী যদি রূপে, গুণে অসামান্যাও হন তবু তাঁর কাছে বিনম্রতা এবং স্বামী তথা পরিবারের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়েছে। তবু মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের পটভূমিতে নানক নারীকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ক্ষেত্রে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা উপেক্ষা করার মতো নয়। হিন্দু সমাজে যখন নারীকে সমস্ত পাপের উৎস হিসেবে দেখা হতো, সেই পরিস্থিতিতে নানক কর্তৃক নারীকে মর্যাদা দানের মধ্য দিয়ে একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ জীবনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

৭.২.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Douglas R. Groothuis, *Unmasking the New Age : Is There a New Religious Movement Trying to Transform Society* ? (Inter Varsity Press, 1986)

২। Rebecca Merrill Groothuis, *Women Caught in the conflict : The Culture War Between Traditionalism and Feminism* (Baker Books, 1994)

মিলন স্বামীর মর্জির উপর নির্ভরশীল। এখানে ফরিদ যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোকে শক্তিশালী করেই মহিলাদের জন্য একটু জায়গা সৃষ্টি করছেন। এই হেঁয়ালিটি মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ বাবা ফরিদের নারী আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পেতে পারেন তবে তা পারিবারিক সীমান্তের মধ্যেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংক্রান্ত চেতনা কিভাবে একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় তা বুঝতে গেলে ফরিদের কাব্যের সঙ্গে পাঞ্জাবের আরেক সুফী কবি শাহ হোসেনের কাব্যের তুলনা করা যেতে পারে। হোসেনের কবিতায় নারী সরাসরি ঈশ্বরকে সম্বোধন করছেন। ঈশ্বর এর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ হোসেনের কাব্যে একই স্থানে অবস্থান করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোকে স্বীকার করে নিলেও হোসেনের কাব্যে এই কাঠামোকে প্রান্তিক অবস্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাব্যে নারী একজন ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে। পাঞ্জাবের এই ঐতিহ্য শিখ ধর্মে নারীর অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে। [J. S. Grewal — "Female Voice in Punjabi Sufi Poetry" in Mansura Haidar edited *Sufi*, *Sultans and Feudal Order* New Delhi, 2004]

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে সামাজিক রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায় যা সমাজে নারীর অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলে। মুসলিম ধর্মীয় আইন ধর্ম তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিভেদ করে না। সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ তথা পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর অবস্থা তাত্ত্বিকভাবে উন্নততর। ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মুসলিম আইনের এই সুবিধা হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি, অর্থাৎ হিন্দু নারীর শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এই পটভূমিতে গুরু নানকের আবির্ভাব ঘটে যিনি শিখ ধর্মমতের প্রবক্তা। সমাজে রারা মহিলাদের হীন চোখে দেখতো তাঁদের সমালোচনা করে নানক প্রশ্ন করেন ঃ "যাঁরা মহাপুরুষদের জন্মদান করেন তাঁদের কেন হীন বলা হবে ?" (**আদি গ্রন্থ**, রাগ আম আ, পৃ: ৪৭৩, cited in Sunita Puri, *Advent of Sikh Religion, A Socio-Political Perspective*, New Delhi, 1993) সেই যুগে যে সমস্ত যোগী একদিকে নিজেদের ব্রহ্মচারী বলতো আরেক দিকে লালসার দৃষ্টিতে মহিলাদের দেখতো তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। শিখ ধর্ম ব্রহ্মচর্যের কথা বলে না। স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন শিখ ধর্মে গ্রহণযোগ্য। নানকের মতে বিবাহ মানবিক দুর্বলতার পরিচয় বহন করে না বরং সস্থ বৈবাহিক জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। আদিগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বিবাহ কেবল দৈহিক মিলন নয়। আধ্যাত্মিক মিলনও বটে। শিখ একেশ্বরবাদ বিবাহিত নর-নারীর দুই আত্মার মিলনের কথা বলে। নানকের উপদেশে এক পুরুষের সঙ্গে এক নারীর সম্পর্কে জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নারী বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। ব্যাভিচারকে নিন্দা করা হয়েছে। সাবেকী সমাজে বৈবাহিক জীবনে কেবলমাত্র মহিলাদের কাছেই আনুগত্য প্রত্যাশা করা হতো। নানক বললেন এই আনুগত্য দুই তরফেই থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সুস্থ দাম্পত্ত্য জীবনে নারী-পুরুষ উভয়েই পরস্পরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। এইভাবে নারীর মর্যাদা স্থাপনে নানক প্রয়াসী হলেন। পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে দেখা হয়েছে শিখ ধর্মে এবং বলা হয়েছে যে পরিবারের সদস্যদের নৈতিক ও জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমান দায়িত্ব

শক্তি সঞ্চয় করে এবং ঐ পরিস্থিতি শিক্ষিত ও গণতন্ত্র প্রেমী মহিলাদের অনুকূল হয় না।

জ্ঞানী, গুণী মুসলিম যাঁরা Sir William Muir-এর নারী সংক্রান্ত বক্তব্য, অর্থাৎ ইসলাম মহিলাদের হেয় করে, এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না তাঁরা ইসলামের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখান যে ইসলামের ধাপদী যুগে মহিলাগণ রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, কবিতা, বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। বিশেষতঃ হজরত মহম্মদের পরিবারের মহিলাদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি বিরচিত The Spirit of Islam-এর উল্লেখ করা যায়।

আরেকটি কথা বলে ইসলাম ও নারী সংক্রান্ত আলোচনাটি শেষ করবো, কারণ সেই প্রসঙ্গটি আমাদের 'শিখধর্মে নারী' আলোচনাটি বুঝতে সাহায্য করবে। তা হল এই যে, ভারতীয় মধ্যযুগে অনেক মহিলা সুফী প্রভূত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। এই আলোচনা আমার গ্রন্থে (Amit Dey, *Sufism in India*) আমি করেছি। এটাও দেখা গেছে যে জনৈক মহিলা সুফী, রওশান বিবির দরগাহকে কেন্দ্র করে কিভাবে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে সুফী আন্দোলন মহিলাদের রক্ষণশীল তথা শাস্ত্রানুসারী ইসলামের থেকে অধিক মর্যাদা দেয় ও ধর্মীয় উদারতার কথা বলে। বিশ্বের শান্তি ও সৃজনশীলতা নির্ভর করে ধর্মীয় ঔদার্হ্যবোধের মধ্যে ও **ইজতেহাদ** কেন্দ্রীক যুক্তিবাদের মধ্যে।

৭.২.২.৩ ঃ শিখ ধর্ম ও নারী

ইসলাম ও নারী প্রসঙ্গে আমরা ইতি টেনেছিলাম সুফীবাদের কথা বলে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় চিস্তী সুফী বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ-ই-শক্কর হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকলের কাছেই সমান শ্রদ্ধেয়। তিনি অত্যন্ত মধুর কবিতা রচনা করতেন তাই তিনি গঞ্জ-ই-শক্কর নামেও পরিচিত। গঞ্জ-ই-শক্কর কথাটির অর্থ হল মিছরির ভাণ্ডার। তিনি গুরু নানকের প্রজন্মের অনেক আগে জন্ম গ্রহণ করায় দুজনের সাক্ষাৎ হয়নি। তবে পাঞ্জাবের ঐ সুফীর কাব্যের দ্বারা গুরুনানক গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং শিখদের পবিত্র গ্রন্থ গুরুগ্রন্থসাহেবেও বাবা ফরিদের কাব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশ ভাগের পর বাবা ফরিদের দরগাহ্ যা পশ্চিম পাঞ্জাবের পাকপাট্টানে অবস্থিত, তা পাকিস্তানে চলে যায়। তা সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ শিখ তীর্থ যাত্রীগণ যখন পাকিস্তানে অবস্থিত গুরুদ্বার ভ্রমণ করেন তখন বাবা ফরিদের দরগাহ্ এ গমন করে তাঁকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাবা ফরিদের নাম উল্লেখ করার কারণ হল এই যে তাঁর কবিতায় নারী প্রসঙ্গ আছে যা অনুধাবন করতে পারলে শিখ ধর্মে মহিলাদের স্থান কোথায় বুঝতে সুবিধা হতে পারে। বাবা ফরিদের কাব্যে যে নারীকণ্ঠ আছে তা নূতনত্ত্বের দাবি করে না বরং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার মিল আছে। এখানে প্রেমময় ভক্তি প্রকাশ পাচ্ছে আদর্শ স্ত্রীর মাধ্যমে যাকে সোহাগণ বলা হয়েছে। তবে পারস্পরিক ভালবাসায় যে সমতার চেতনা থাকে তা এখানে রক্ষিত হয় নি। এখানে ঈশ্বর রূপ স্বামী সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এখানে প্রেক্ষময়

হেজাব সম্পর্কে শাবানার মন্তব্যকে আলোচনা করতে পারি। শাবানার মতো শিক্ষিত মহিলার কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকার আছে। এইজন্য তাঁর কোন ইমামের বা মৌলবীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন কোন মৌলবী বা উলামা এই পরিস্থিতিকে সহজভাবে নেবেন না কারণ এটা চলতে থাকলে সমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি কমে যাবে। জ্ঞানী ব্যক্তির শাস্ত্র বা কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকারকে বলে ইজ্‌তেহাদ। এটা একটা গণতান্ত্রিক অভ্যাস। প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে, যখন পাশ্চাত্ত্য তথা ইওরোপের নিরঙ্কুষ সামরিক ও রাজনৈতিক কতৃত্ব স্থাপিত হয়নি, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলাম রাজশক্তি, হিসেবে তার বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখতে সক্ষম হয়েছিল, সেই পটভূমিতে মুসলিম সমাজে ইজতেহাদের মর্যাদা ছিল। ভারতে সুলতানী তথা মোঘল যুগেও এর মর্যাদা ছিল। তাই মুসলিম রাজশক্তি অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়েই তাঁর সাম্রাজ্যকে বজায় রাখতে ও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৯ শতক থেকে যখন পাশ্চাত্ত্যের সামরিক শক্তি তাঁদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে তখন মুসলিম রাজশক্তির বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাকে আর তেমন উৎসাহ দিতে উলেমা প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের আশংকা হল যে বিজয়ীর ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম (ভারতের প্রেক্ষাপটে হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্ম মতবাদ ইত্যাদি) সেক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ঐ পেক্ষাপটে ইজতেহাদের গুরুত্বও কমে গেল কারণ ইজতেহাদ যুক্তিবাদ ও পরীক্ষা নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দেয়। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের আক্ষরিক অর্থে শাস্ত্র মেনে চলার কথা উলেমা বলেছিল। ইজতেহাদের পথ আংশিকভাবে রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে মুসলিম মহিলাদের সার্বিক বিকাশের পথ, স্বতন্ত্র্য ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে ওঠার পথও অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছিল বলা যায়। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় থেকে ভারতীয় মুসলিম সমাজে উলামার প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাব সব সময়ে মুসলিম মহিলাদের পক্ষে ভাল হয়নি। সঙ্গীত, পোষাক ইত্যাদি নানা বিষয়ে ক্রমাগত ফতোয়া জারি করে মুসলিম মহিলাদের কোনঠাসা করার প্রয়াস একশ্রেণীর উলামার মধ্যে দেখা যায়। এই সময়ে, অর্থাৎ বিংশ ও একবিংশ শতকে মুসলিম মহিলার স্বাধীনতা রক্ষার্থে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক জ্ঞানী গুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন। বিভিন্ন N. G. O. ও মুসলিম নারীর উপর কোনো অবিচার হলে সোচ্চার হয়েছে। তবে তাদের আন্তরিক প্রয়াস কতটা কার্যকর হল ভবিষ্যতে তার উত্তর পাওয়া যাবে। বিংশ শতকের ঠিক সূচনায় **বেহেস্তী জেওয়ার** (স্বর্গীয় অলংকার) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ উর্দু বই লেখেন দেওবন্দের দার-উল-উলুম মাদ্রাসার প্রখ্যাত আলিম মৌলানা আশরফ আলী থানওই (Ashraf Ali Thanawi)। এখানে কোরাণ, হাদিস অক্ষরে পালন করে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনা শাসক জিয়া-উল-হক, যিনি বল প্রয়োগে অর্জিত ক্ষমতা বৈধতা দিতে ধর্মীয় মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তিনি উলমাকে তুষ্ট করতে পাকিস্তানী মহিলাদের মধ্যে উপরোক্ত **বেহেস্তী জেওয়ার** গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করতে প্রয়াসী হন। শিক্ষায় অগ্রসর ও সমাজ সচেতন এক শ্রেণীর পাকিস্তানী মহিলাগণ জেনারেল জিয়ার ঐ প্রয়াসের বিরোধীতা করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি (পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদির উদাহরণ থেকে) যে ধর্মীয় মৌলবাদ, ও সামরিক শাসন অনেক সময়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে

জীবনী) সাহিত্যে এর প্রতিফলন আছে। বৃহৎ জনজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করার অধিকারও নারীকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের পরে একজন মুসলিম নারীর পুনর্বিবাহেরও অধিকার আছে। বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। (Amit Dey, *The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety*, নারী বিষয়ক অধ্যায়, Anowar Hossain এর গ্রন্থের ভূমিকা)। এটা মনে রাখা দরকার যে ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব সমাজে মহিলাদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এই তত্ত্ব সকল গবেষক গ্রহণ করেন না। সমালোচকগণ মনে করেন যে, মুসলিম সমাজে নারীকে খুব সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেন যে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে ছেলেরা পিতার সম্পত্তির সিংহভাগ অধিকার করেন। এই সমালোচকগণ মনে করেন যে হজরত মহম্মদের প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে নারীকে সমানাধিকার দেওয়া সম্ভব হয় নি। (Malladi Subbamma, *Islam and Women*, New Delhi, Sterling Publishers, 1988, p.128. Anowar Hossain কর্তৃক উদ্ধৃত)। স্যার উইলিয়াম ম্যুর (William Muir ১৯ শতক) মনে করেন যে হজরত মুহম্মদ মহিলাদের জন্য ইসলামে যেই স্থান নির্দিষ্ট করেছেন তা পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং পুরুষের সেবায় জীবন অতিবাহিত করা ছাড়া নারীর আর কোনো ভূমিকা নেই। পুরুষ ইচ্ছামতো অনায়াসে এবং নিঃশব্দে নিজের জীবন থেকে বিতাড়িত করতে পারে নারীকে। (Anowar Hossain এর গ্রন্থে উদ্ধৃত)। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার তা হল উইলিয়াম ম্যুর ১৯ শতকে বসে যখন লিখছিলেন সেই সময় থেকে আরম্ভ করে এই একবিংশ শতকের প্রাহ্ন বেলায় গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বর্ত্তমান সময়কে বলা হয় media তথা সংবাদ মাধ্যমের যুগ। এই সময়ে সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দে কোনো নারীকে বঞ্চিত করা সহজসাধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রাক্তন আই. এ. এস. অফিসার S. M. Murshed-এর একটি ছোট প্রবন্ধে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। প্রবন্ধটির নাম "What the Koran says about the veil," প্রবন্ধটি দ্য স্টেট্‌ম্যান পত্রিকায় (ইংরেজী) সতেরো নভেম্বর, ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ও সমাজসেবী শাবানা আজমীর পর্দা প্রথা সংক্রান্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম বুখারীর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত, শাবানা মন্তব্য করেছিলেন যে কোরাণ নারীর পর্দা বা হেজাবের কথা বলে না। ইমাম বুখারী, স্বীকার করেন না যে শাবানার কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকার আছে। ইমাম বলছেন যে কোরাণ পর্দা বা হেজাব অবলম্বনের কথা বলে। এখানে S M Murshed বলছেন শাবানার মতো শিক্ষিতা মহিলার কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকার আছে এবং তাঁর পর্দা বা হেজাব সংক্রান্ত মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। Murshed-এর ঐ প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবিও ছাপা হয়েছে তা হল প্রখ্যাত টেনিস তারকা সানিয়া মিরজা ইসলামী পোষাকে মায়ের সঙ্গে মক্কা ভ্রমণ করছেন। আমরা সকলেই জানি ধর্মীয় মৌলবাদীগণ টেনিস খেলার সময় সানিয়ার পোষাক-কেও শরিয়ত বিরোধী বলে নিন্দা করেছেন। যদিও সকল মুসলিম তা মনে করেন না। বরং টেনিসে সাফল্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন ও করছেন সানিয়া এটাই অনেকে মনে করেন। শাবানা বা সানিয়া কেউই ধর্মীয় মৌলবাদীদের কটাক্ষকে পাত্তা দিচ্ছেন না, এবং সংবাদ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ তাঁদের সপক্ষে আছেন। আমরা একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পর্দা বা

Laws, New Delhi : Oxford University Press, 1974, pp.5-6. Anowar Hossain লিখিত *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal, 1873-1940*, তে উল্লিখিত)

কোন কোন আধুনিক চিন্তাবিদ মনে করেন যে প্রাক-ইসলামীয় আরব দুনিয়ার ধর্মীয় ক্ষেত্রেও মহিলাদের একটা মর্যাদা ছিল। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে আরব জগতে সেই সময়ে বেশ কয়েকজন **কাহিনাহ্** বা মহিলা পুরোহিত ছিলেন। এছাড়া স্ত্রী দেবতার ধারণাও সেই প্রাক মুসলিম আরবসমাজে ছিল। (Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, New Delhi : Sterling Publishers, 1992, pp. 34-36, Anowar Hossain এর গ্রন্থে উল্লিখিত)

অনেক গবেষক আলোচনা করেছেন যে হজরত মহম্মদ তথা ইসলামের আবির্ভাবের পর যে ধর্মীয় সংস্কার-এর সূত্রপাত হয় তা সমাজে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। পবিত্র কোরাণ পুরুষ ও নারী, উভয়কেই সমানভাবে আহ্বান করে ধর্মের পথে চলার জন্য ঃ "Lo ! men who surrender unto Allah and women who surrender, and men who believe and women who believe ..... and men who guard their chastity and women who guard it and men who remember Allah and women who remember Allah has prepared for them forgiveness and a mighty reward." (পবিত্র কোরাণের এই অংশটি Asghar Ali Engineer এর গ্রন্থের 44 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।)

ইসলামে নারীর অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। একটি মত অনুযায়ী সম্পত্তির উপর মুসলিম নারীর অধিকার নিরঙ্কুষ কারণ স্ত্রী যদি প্রচুর সম্পত্তির মালিকও হন এবং স্বামী যদি দরিদ্রও হন, স্বামীর দায়িত্ব হল স্ত্রীকে ও সন্তানাদিকে নিজের ক্ষমতায় লালন করা। একজন মুসলিম নারী নিজ সম্পত্তির কোন অংশ স্বামী তথা সন্তানাদিকে পালন করতে ব্যয় করতে বাধ্য নন। (Zenab Banu লিখিত প্রবন্ধ "Muslim Women's Right to Inheritance", Asghar Ali Engineer সম্পাদিত *Problems of Muslim Women in India*, Bombay, Orient Longman 1995, p-34) উপরোক্ত বক্তব্যের যারা সমর্থক তারা মনে করেন যে হজরত মুহম্মদ সমাজের নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে হজরত মুহম্মদের কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয় যেমন ঃ বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সংখ্যা মাত্র চাঁরজনে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা, কন্যা সন্তান হত্যাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হওয়া, মেহের (*mehr*) বা বিাহের পণকে নববধূর পুরষ্কার হিসেবে ঘোষণা করা এবং বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের সময় নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে আরবদেশীয় আইনে নূতন মাত্রা সংযোজন করা ইত্যাদি। সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হজরত মুহম্মদ অনেক ক্ষেত্রে নিজের পারিবারিক জীবনকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নিজের দুধমাতা বিবি হালিমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। **সীরাত** (হজরত মুহম্মদের

নিতে পারেন তা আমরা অনুমান করতে পারি। ভারতের গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে এবং দরিদ্র বঞ্চিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ১৯ শতকের বাংলায় ভদ্রমহিলাদের অন্দর মহলে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে শিক্ষয়ত্রী হিসেবে খ্রীষ্টান মহিলাদের ভূমিকা সকলেরই জানা আছে। M. Borthwick তাঁর Changing Role of Women in Colonial Bengal এ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই শিক্ষিত খ্রীষ্টান মহিলাগণ তৎকালীন সমাজে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও মুসলমান সমাজসেবীদের স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক হয়েছিলেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে ১৯ শতকের বঙ্গদেশে উপরোক্ত খ্রীষ্টান মহিলাগণ যাঁরা অন্দরমহলে শিক্ষয়ত্রী হিসেবে কাজ করতেন তাঁদের অনেকক্ষেত্রে সন্দেহের চোখেও দেখা হতো। মনে করা হতো যে অন্দরমহলে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে তাঁরা ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার কার্যও করতে পারেন। (Amit Dey, *The Image of the Prophet*, Chapter V)

৭.২.২.৩ ঃ ইসলাম ও নারী

মুসলিম দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও মুসলিম মহিলাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। একবিংশ শতকে ঐ অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে একথা বলা যাবে না। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনার প্রয়োজন আছে, কেননা তা আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাংলায় মুসলিম মহিলাদের অবস্থা বোঝার সহায়ক হবে। সহস্র বছর ধরে সমাজে তথা পারিবারিক জীবনে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে মহিলাদের পুরুষের তুলনায় খাঁটো করে দেখা হতো। মনে করা হতো প্রকৃতির নিয়মে সবদিক থেকেই পুরুষের তুলনায় মহিলাগণ সীমিত ক্ষমতা বা দক্ষতার অধিকারী। মনে করা হতো যে পুরুষের কাছে মহিলার শর্তহীন আনুগত্যই পারিবারিক জীবনে শান্তি আনে। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে বিরাজ করতো অজ্ঞানতা। সেই অজ্ঞানতার যুগকে পরিভাষায় বলা হয় **জাহিলিয়া**। সেই যুগে মহিলাদের অবস্থা ছিল জন্তু জানোয়ারের মতো। কোনো আইনের অধিকার তাঁদের ছিল না। কন্যা সন্তানের অনেক ক্ষেত্রে জীবন্ত সমাধি হতো। একই পুরুষের অসংখ্য স্ত্রী থাকতো। কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ঘটনা মনে করা হতো। কন্যা সন্তানের যখন সাত বা আট বছর বয়স থাকতো তখনই জোর করে তাদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হতো। যুদ্ধবিগ্রহের প্রাচুর্য্য ও মদ্যপানের রেওয়াজ, সমাজে মহিলাদের দুরবস্থা বৃদ্ধি করেছিল। আরব সমাজে, সেই **জাহিলিয়ার** পটভূমিতে লুণ্ঠন বা ক্রয় করে বালিকাদের বিয়ে করার রেওয়াজ ছিল। মহিলাদের পুরুষের সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু মনে করা হতো না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে **জাহিলিয়ার** পটভূমিতে অর্থাৎ প্রাক-ইসলামীয় আরবদেশে অবস্থা শোচনীয় ছিল এই তত্ত্ব অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে ইসলামের আবির্ভাবের অন্ততঃ একশত বছর আগে থেকে আরব সমাজে মহিলাদের মর্যাদার চোখে দেখা হতো। তাঁদের কিছু কিছু অধিকারও ছিল এবং তাঁরা সীমিতভাবে কিছুটা স্বাধীনতাও ভোগ করতেন। (Ashaf Ali Fyzee, *Outlines of Muhammadan*

বাইবেল এর ঈশ্বর হল পুরুষ এবং সেক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে ঈশ্বরের অধিকতর সাদৃশ্য থাকবে। অর্থাৎ ঈশ্বর যেভাবে তাঁর সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব জাহির করেন, পুরুষ মানুষও সেইভাবে মহিলাদের উপর নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই সমস্ত অভিযোগ খণ্ডনে উদ্যোগী Doug ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বাইবেলের ঈশ্বর কোনভাবেই পুরুষ নন। এই ঈশ্বরের কোন লিঙ্গ নেই। (John 4 : 24)

Doug বলছেন যে যেই ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাইবেল আবির্ভূত হয়েছিল সেখানে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের কর্তৃত্ব অধিক ছিল। তবে তার অর্থ এই নয় যে বাইবেল নারীর উপরে পুরুষের কর্তৃত্বকে বৈধতা দিতে চেয়েছিল। যীশু কখনই একটা পুরুষ শাসিত সমাজের কথা ভাবেননি। তাঁর অনুগামীদের অবাক করে দিয়ে যীশু মহিলাদের ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। (Luke 10 : 38-42)। নিজের নবজাগরণের (resurrection) পরে যীশু আবির্ভূত হয়েছিলেন মেরীর সম্মুখে এবং জগৎ পরিবর্ত্তনের যে ঘটনা যীশু ঘটাচ্ছিলেন তার সাক্ষী রেখেছিলেন মেরীকে। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা কারণ সেই যুগে মহিলাদের সাক্ষ্য দানের মর্যাদা দেওয়া হতো না (John 20 : 17-18; Matthew 28 : 5-10, Doug এর প্রবন্ধে উল্লিখিত) নিজের বক্তব্যের সমর্থনে Doug একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, and you are all one in Christ Jesus" (Galatians 3 : 26-28)

Doug আলোচনা করেছেন যে যীশুর গুরুত্ব তাঁর পৌরুষের জন্য নন, তাঁর সামাজিক গুরুত্ব নিহিত আছে তাঁর পবিত্র মানবতার মধ্যে এবং সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবার ক্ষমতার মধ্যে।

এবার বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে খ্রীষ্টান মহিলাদের অবস্থান তথা ভূমিকা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলে আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব শেষ করবো। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত মাদার টেরেসা কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাজ সেবামূলক কার্যকলাপ বজায় রেখেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বহু দুস্থ তথা নিরাশ্রয় শিশুর আশ্রয়। অনাথ শিশুদের ধমান্তরীত করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে যারা এনেছিলেন তাঁরা মাদারের সমাজসেবামূলক কার্যকলাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি বা চাননি। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে, যেখানে শিক্ষার আলো সর্বত্র পৌঁছায়নি সেখানে বিভিন্ন শিক্ষা ও সেবাপ্রতিষ্ঠানে বহু খ্রীষ্টান মিশনারী মহিলা শিক্ষা ও সেবার মাধ্যমে সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, তনিকা সরকার প্রমুখ তাঁদের গ্রন্থ *Christian conversions* এ দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশের অনেক সেবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় মিশনারীদের দ্বারা। অনেক প্রথম সারির বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে থাকে মিশনারী মহিলাদের দ্বারা। সুমিত সরকার যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সমস্ত খ্রীষ্টান সমাজসেবীদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার থাকে না। যেমন কয়েকবছর আগে ওড়িষ্যায় ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ যেই অষ্ট্রেলীয় সমাজসেবীকে এক ধর্মীয় মৌলবাদী পুড়িয়ে মেরেছিল, তাঁর ধর্মান্তরকরণের অধিকারই ছিল না। তাঁর দোষ হয়েছিল যে তিনি চিরবঞ্চিত কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও একজন নিরলস সমাজসেবী। তিনি তাঁর স্বামীর হত্যাকারীকে মার্জনা করেছিলেন। কতটা মহানুভবতা থাকলে একজন মহিলা এই সিদ্ধান্ত

প্রথম শতকে মহিলাদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে মহিলাগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। Stark তাঁর গবেষণায় (1996) দেখিয়েছেন যে আদি উপাদানগুলি পাঠ করে জানা যায় যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ঘটনা পুরুষদের থেকে মহিলাদের মধ্যে অধিকতর ছিল। অনেক নারী তাঁদের স্বামী বা ভ্রাতার সঙ্গে স্থানান্তরে গমন করে মিশনারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই সমস্ত মহিলাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। নানা অত্যাচার করা হয়েছিল, কখনও বা হত্যাও করা হয়। যীশু সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দিতে গিয়ে কখনও কখনও তাঁরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন। পল, যিনি যীশুর প্রধান বারজন অনুগামীর অন্যতম, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি কিছু পত্রে উল্লেখ করেছেন যে খ্রীষ্ট ধর্মের আদি পর্বে মহিলাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এমনকি গীর্জাও স্থাপনের পেছনে তাঁদের অবদান আছে। রোমান দুনিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম অনুমোদন পায়নি। ঐ সময়ে ঐ সমস্ত মহিলাগণ নিজেদের গৃহকে প্রার্থনার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। নিউ টেষ্টামেন্টে এমন অনেক উদাহরণ আছে যে মহিলাগণ প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, deaconess (যাজকের নীচের পদ) এবং ধর্মান্তরকরণে প্রয়াসী ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের ক্ষেত্রেও মহিলাদের এগিয়ে আসতে দেখা গেছে যদিও এই সমস্ত কাজ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য অনুমোদন ছিলনা।

খ্রীষ্টধর্মে আদিপর্বে এবং মধ্যযুগে মহিলাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই ধর্মে মহিলাদের ভূমিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক যুগে অত্যাচারিত হতে হয় না। তবে একটি দুঃখজনক প্রবণতা আজকাল দেখা যাচ্ছে, তা হল যেই সমস্ত দেশে খ্রীষ্টানগণ সংখ্যালঘু। সেখানে মাঝে মধ্যে খ্রীষ্টানদের, যার মধ্যে নানান সেবামূলক কাজে নিযুক্ত খ্রীষ্টান মহিলাগণও আছেন। অন্যান্য ধর্মের উগ্র মৌলবাদীদের হাতে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। আজকাল গীর্জা পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনকি প্যাস্টর (Pastors) এবং চ্যাপলেইন (Chaplain) পদও তাঁরা অলংকৃত করছেন। কেউ কেউ একে গত কয়েক দশকের নারীবাদী (feminist) আন্দোলনের প্রভাব হিসেবে দেখছেন।

কারও কারও মতে খ্রীষ্টধর্ম সমাজে নারীদের উপর পুরুষের প্রভুত্বকে ত্বরান্বিত করে। অনেক আধুনিক মহিলা মনে করেন যে গতানুগতিক সমাজে তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখা হয়। তাঁদের সম্বন্ধে পুরুষদের গতানুগতিক তথা অযৌক্তিক কিছু ধারণা তাঁদের সমাজে একটি প্রান্তিক অবস্থানের দিকে ঠেলে দেয়। অযৌক্তিক ধারণার বশবর্তী পুরুষ সমাজ মহিলাদের আশা আকাঙ্খা বা সমস্যা, সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। Doug Groothuis মনে করেন যে খ্রীষ্টানদের এই ধরনের অভিযোগ সম্বন্ধে সংবেদনশীল হওয়া উচিৎ। (http://www.ivpress.com/groothuis/doug/archives/000134.php) তাঁর মতে ঈশ্বর সকলকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে শেখান (Genesis 1 : 28) তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের বিরূদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেক অ-খ্রীষ্টান নারীবাদী অভিযোগ করেন যে

৭.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি থেকে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। খ্রীষ্ট ধর্মে নারীর ভূমিকা ও অধিকার।

২। ইসলাম ধর্মে নারীর ভূমিকা।

৩। শিখ ধর্মে নারীর মর্যাদা ও অধিকার।

৭.২.২.১ ঃ খ্রীষ্টধর্ম ও নারী

অন্যান্য যে কোন ধর্মের মতো খ্রীষ্ট ধর্মেও মহিলাদের স্থান তথা ভূমিকা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে বাইবেলে মহিলাদের মর্যাদা স্কীকৃত। এবং আজ আমরা খ্রীষ্টধর্মের যেই রূপ দেখি বা খ্রীষ্ট ধর্মান্দোলনকে যেই পর্যায়ে দেখি, তার পেছনে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম মহিলাদের এই অসামান্য অবদানের কথা বিস্মৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে অনেক নারী ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে একটি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্ট-ধর্মশাস্ত্রকে পাঠ করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, শাস্ত্র যেখানে যেখানে মহিলাদের মর্যাদা দিয়েছে, খুব সুপরিকল্পিতভাবে কিছু স্বার্থান্বেষী পুরুষ, গীর্জার পঠন পাঠন থেকে শাস্ত্রের সেই অংশগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। (Fox, 1996) বিশিষ্ট খ্রীষ্টধর্ম গবেষক King (1998) মন্তব্য করেছেন যে New Testament পাঠ করলেই বোঝা যায় যে যীশু খ্রীষ্টের একেবারে আদি ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মহিলা। যেই মহিলাগণ যীশুকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মেরী ম্যাগ্ডালিন, জোয়ানা, এবং সুজানা (Susanna)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে কেবল খ্রীষ্টধর্ম নয়, অন্যান্য ধর্মেও নারীকে আদিপর্বে বা শাস্ত্রে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পরে পুরুষশাসিত সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ শাস্ত্রকে এমনভাবে ব্যাখ্যা অথবা পরিবর্ত্তন করেছে যাতে করে মহিলাদের আর্থ-সামাজিকভাবে শোষণ করা যায়। ইসলাম ও শিখ ধর্মে নারীর স্থান সংক্রান্ত আলোচনায় সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার অবকাশ থাকবে। তবে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। রাজা রামমোহন রায় বহুভাষাজ্ঞানী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতও ভাল জানতেন। তিনি কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা নিরসন কল্পে আন্দোলন চালাতে গিয়ে শাস্ত্র পাঠকালে লক্ষ্য করেন যে বিধবাদের 'অগ্রে' স্থান দেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু ব্রাহ্মণ 'অগ্র' কথাটিকে বাতিল করে সেইস্থানে 'অগ্নি' কথাটি ব্যবহার করছে। আবার খ্রীষ্ট ধর্মে ফেরা যাক। যীশু যেখানেই গমন করেছেন, মহিলাদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এবং বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে, নারীসমাজের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছিল। এমনকি মৃত্যুর পরও তিনি নারীসমাজে সম্মান অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয়

পর্যায় গ্রন্থ - ২

RELIGION AND WOMEN

একক - ২

Islam, Sikhism and Christianity

বিন্যাস ক্রম ঃ

৭.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৭.২.২.১ ঃ খ্রীষ্টধর্ম ও নারী

৭.২.২.২ ঃ ইসলাম ও নারী

৭.২.২.৩ ঃ শিখ ধর্ম ও নারী

৭.২.২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.২.২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

এর উপর এ যেন ঔপনিবেশিক প্রশাসক এবং তার বিরোধী বা সমাজ সংস্কারকদের এক দড়ি টানাটানি খেলা। একথা বলার অর্থ অবশ্যই এই সমস্ত অগ্রণী ব্যক্তিত্বের অবদানকে অস্বীকার করা নয়, খালি এটুকুই মনে করিয়ে দেওয়া যে নারী নিজে এই বিরাট প্রেক্ষাপটে কোথাও যেন নিজেই হারিয়ে গেছে।

৭.৩.২.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ**

২। Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, The New Cambridge History of India IV.2 Indian (ed.) 1996.

৩। Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, The New Cambridge History of India III.1.Cup 1989.

৭.৩.২.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উচ্চবর্ণীয় ধর্ম-সংস্কারকরা সমাজে নারীর অবস্থানকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

২। স্ত্রীশিক্ষা প্রশ্নে সামাজিক ভূমিকা কেমন ছিল ?

৩। ব্রাহ্মসমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান আলোচনা কর।

৪। আর্য সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনা কর।

৫। থিওজফিকাল আন্দোলন নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছিল?

———

সমালোচনা করেন। এরপর 1908 থেকে Theosophic Order of Service তৈরী করা হয় যার লক্ষ্য ছিল মানবতাবাদী কার্যকলাপ যেমন জাতীয় শিক্ষার প্রমান বা বাল্যবিবাহ রোধের চেষ্টা। এরপর হোমরুল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছুদিনের জন্য। হলেও বেশান্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

থিওসফি আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাদাম ব্লাভাটস্কি মনে করতেন যে বাল্যবিবাহ এবং বাল্যবিধবাত্ব হল প্রকৃত হিন্দু মতাদর্শের বিকৃতি। অ্যানি বেশান্ত থিওসফি আন্দোলন সম্বন্ধে আকৃষ্ট হবার আগে (1889) সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এই পর্যায়ে 1874 সালে একটি বক্তৃতায় (The Political Status of Women) তিনি মেয়েদের ভোটাধিকার-এর দাবী তুলেছিলেন। থিওসফি আন্দোলনে যুক্ত হবার পর ভারতে এসে তিনি প্রাথমিক ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গুণকীর্তন করলেও পরবর্তীকালে তিনি সুনির্দিষ্ট সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1901 সালে Indian Ladies Magazine পত্রিকায় 'Education of Women' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বেশান্ত এই বলে সতর্ক করেন যে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি না হলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত অন্ধকার। তবে পশ্চিমী শিক্ষার নকলনবিসি ভারতীয় নারীর 'নারীত্ব' ভুলণ্ঠিত করবে। ভারতীয়দেরকে নারীত্বের আদর্শ নিজের সংস্কৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে — তাঁদের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত দশভূজা দূর্গা। এই নীতির রূপায়ন করবার জন্য তিনি একটি মহিলা কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন।

৭.৩.২.৫ : উপসংহার

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনে অভিঘাতে এবং আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তনের তাগিদে সমাজ সংস্কার আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসককুল বা খ্রীষ্টান নিশনারী, যারা হিন্দু সমাজের দুরবস্থা নিয়ে সোচ্চার ছিলেন তাদের অন্যতম প্রিয় লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারতীয় নারীর অবস্থান। Mill বা অন্যান্য প্রভাবশালী চিন্তাবিদরা এই প্রশ্নেই বারতীয় সমাজকে বিঁধেছেন, তাকে পশ্চাদ্পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেও নারীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে তৎপর হয়ে ওঠে। যে তিনটি আন্দোলন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম — ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ এবং থিওসফিকাল আন্দোলন, প্রতিটির নেতৃত্ব এবং অনুগামীদের গরিষ্ঠ অংশ উঠে এসেছিল এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই এবং অধিকাংশই ছিলেন উঁচু জাতের লোক। এঁদের মধ্যে সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ বা স্ত্রীশিক্ষা ছিল আন্দোলনের ক্ষেত্র। এই অংশ অনেকক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে বা তাকে প্রভাবিত করে ওই বিষয়গুলিতে প্রগতিশীল আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এতে একদিকে যেন মেয়েদেরকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজের অনপনেয় কলঙ্ক মোচন। নারীর শরীর

খ্রীষ্টানরা তীব্র সমালোচনা করেন। এই সময়তেই তাঁরা মূলজী থ্যাকারসার মাধ্যমে ভারতে আর্যসমাজী এবং ব্যক্তিগতভাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর সাথে যোগাযোগ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে এবং তারা একযোগে কাজ করতে সম্ভব হন।

ওলকট এবং ব্লাভাটস্কি ভারতে এসে পৌঁছন 1879 এর 16ই ফেব্রুয়ারী। বোম্বাইতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন বোম্বাই আর্য সমাজের প্রেসিডেন্ট হরিশচন্দ্র চিন্তামণি সহ অন্যান্য ব্যক্তি। ওলকট এবং ব্লাভাটস্কি এরপর দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই সখ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। 1882তেই দয়ানন্দ থিওসফিস্টদের পদ্ধতি প্রকরণ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। একারণেই দুই সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়।

ওলকট ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় অধ্যাত্মবাদ, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরতে থাকেন। অন্যদিকে মাদাম ব্লাভাটস্কি ছিলেন তাঁদের আন্দোলনের মুখপত্র **থিওসফিস্ট** এর প্রকাশনার দায়ীত্বে। শিক্ষিত ভারতীয় এবং কিছু ইউরোপীয়দের মধ্যে থিওসফিকাল সোসাইটির প্রভাব বাড়তে থাকে। অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম (যিনি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।) বা মেজর জেনারেল মর্গান অথবা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল এর মত ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। 1881 সালের অক্টোবর মাসে ওলকট এবং ব্লাভাটস্কি দক্ষিন ভারতে সফরে যান যেখানে তাঁরা হিন্দু নেতাদের কাছে সাদর অভ্যর্থনা এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। শেষ পর্যন্ত 1882 সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা তাঁদের মূল কর্মকেন্দ্র দক্ষিনে স্থানান্তর করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিনে আডেয়ার এর কাছে জমি কিনে সেখানে প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

পরে একটি আভ্যন্তরীণ সংকটে ব্লাভাটস্কি পত্রিকা সম্পাদনার দায়ীত্ব ছেড়ে ইংলন্ডে ফিরে যান। 1888 তে 15000 পৃষ্টার The Secret Doctrine প্রকাশ করেন ব্লাভাটস্কি। Isis Unveiled এবং The Secret Doctrine ছিল থিওসফি মুভমেন্টের মূল গ্রন্থ। থিওসফিস্টরা পুনর্জন্ম বা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে পরিকল্পনা সাথে হিন্দুধর্মের কর্মবাদী চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

ব্লাডাটস্কির শূন্যস্থান পূরণ করেন Annie Wood (Besant)। তিনি Secret Doctrine পড়ে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং এই আন্দোলনে যোগ দেন। ওলকট এর নেতৃত্ব সমালোচনার মুখোমুখি হলে তিনি (বেশান্ত) থিওসফিকাল আন্দোলনের নেত্রীপদে ব্রতি হন। তিনি 1893 তে ভারতে এসে পৌঁছন এবং 1933 এ মৃত্যু পর্যন্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই আন্দোলনে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি এবং অধ্যাত্মবাদের মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করলেও Madras Social Reform Movement, প্রাচীন ভারতের অবিমিশ্র প্রশংসা করবার জন্য বেশান্তকে

পরে কট্টরপন্থীদের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে **শুদ্ধি** এবং বেদপ্রচার। 1890 এর গোড়ায় লালা মুন্সি রাম (যিনি পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিসাবে পরিচিত হন), লালা দেবরাজ এবং অন্যান্য **আর্য সমাজীরা আর্য কন্যা পাঠশালা** প্রতিষ্ঠা করেন জলদ্ধরে। পরে মেয়েদের জন্য। **কন্যা আশ্রম** নামে হস্টেল ও প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের স্কুল ও হস্টেল অনেকেই মেনে নিতে পারে নি। তবে স্কুল ও হস্টেল এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে 1896 এর 14ই জুন **কন্যা মহাবিদ্যালয়** (কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 1906 সালে মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত মেয়েদের সংখ্যা ছিল 203 জন আর কন্যা আশ্রমের আবাসিকদের সংখ্যা দাঁড়ায় 105 জন। পরবর্ত্তীকালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মেয়েদের শিক্ষা আন্দোলনের একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় কারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা অনেকেই এর ছাঁচে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল খুলতে থাকে। এছাড়া স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি হিন্দি মাসিক পত্র **প্রাঞ্চল পন্ডিতা** প্রকাশিত হতে থাকে। শিক্ষা দানের মাধ্যমে তারা এক আদর্শ-হিন্দু রমণীর জন্ম দিতে চেয়েছিলেন।

বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে আর্য সমাজের উদ্যোগ

কট্টরপন্থীরা মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পাশাপাশি বিধবা বিবাহ বিষয়ে জনমত সংগঠিত করতে থাকে। এক দশকের বেশি সময় আলাপ আলোচনার ফলে পাঞ্জাবী সমাজে বিধবা বিবাহ অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বিধবাদের মধ্যে যারা অক্ষতযোনী অর্থাৎ যারা স্বামী মহবাস করেন নি তাঁদের পুনর্বিবাহ যতটা গ্রহণযোগ্য ছিল, সন্তাবতী বিধবাদের পুনর্বিবাহ ততটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিধবা বিবাহ বিষয়ে হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ থেকেই সমর্থন মিললেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মূলত কট্টরপন্থী আর্য সমাজীরাই।

৭.৩.২.৪ : থিওসফিক্যাল আন্দোলন (Theosophical Movement)

থিওজফী আন্দোলনের প্রেরণা ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার 'আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক মনোভাব থেকে এই আন্দোলনের সূচনা। 1875 সালে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে উৎসুক দুই ব্যক্তি Helena Petrovna Blavatsky এবং Henry Steel Olcott একত্রে এই আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। মাদাম ব্লাভাটস্কির জন্ম ইউগ্রেনে। তিনি মিশর থেকে আমেরিকায় গেলে অতীন্দ্রিয়বাদীদের এক সম্মেলনে অধুনা সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত হেনরী ওলকট এর সাথে পরিচয় ঘটে এবং তাঁরা একত্রে কাজ করতে থাকেন। 1877 এ প্রকাশিত হয় ব্লাভাটস্কির গ্রন্থ Isis Unveiled। এর প্রথম খন্ডে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং পরাবাস্তব অবস্থার বিভিন্ন দিক এবং দ্বিতীয় খন্ডে সামগ্রিকভাবে খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনা ও হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটি অধ্যত্মবাদীদের প্রশংসা অর্জন করলেও

এ তিনি কলকাতায় আসেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। কলকাতা থেকে ফেরার পর তিনি সন্ন্যাসীর কৌপীন পরিত্যাগ করেন এবং সাধারণ হিন্দি ভাষায় প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে মধ্যবিত্ত বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে তাঁর প্রচার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 1875 এ তিনি তাঁর চিন্তা ভাবনার সারসংগ্রহ 'সত্যার্থ প্রকাশ' সম্পন্ন করেন। এতে তিনি ঐতিহাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম বা শিখ ধর্মের নিন্দা করেন। তাঁর কাছে বৈদিক হিন্দুধর্মই ছিল একমাত্র সত্য।

1874 এ দয়ানন্দ গুজরাট ও বোম্বাই সফর করেন। 1875 এর 10ই এপ্রিল বোম্বাইতে আর্য সমাজ (আর্য শব্দের প্রকৃত অর্থ সুভদ্র মানুষ) প্রতিষ্ঠা করেন। 1877 এর জানুয়ারী মাসে তিনি দিল্লি পৌঁছান সেখানকার হিন্দুনেতা বিশেষতঃ তাঁকে লাহোর সফরের জন্য অনুরোধ করেন। দিল্লিতে অবস্থানকালে 1877 এর 10ই এপ্রিল তিনি পৌত্তলিকা, বাল্যবিবাহ, হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়কে তীব্র নিন্দা করেন। সর্বোপরী তিনি বেদের অভ্রান্ততার কথা জোরের সাথে প্রচার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অভিমত ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দুদের পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। এমনকি ব্রাহ্মরা, যাঁরা বেদান্তে আস্থা রেখেছিলেন তাঁদের পক্ষেও তাঁর এই শুদ্ধবাদী প্রচার আদ্যন্ত স্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। এখান থেকে তিনি পাঞ্জাব ও পরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করেন। ওই সময় লাহোর সহ অন্যান্য অঞ্চলে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে তাঁর মত প্রচার করেন। 1881 থেকে তিনি রাজস্থানে সেখানকার রাজপরিবারের লোকেদেরকে তাঁর মতের সপক্ষে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালান যাতে তিনি তেমনি সাফল্য পান নি। শেষ পর্যন্ত 1883 তে 30 অক্টোবর তিনি আজমীরে দেহ রাখেন।

প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে আর্য-সমাজ স্তিমিত হয় নি বরং নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। সাংগঠনিক ভাবে স্থানীয় আর্য-সমাজগুলি ছিল স্ব স্ব প্রধান অর্থাৎ কোন কেন্দ্রীয় উদ্যোগ সেভাবে ছিল না। সমস্ত আর্য সমাজগুলিই বর্দ্ধমান খ্রীষ্টান প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্টা করতে চেয়েছিলেন। সেইমত 1886 সালের 1লা জুন দয়ানন্দ অ্যাংলো-দেদিক স্থল ও পরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dayananda Anglo-Vedic Trust এবং Management Society ই ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক আর্য সমাজগুলির মধ্যে প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠন যেখানে আঞ্চলিক সমাজগুলির প্রতিনিধি থাকতেন। পরে, আর্য প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আর্য সমাজের মধ্যে দুটি বিরোধী মত দেখা দেয়। কট্টরপন্থীদের নেতা ছিলেন পন্ডিত গুরু দত্ত। এছাড়াও ছিলেন পন্ডিত লেখ রাম এবং লালা মুন্সী রাম। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রাচীন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বৈদিক স্কুল তৈরী করতে যেখানে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হবে। অন্যদিকে নরমপন্থীরা চেয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্মের ছোঁয়াচ এড়িয়ে ইংরাজী শিক্ষা দিতে যা হিন্দুদেরকে ঔপনিবেশিক সামনের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারবে।

1860 এর দশকে ব্রাহ্ম মতাদর্শের কথা দক্ষিনেও অজানা ছিল না। কুড্ডালোরের এক ব্রাহ্মণ শ্রীধরালু নাইডু ব্রাহ্ম সমাজের কথা জানতে পেরে সম্পত্তি বেচে দিয়ে কলকাতা পাড়ি দেন। সেখানে একবছর থেকে বাংলা শিখে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং দক্ষিনে ফিরে গিয়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রসারে ব্রতী হন। কিন্তু তাঁর খুব একটা প্রভাব পড়ে নি। পরে যখন কেশবচন্দ্র সেন 1864 তে দক্ষিনে সফরে যান। তিনি বিপুল সাড়া পান। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাত্মক প্রচার দক্ষিনের মানুষদেরকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। তাই সেন এর প্রচার এর ফল হল বেদ সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু 60 এর শেষে শ্রীধরালু নাইডু মাদ্রাজ গেলে বেদ সমাজের নাম ও চরিত্র বদলে ব্রাহ্ম সমাজের মত গড়ে তোলা হয়। বাংলার মত দক্ষিনেও ব্রাহ্ম সমাজ বা বেদ সমাজ জাতপাত বিরোধী, স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হতে দেখা যায় তবে দক্ষিনে এই আন্দোলন ছিল কিছু উজ্জ্বল ব্যাক্তিত্ব নির্ভর। তাঁরা সরে গেলেই আবার আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বা নেতৃত্ব সতীদাহ, বাল্যবিবাহ অসবর্ণ বিবাহ বা স্ত্রী শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ বা সামাজিক বিবাহ আইনের মত বিষয়েও তাঁরা প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ এবং পরিবর্ত্তনশীল মতাদর্শগত পরিমন্ডলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ক্রমেই ফিকে হয়ে আসে।

৭.৩.২.৩ : আর্য সমাজ

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ স্বরস্বতী (1824-83)। বাল্যে পিতামাতার ঠিক করা পাত্রীর সাথে নিশ্চিত বিবাহ অস্বীকার করে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং সরস্বতী দন্ডীদের কাছে দীক্ষা নিয়ে ভ্রাম্যমান যোশী হিসাবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। শেষে 1860 এর নভেম্বর মাসে স্বামী বিরজানন্দের কাছে প্রায় তিন বছর অবস্থানকালে তাঁর কর্তব্য বিধেয় নির্ধারিত হয়। তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু ধর্মের পরিশুদ্ধিকরণ। এই লক্ষ্যে তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন — বেদে লিখিত মন্ত্রগুলি সঠিক ব্যাকরণ ও উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করলে পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত অযৌক্তিক, অন্যায় আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে তাকে কাটান সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যে তিনি হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেন — বেদ এবং বেদের সঠিক ব্যাখ্যা যে সমস্ত গ্রন্থে রয়েছে তাকে উনি **আর্শ** বলে চিহ্নিত করেন। বাদবাগি সমস্ত সাহিত্য - বিশেষত মহাভারত উত্তর কাহিনীগুলি হল **অনআর্শ** অর্থাৎ যেগুলি পালনীয় নয়। দয়ানন্দ যে পরিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের কথা প্রচার করতে শুরু করেন সেখানে পুরাণ, বহু দেবতার পূজা, পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মণ পূজারীর ভূমিকা, তীর্থযাত্রা, প্রায় সমস্ত রকমের আচার অনুষ্ঠান, বিধবা বিবাহে নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ের নিন্দা করা হয়। তখনো পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর বেশে, সংস্কৃতে কথা বলতেন। 1872

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
A, B শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বর্গী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

সামাজিকে প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা কল্পে একের পর এক মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চলেন। ব্রাহ্মসমাজেও স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ প্রদর্শনকল্পে Community living এর জন্য 'ভারতাশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন আশ্রমস্থ বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে আশ্রমবাসী ও বাইরের ব্রাহ্মদের বাড়ির মেয়েদের শিক্ষাদান করা হত। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সেলাই বা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। 1866 তে কেশবচন্দ্র সেনের আহ্বানে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে কুমারী মারী কার্পেন্টার (Miss Mary Carpenter) ভারতে আসেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাধা হল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষন এবং অভিমত পড়লাটের সামনে উপস্থিত করেন। 1872 এ Carpenter, কেশবচন্দ্র এবং Annette Akroyd নামে আরেকজন ইংরাজ মহিলার সাথে একটি Normal School প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে Akroyd 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র সাথে মিলে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 1878 এ স্কুলটি বেথুন স্কুলের সাথে মিলে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 1883 তে বেথুন কলেজ থেকে কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসু পথম স্নাতক হিসাবে বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন।

অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব

আমরা আগেই দেখেছি যে কেশবচন্দ্র সেন 1864 তে বোম্বাই, মাদ্রাজ সহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার এর কারণে। পরে 1867 তে তিনি আর একবার বোম্বাই গিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর বাগ্মীতার করণে, বহু যুবক তাঁর এবং ব্রাহ্ম মতাদর্শের প্রতি আকর্ষন অনুভব করেন। এমনই কিছু মানুষ মহারাষ্ট্রে তৈরী করেন। 'প্রার্থনা সমাজ' যার মধ্যে ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডের মত ব্যাক্তিত্ব। এঁরা বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ বা স্ত্রী শিক্ষার মত বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এর কাজ চালিয়েছিলেন। পরে এঁদের কারুর কারুর উপর দয়ানন্দ স্বরস্বতীর ও প্রভাব পড়েছিল। তিনি যখন 1875 এ গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সফরে আসেন তখন S. P. Kelkar এর মত ব্যক্তি তাঁর আর্যতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে প্রার্থনা সমাজ থেকে বেরিয়ে আসেন এং কিছুদিনের জন্য বোম্বাই এ ব্রাহ্মসমাজ তৈরী করেছিলেন। পরে এই উদ্যোগ ব্যার্থ হলে 1882 সালে তিনি আবার প্রার্থনা সমাজে ফিরে আসেন কিন্তু মহারাষ্ট্রের এই সমাজ সংস্কারকদের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রাথমিক অভিমত অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

তেই কেশবচন্দ্র বোম্বাই, মাদ্রাজ সহ অন্যান্য জায়গায় পরিভ্রমণ করেন এবং তার ফলে ব্রাহ্ম সমাজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বছরই ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় অধিবেশন গুলিতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আচার্যের প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ দেখা দেয়। 1864 তেই ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের স্ত্রীদের উন্নতিকল্পে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 1866 র মাগোৎসবে উপাসনাস্থলে মহিলারাও পর্দার পেছনে বসবার অনুমতি পান। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলারাও পুরুষদের সাথে উপাসনাস্থলে জায়গা পেলেন। শেষপর্যন্ত আর নবীন প্রবীনের বিভাজন রোখা গেল না। নবীনরা কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে "ভারতবর্ষীয় সমাজ" নামে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তুললেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রক্ষনশীল অংশ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে আলাদা হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেন যে কেবল সমাজ সংস্কারের প্রশ্নেই আলাদা ছিলেন তাই নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট তফাৎ তৈরী হচ্ছিল। যিশু খ্রীষ্টকে 'মহৎ ব্যক্তি হিসাবে মান্যতা প্রদান ছাড়াও ভক্তির প্রাবল্য ছিল এই সময়কার নতুনত্ব। কিছুদিন গান সহযোগে নগর সংকীর্তন ও হয়। তার বক্তব্য ছিল।

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

1871 এ ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করবার আন্দোলন শুরু হয়। আদিসমাজ তার বিরোধীতা করলে 1872 এ Act III নামে একটি Civil Marriage Act চালু হয়। 1856 এ নারী স্বাধীনতা বিষয়ে কিছু কাজকর্ম শুরু হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মদের মধ্যে আবার নতুন করে বিভাজনের সম্ভাবনা তৈরী হয়। 1817 এর গোড়ায় 'সমদর্শী' নামে একটি দল ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্টা করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত যখন ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়মকানুন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কেশবচন্দ্র তাঁর নিজের নাবালিকা মেয়েকে কোচবিহারের রাজপরিবারে পাত্রস্থ করতে উদ্যোগী হলে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিভাজন দেখা দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত যুবকদল "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটি পৃথক দল গঠন করলেন। তার কিছুদিনের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অনুগামীদের কে নিয়ে "নববিধান" নাম আলাদা হয়ে যান। এই উপর্যুপরী বিভাজন ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু লক্ষনীয় হল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভূরা প্রথম থেকেই নারীর সমানাধিকার অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। মূলতঃ এই প্রশ্নেই তাদের মধ্যে বিভাজন ও দেখা দিয়েছিল।

স্ত্রীশিক্ষা

এছাড়াও ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্য গ্রহণ করেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলে বাড়ির মেয়েদেরকে আনবার জন্য ঘোড়ার গাড়ির দরজায় লেখা থাকত 'কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়াতিযত্নতঃ'। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাদানের এই প্রচেষ্টা সাংঘাতিক বাধার সন্মুখীন হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্গ কবিতা রচনা করলেন :

Conference between an Advocate for and an Opponent of the practice of Burniong Widows Alive.' এতে বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র উদ্ধৃত করে তিনি দেখান যে সতীদাহ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে অপ্রয়োজনীয় এবং এই প্রথা পরবর্ত্তীকালের সংযোজন। এই প্রসঙ্গে তিনি উদ্যোগী হয়ে সাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং শেষ পর্যন্ত 1829 সালে সতীদাহ 'বেআইনী' ঘোষিত হয়। উনবিংশ শতকের যে তিনটি ঘটনা কে নারীমুক্তি বিষয়ে মাইল ফলক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (সতীদাহ নিবারণ 1829, বিধবা বিবাহ 1856 এবং স্বেচ্ছায় সহবাস বিষয়ক আইন 1891) তার প্রথমটির সাথে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এইভাবে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। 1819 এই আত্মীয় সভার সাপ্তাহিক অধিবেসনগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর ন'বছর বাদে 20 আগষ্ট 1828 সালে রামমোহন 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত এর অধিবেশন চলত। উপনিষদের বাছাই মন্ত্র প্রথমে সংস্কৃতে ও পরে তার বাংলা অনুবাদ পাঠ করা হত। এর সাথে চলত গান। এই সভার সদস্য হবার জন্য কোন নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ না থাকলেও সমাগত ব্যক্তিরা অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর। 1830 সালের 23 জানুয়ারী এই সভা তার নতুন সভাগৃহে স্থানান্তরিত হয়। ট্রাস্ট ডিড অনুযায়ী সদস্যেরা পৌত্তলিকতা বা বলীদান জাতীয় বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকবেন বলে স্থির হয়ে তবে রামমোহন নিজে 1830 এর নভেম্বর মাসে বিলাত উদ্দেশ্যে রওনা হলে এবং 1833 সালে ইংলন্ডেই তাঁর দেহান্ত হওয়ায় ব্রাহ্মসভা প্রায় উঠেই যায়।

এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে 1838 সালে আবার এই সভার পুনর্জন্ম ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। 1838এ দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মসঙ্কটের মুখোমুখী হন। তিনি 1839 এ 'তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের মতই বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা মেনে নিলেও দেবেন্দ্রনাথ এবং সহযোগীরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। 1842 সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের সাথে 'ব্রাহ্মসভায়' যোগ দেন। পরের বছর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মকানুন (Covenant) নির্ধারণ করেন। ওই বছরই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রকাশিত হতে শুরু করে। 1850 এ ব্রাহ্ম ধর্ম নামে একগুচ্ছ শাস্ত্রের সংকলন প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে এবং একান্তে ধর্মাচরনের নিয়মকানুন নির্ধারণ করে ছিলেন। অবশেষে 1861 সালে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর জন্য পালনীয় বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের ধরণ নিরুপিত হয়। এই কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আবার প্রানবন্ত হয়ে ওঠে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে তার প্রভাব বাড়ে।

1857 তে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্মে দিক্ষা নেন এবং দ্রুত তাঁর প্রভাব বাড়ে 1859 এ প্রতিষ্ঠিত হয় **'সঙ্গত সভা'** তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা সমাজ সংস্কার বিশেষতঃ জাত পাত বা নারীর অধিকার এর প্রশ্নে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সামাজিক সক্রিয়তার কারণে প্রবীন এবং নবীনের মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলে। 1862 তে কেশবচন্দ্র এবং তাঁর সহযোগী গোপনে একটি অসবর্ণ বিবাহ সম্পাদন করেন। 1864 তে একাদারে অসবর্ণ এবং একই সাথে বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। 1864

এই বিচার এর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মতামত ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে দুটি প্রধান অভিমত বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ কারোর কারোর মতে ভারতীয় নারীর অবস্থা ইউপোপীয় নারীর তুলনায় খুব খারাপ ছিল না। অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করতেন যে সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা দয়ানন্দ সরস্বতীর মত সমাজ সংস্কারকরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে প্রাচীনকালে মহিলা উচ্চ সম্মানের অংশীদার ছিলেন, তাঁরা শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় গরীয়ান ছিলেন। বিশেষতঃ বেদের আমলে। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রর রচনার কালে এই মর্যাদা অবলুপ্ত হয়। একদিকে এই বক্তব্য মিল এর অভিমতকে কিছুটা হলেও নস্যাৎ করল — কারণ সব সময় মহিলাদের খারাপ অবস্থা ছিল তা নয়, অন্যদিকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকেও মেনে নেওয়া হয় যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল কোন লুপ্ত 'স্বর্ণযুগের পুনরুদ্ধারকরণ। সব মিলিয়ে ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উত্থানের ক্ষেত্রেও নারীর অবস্থা নিয়ে চর্চা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তবে এই ক্ষেত্রে কোনো কোনো আধুনিক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন যে জাতীয়তাবাদ 'ঘর' এবং 'বাহিরে'র মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদ ও 'ঘর' মানে অন্তরমহল (যেটা মহিলামহল বা জেনানা হিসাবেই সাধারণভাবে চিহ্নিত) এর পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে সোচ্চার ছিল অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের প্রকল্প (Nationalist project) ভারতীয় নারীকে ঘরের আঙিনায় ঐর্শী মর্যাদায় ভূষিত করে লিঙ্গ সম্পর্কের বৈষম্যকে চোখের আড়াল করতে চেয়েছে। তাই লিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে দ্বিধা বা দোলাচল দেখা যায়।

এই সাধারণ পেক্ষাপটে ঊনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন ও নারীর অবস্থা/পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবার সহমরণ — 'সতী', কুশীল প্রথা বা বহুবিবাহ, বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং স্ত্রী শিক্ষার মত বিষয়গুলি সমাজসংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এই পরিস্থিতির প্রতিকারকল্পে তাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

৭.৩.২.২ : ব্রাহ্মসমাজ

পৌত্তলিকতার বিরোধীতা এবং একেশ্বরবাদের সাধনা ছাড়াও 'সতীদাহ' এবং অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করে রামমোহন রায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। 1803 সালে তিনি ধর্ম বিষয়ে তাঁর অভিমত একটি ফার্সী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি হল '**তোহফাৎ উল মুযাহিদিন**'। 1814 থেকে তিনি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করলে 1815 সালে প্রতিষ্টা করেন 'আত্মীয় সভা'। এই সভার সদস্যরা রামমোহনের বাড়িতে সাপ্তাহিক অধিবেসনে মিলিত হতেন যেখানে স্তোত্রপাঠ ছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। সতীদাহ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা থেকেই রামমোহন এই প্রথার অবলুপ্তিতে উদ্যোগী হন। 1818 সালে এই মর্মে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন — 'A

৭.৩.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নারীর ভূমিকা।

(২) অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব।

(৩) আর্য সমাজে ও থিওসফিক্যাল আন্দোলন-এ নারীর ভূমিকা।

৭.৩.২.১ : ভূমিকা

উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং তারফলে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাঁর কারণে নারী বা সমাজে নারীর অবস্থান একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। জেমস মিল ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ এবং তার লেখা History of British India (প্রথম প্রকাশ 1826) ছিল শিক্ষানবিস ICS দের অন্যতম প্রধান পাঠ্যগ্রন্থ। এতে তিনি এই মত ব্যাক্ত করেন যে সমাজে নারীর স্থান হল একটি সমাজ বা সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি। তিনি একটি সরল সুত্রও তৈরী করেন — বর্বর জাতির মধ্যে সাধারণতঃ মহিলাদের অবস্থান নিচু, অন্যদিকে উন্নত বা সভ্য মানুষের মধ্যে মহিলারা যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁর মতে সমাজ যত উন্নত হবে মহিলাদের অবস্থানও উন্নত হবে, যতদিন পর্যন্ত না তারা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে তাদের সেচ্ছামূলক অংশিদার হয়ে ওঠে। মিল কোনোদিন ভারতে পদার্পন করেন নি। ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দু আইন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তৈরী হয় Halhed কৃত 'মনুস্মৃতি'র অনুবাদ Code of Gentoo law এবং কিছু করতে আসা বিদেশী পর্যটকদের লেখা পড়ে। সেই অনুযায়ী ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর, সিদ্ধান্ত ছিল যে মহিলা জাতির প্রতি হিন্দুদের অবজ্ঞার মনোভাব তাদের মজ্জাগত। মিলের এই বক্তব্যের সাথে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অভিমতের সাজুজ্য রয়েছে। এই অভিমতগুলি থেকে এই ধারণা দানা বাঁধে যে ভারতীয়দের সামরিক দুর্বলতার কারণ ছিল নারীর প্রতি তাঁদের অবজ্ঞার মনোভাব। পরবর্ত্তীকালে সামাজিক ডারউইনবাদ বা প্রত্যক্ষবাদী মতাদর্শের (Positivist ideology) র প্রভাবে দেখানো শুরু হয় যে সামাজিক অবস্থা বিশেষতঃ নারীর অবস্থা বৈগুন্যে ভারত পশ্চিম ইউরোপ বা মধ্য এশিয়ার দেশগুলির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। যদিও এই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের উপায় নেই বললেই চলে। তথাপি সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অবস্থায় তারতম্য এলে কিছুটা হলেও পরিবর্ত্তন আসতে পারে। এইভাবে নারীর অবস্থা বিশেষতঃ সংস্কার উনিশ শতকের সরকারী ভাষ্যে প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠল।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

REFORM MOVEMENTS AND WOMEN

একক - ২

(a) Brahma Samaj (b) Arya Samaj (c) Theosophical Movement

বিন্যাসক্রম ঃ

৭.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

৭.৩.২.১ ঃ ভূমিকা

৭.৩.২.২ ঃ ব্রাহ্মসমাজ

৭.৩.২.৩ ঃ আর্য সমাজ

৭.৩.২.৪ ঃ থিওসফিক্যাল আন্দোলন (Theosophical Movement)

৭.৩.২.৫ ঃ উপসংহার

৭.৩.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৩.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

of Identity' in *Faces of the Feminine in Ancient, Medieval and Modern India,* (ed.) Mandakranta Bose, Oxford, 2000. pp 162-182.

৩। Eleanor Zelliot, Women Saints in Medieval Maharashtra', ibid pp 192 - 200.

৪। A.K. Ramanujan, *Speaking of Siva*.

৭.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভক্তি ধর্মে সাধিকাদের সঙ্গে আজন্মলালিত লিঙ্গ সম্পর্কের (gender relation) দ্বান্দিকতার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

২। বীরশৈব ধর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ। এই ধর্মের সাথে ভক্তি ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?

———

মহাদেবী আক্কা

মহাদেবী আক্কা (বড়দিদি) ছিলেন বাসভান্না বা আল্লমার সমসাময়িক, শিবমোগ্গার অন্তর্গত উড়ুতাড়ি গ্রামে তাঁর জন্ম। উড়ুতড়িতে শিব মল্লিকার্জুনের রূপে পূজিত হতেন এবং মহাদেবী ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত। এলাকার রাজা কৌশিক এর সাথে তাঁর বিবাহ হলেও মনে মনে তাঁর অনুরূপ ছিল শুধু শিবের প্রতি তাই তিনি সংসার ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে কল্যানে এসে পৌঁছন। এর মধ্যেই তিনি বস্ত্রাভরণ ত্যাগ করেছিলেন। এখানে তাঁকে বিশিষ্ট বীরশৈব সাধক অল্লামার প্রশ্নবানের সম্মুখীন হতে হয় — যেমন অল্লামা তাঁর উলঙ্গবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বস্ত্রাবরণ ত্যাগ করলেই কি মায়ার বন্ধন কাটান যায় ? তবে তুমি কেশাবরণে নিজেকে সাজিয়েছ কেন ? মহাদেবীর উত্তর ছিল নিজের কাছে সৎ : তিনি বলেন —

'ফল না পাকলে কি
খোসা ছাড়ান যায় ?'

অল্লামা তাঁকে দিক্ষিত করেন কিন্তু তাতে তাঁর কষ্ট তো মিটল না। ঈশ্বর মিলনে আকুল, সমাজে নারীর যে শিকল তার নিষ্মেষনে কাতর মহাদেবী তাই আবার বেরিয়ে পড়েন এবং কথিত আছে তিনি চেন্নামল্লিকার্জুনে 'বিলীন' হয়ে যান। যে সমাজ কেমন করে নারীকে বাঁধে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাদেবীর এই 'বচন'

'আমার শ্বাশুড়ি হল মায়া
জগৎ হল শ্বশুর
তিন দেওর ভামুর যেন বাঘ
স্বামীর মনে অন্য নারীর চিন্তা
ননদের চোখ এড়িয়ে কেমন
করে তাঁর সাথে মিলন হবে' ?

এখানে প্রেমিকের সাথে পরকীয়া মিলনে উৎসুক এক অভিমারিকার রূপকের মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির কথাই ফুটে উঠেছে : মায়া হল মোহাঞ্জন, তিন দেওর ভাসুর হল তিন **গুণ** - সত্ত্ব রজ ও তম। স্বামী হল কর্ম আর ননদ হল **বাসনা**। এদের পার হয়েই অভিমারিকাকে ঈশ্বর মিলনে যেতে হয়।

৭.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Vijaya Ramaswamy, *Walking Naked; Women, Society, Sprituality in South India. IIAS,* simla, 1997.

২। Nancy Martin-Kershaw, Mirabai in the Academy and the Politics

নিরাকার, নিরাবয়ব ঈশ্বর এর ভজনা। যদিও শিব বা বিষ্ণুর নাম থাকে কিন্তু যে পৌরাণিক শিবের কান্ডকারখানার সাথে আমাদের পরিচয় ইনি তার থেকে আলাদা। অন্যদিকে স্বগুণ ভক্তি হল নির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট দেবমুর্ত্তির প্রতি প্রেম — যেমন রাম বা কৃষ্ণ। বীরশৈব ধর্ম নির্গুন ভক্তির প্রকাশ যেমন উত্তর ভারতে আমরা কবীর এর রচনায় দেখতে পাই।

বীরশৈব ধর্মের সাথে দক্ষিণে উৎপন্ন ভক্তির অনেকাংশে মিল দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই জৈনদের কর্মবাদী মতাদর্শকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। কর্মবাদী মত অনুযায়ী জীবস্বত্তা কর্মফলের চক্রে, বন্দী। সে তার কর্মের মধ্য দিয়েই জন্ম-মৃত্যুর চক্রাবর্ত্তন থেকে মুক্তি পেতে পারে। এক অর্থে এটা নিরিশ্বরবাদী দর্শন — কারণ জীবের নিজস্ব কর্মফলেই তার থেকে মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত। কিন্তু ভক্তিবাদীরা মনে করেন কর্মবাদ মিথ্যা। সৎ কর্মপ্রচেষ্টাতেই মুক্তি আসবে না যদি না ঈশ্বর এর **কৃপা** না থাকে আর ঈশ্বর কার উপর কৃপা করবেন তার সিদ্ধান্ত কর্মের দ্বারা নয় **লীলা** বা খামখেয়াল দ্বারা নির্ধারিত হয়।

একদিকে যেমন মনে হতে পারে যে এই মতাদর্শ অন্ধ নিয়তিবাদের জন্ম দেবে তেমনি কর্মফল তো কেবল বৈষয়িক কাজে সীমিত নয় — আধ্যাত্মিক জীবনেও দেবপূজা, তীর্থযাত্রা, ভজন পূজনের পেছনে বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে — দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বা ঘুষ দিয়ে শেষ পারানীর কড়ি সংগহ করা। এও এক ধরণের 'দুর্নীতি'। ভক্তিবাদী বিশেষতঃ বীরশৈবরা মনে করেন ঈশ্বর ভক্তি কারণ 'মুক্তি' বা বৈষয়িক উন্নতি নয়, ঈশ্বরকে জানা বা তাতে লীন হওয়াই ভক্তিবাদীর লক্ষ্য। তাঁরা '**অনুভব**' ও 'অনুভাব' এর মধ্যে সুস্পষ্ট তফাৎ করেন। প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতা জীবের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সম্ভব কিন্তু **অনুভাব** — ঈশ্বরোপলব্ধী একমাত্র ঈশ্বর এর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।

যদি তাই হয় তাহলে ভজন পূজন, মন্দিরে মন্দিরে দেবারতি। তীর্থযাত্রা, জাত-পাতের ভেদ সবই মিথ্যে হয়ে যায়। এখানেই হল ভক্তি তথা বীরশৈব ধর্মের বৈপ্লবিক উপাদান।

বীরশৈব ধর্মের সাথে বাসভান্নার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনি 1106 অব্দে মর্ণিগাভল্লী নামে একটি জায়গায় (কর্ণাটকে) জন্মগ্রহণ করেন এবং 1167 বা 1168 তে দেহান্ত হয়। তিনি কল্যানী চালুক্য রাজ বিজ্জলের 'ভান্ডারী' (বিত্তআধিকারিক) ছিলেন। তবে তাঁর আরাধ্য ছিলেন কুড়াল সঙ্গম দেব (কুড়াল — কন্নড়ভাষায় দুটি নদীর সঙ্গমমুল বোঝায়) এবং তাঁর নেতৃত্ব বীরশৈবধর্ম খুবই জোরাল হয়ে ওঠে। বীরশৈবরা সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছিলেন (যদিও তাঁরা নিজস্ব পাল্টা অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন)। তাঁদের কাছে প্রধান আরাধ্য 'গুরু', 'লিঙ্গ' এবং 'জঙ্গম'। গুরু-ঈশ্বর, বীরশৈবরা শরীরে একটি লিঙ্গ ধারন করতেন আর 'জঙ্গম' হলেন ভ্রাম্যমান ধর্মীয় যোগী। কল্যানে একবার এক প্রাক্তন অন্ত্যজ ছেলে (বীরশৈব ধর্ম গ্রহণ করলে আর জাতি বৈষম্য থাকতো না) এবং এক ব্রাহ্মণের মেয়ের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়। উভয়েই বীরশৈব সমাজের সদস্য। কল্যানের ঐতিহ্যপন্থীরা এই 'অনাচার' সহ্য করতে না পেরে বর বধুর মা বাবাকে নৃশংসভাবে প্রাণদন্ড দেন। এর প্রতিবাদে বীরশৈবদের মধ্যে উগ্রপন্থীরা বিজ্জলকে হত্যা করেন যদিও বামভন্না তা চান নি। এর পর তিনি কল্যান ছেড়ে কাপ্পাডিসঙ্গমে চল যান এবং সেখানেই প্রাণত্যার্গ করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস সহ্য করতে না পেরে বীরশৈবরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন।

এমন আরেকজন হলেন অন্ত্যজ সাধক চোকামেলার স্ত্রী সয়রাবাঈ। তাঁরও অনেক রচনা রয়েছে। আর রয়েছেন সপ্তদশ শতকের রচয়িত্রী বহিনাবাঈ। তাঁর অনেক রচনায় (মহারাষ্ট্রে এমন ভক্তিগীতিকে বলে অভঙ্গ) এক দুঃসহ জীবনের ছবি রয়েছে।

বেদ চিৎকার করে পুরাণ হাঁকে
মেয়ে মানুষ ভাল কিছু করে না।
আমার নারীর দেহে জনম হল —
কি করে আমি মুক্তি পাব ?
মেয়েরা বোকা, দেয় ধোঁকা
তাদের সংস্পর্শে ক্ষতি
বহিনা বলে মেয়েরা এত খারাপ হলে
তার মুক্তি হবে কেমনে ?

পূর্বজন্মের কোন পাপে আমার এই দশা ? .....

বহিনাবাঈ এর জন্ম উচ্চ বর্ণে, তাই কি তিনি আরো বেশি নির্যাতিতা — আমরা জানিনা, তবে গার্হস্থ ধর্ম পালন করলেও দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যেও তুকারামের আশ্রয়ে তিনি 'মুক্তি' পান।

বাংলাতেও চৈতন্য পরবর্ত্তী যে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটে বিশেষতঃ নিত্যানন্দের নেতৃত্বে সেখানে কোন কোন নারী সাধিকা গুরুর মর্যাদা পেয়েছেন যেমন জাহ্নবা দেবী।

এই আলোচনায় দেখা গেল যে ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে ছাঁচ সমাজ তৈরী করেছিল অনেক সময় মেয়েরা সেই ছাঁচ ভেঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। লাল্লা বা মীরা বা মহাদেবী আক্কা ছিলেন বিদ্রোহী কখনো আবার প্রেয়সী বধুর বেশে ঈশ্বর সাধনা মেয়েদের আজন্মলালিত সংস্কারকে ব্যবহার করলেও আদলটার উল্লেকযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটানো হয়েছে — আগে ছিল নারী নরকের দ্বার। তার শরীর 'প্রকৃতি' জন্ম, মৃত্যুর প্রাত্যহিকতায় বন্দী। এখন সেই শরীরও দেহ এবং দেহাতীত প্রেমে 'পুরুষের' কামনায় উন্মুখ। কখনো আবার নারী হয়ে উঠেছেন দেহাতীত প্রেমে উন্মুখ কেমন করাইক্কাল অম্মাইয়র। প্রেয়সীর পরকিয়া প্রেম বা প্রেতরূপ ছাড়াও গার্হস্থ ধর্মে স্থিত সাধারণ মহিলারাও গৃহধর্মের আগল ভেঙ্গে ফেলেছেন যেমন বহিনাবাঈ। শেষে বলাই যায় যে ভক্তিধর্মের মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্কের (gender relations) আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকলেও তা বাস্তবে সব সময় রূপান্তরিত হয় নি।

৭.৩.১.৩ : বীরশৈব ধর্মে নারী

বীরশৈব ধর্ম ভক্তি আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ। ভক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ বা ধরণ আছে — প্রধানতঃ একে **নির্গুন** ও **স্বগুন** ভক্তি এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নির্গুন ভক্তি হল

হয় এবং মেবার ছেড়ে তিনি প্রথমে বৃন্দাবন ও পরে বেনারসে এসেছিলেন। শেষে তিনি দ্বারকায় কৃষ্ণমূর্ত্তিতে বিলীন হন। ইদানিংকালে কিছু নৃতাত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মীরার ঐতিহ্যের ব্যাপারে রাজস্থানে বিপরীত ধর্মী মানসিকতা কাজ করেছে। লোকসাহিত্যে মীরার ভজন ও তাঁর একরকম 'বক্তব্য' রক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে রাজপরিবারের মধ্যে বেশরম, পায়ে ঘুঙরু বেঁধে নাচা মীরা সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রী বিদ্বেষই কাজ করেছে।

মহারাষ্ট্রে একাধিক সাধিকা দেখা যায়, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গৃহবধু। এমনই একজন মক্তাবাই। তাঁর রচনায় সাংকেতিক ভাষায় ঈশ্বর উপলব্ধীর কথা পাওয়া যায় :

চাঁদ গিলে খেল সূর্যকে
বাঁজা মেয়ের পেটে
হল ছেলে
কাঁকড়াবিছে গেল মাটির তলায়
শেষনাগ হাজার মাথায় কুর্ণীশ করে
পোয়াতি মাছির
পেটে জন্ম হল বাজ পাখির
এসব কান্ডকারখানা দেখে
আর মুক্তা হাসে।

আরেকজন সাধিকা হলেন জনাবাঈ। অনাথ এই মহিলা সন্ত তুকারামের বাড়িতে কাজ করতেন। তাঁর একটি রচনা

'আমি ঈশ্বর যাই
আমি ঈশ্বর পান করি
আমি তাঁর উপর শুই
আমি ঈশ্বর কিনি
আমি ঈশ্বর গুনি
ঈশ্বর এখানে
শুন্যতা ও ঈশ্বর ময়।
ঈশ্বর হৃদমাঝারে
বাইরেও তিনি বিরাজমান
আবার সব দিয়ে থুয়েও
কিছুটা ভাগ বাকি থেকে যায়'

কাশ্মীরে তেমনি ছিলেন সাধিকা লাল্লা। তিনি উলঙ্গিনী হয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন যাকে 'বাক' বলা হয়। তিনি গেয়েছেন :

'লাল্লা, যা বহির্ভূত তার সম্পর্কে কেন চিন্তা কর
মনকে নিজেতে বিবেশ কর
এইভাবে মন দ্বিধাশূণ্য হবে
বাতাস আর আকাশ এর চেয়ে সুন্দর আভরণ আর কি ?
বস্ত্রাবরণ, তা কি তত আরামের ?'

লাল্লার শ্বশুর তাঁকে পরপুরুষের সামনে তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গেলে লাল্লা বলেছিলেন 'আমি ত কই পুরুষ দেখছি না। সবই ত ভেড়া।'

বীরশৈব ধর্মের একজন বড় সাধিকা মহাদেবী আক্কাও একই ভাবে উলঙ্গিনী হয়ে ঘরে বেড়াতেন। তিনি বলেছেন

'নিলজ্জ মেয়েটা মল্লিকার্জুনের আলো মেখে গায়।

রে মুর্খ ওর বস্ত্র আভরণের প্রয়োজনটা কোথায়।'

মধ্যযুগে উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান ভক্তি সাধিকা হলেন মীরাবাঈ যার ভক্তিগীতি আজো আমাদের উদ্বেলিত করে। আজ মীরার কাহিনী সিনেমায়, উপন্যাসে এমন কি অমরচিত্র কথার মত শিশুদের পাঠ্য কমিকস্ট্রি গুলিতে সহজলভ্য হলেও সমসাময়িক সূত্রে মীরাবাঈ প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতি এতটাই যে কোনো কোনো গবেষক মীরাবাঈ এর ঐতিহাসিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। মোটামুটি ভাবে যে ছবিটা উঠে আসে তা হল মীরা ছিলেন মেরতার (বর্তমানে মারোয়াড়) বাসিন্দা এবং ছোট বেলা থেকেই কৃষ্ণ ভক্ত। মেবার এর রাণা (কেউ কেউ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিং বললেও সম্ভবতঃ রানা সঙ্গের ছেলে ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় 1516 খ্রীঃ সূত্রঃ সপ্তদশ শতকে যোধপুরের রাণা যশবন্ত সিংহের কর্মচারী মুহনোৎ **নয়নসীর নয়নসী রি খয়াৎ**) - র মানে তাঁর আপত্তি স্বত্ত্বেও বিয়ে হলে তিনি সাথে করে নন্দলাল এর মুর্ত্তি নিয়ে আসেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের সন্ন্যাসীদের সাথে সাধুসঙ্গ ও চালিয়ে যেতে থাকেন। পরপুরুষের সাথে তাঁর এই মেলামেশা শ্বশুরবাড়ীর পছন্দসই ছিল না বলাই বাহুল্য। ননদ এসে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যার্থ হন। রেগো রাণা তাঁকে বিষ দিলে দৈব অনুগ্রহে তা পবিত্র বারীতে রূপান্তরিত হয়। বন্ধ ঘরে কার সঙ্গে মীরা কথা বলেন সেটা জানতে চর লাগান হয়, ঘরে নন্দলালের মুর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই না পাওয়ায় বিভ্রান্তি চরমে ওঠে। সুযোগ সন্ধানী কেউ কেউ তাঁর ভাবোন্মত্ততার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। একবার সাধুবেশী এক কপটাচারী এসে ওঁকে বলেন যে কৃষ্ণ তাঁর সাথে শারিরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে আদেশ দিয়েছেন। মীরা বলেন ঈশ্বরের আদেশ যখন তখন সেটা সর্বসমক্ষে পালনীয় — এতে সেই কপটাচারী পিছু হটে, এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমনও কথিত আছে যে সম্রাট আকবর এবং গায়ক তানসেন তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। বাইরের লোকের সঙ্গে বিশেষতঃ বিধর্মীর সাথে তাঁর এই মেলামেশার কারণে তাঁর শ্বশুরকুলে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া তৈরী

'শঙ্খ তোমার কত সৌভাগ্য
যে কৃষ্ণের অধর অমৃত তোমার স্পর্শ করে
অন্ডাল এর প্রশ্ন হল তার/তাদের স্বাদ কেমন
তাতে কি কস্তুরীর সৌরভ নাকি
পদ্মের গন্ধের মতই মিষ্ট ঘ্রাণ ?
ওই সমুদ্রনীল সুন্দর ঠোঁটের স্বাদই বা কেমন?
যে মাধব হাতির দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন
সেই মাধবের অধর সৌন্দর্য জানতে
আমি পাগল হয়েছি।'

না তি স্তোত্র নং : 5

'তিনি তো কই আমার খোঁজ নেন না।
আমার যে দীর্ণ ভগ্ন অবস্থা তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না'
আমি তবে আমার স্তন দুটি ছিড়ে ফেলব
ছুড়ে দেব ওই প্রতারকের বুকে
কারণ তারা ত সেই গোবর্ধনের
সঙ্গ সুখ বঞ্চিত।'

করাইক্কাল অম্মাইয়ার অন্যদিকে তপস্যায় নিজেকে কঙ্কাল সদৃশ করে তোলেন যাতে তাঁকে দেখে কেউ কোন ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ অনুভব না করেন। তিনি নিজেকে 'পেয়' (pay) বা প্রেত রূপে রূপান্তরিত করেন। তাঁর এই রূপান্তরে তাঁর স্বামী তাঁকে প্রণাম করেছিলেন।

অম্মাইয়র এর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা নিম্নরূপ :

'তাঁর স্তন শুকিয়ে গেছে
শিরাগুলো ফুটে বেরিয়েছে
দাঁতের জায়গাগুলো খালি
চুলে জটা, কোটরগ্রস্ত পেট
শ্বদন্ড্র গোড়ালীর হাড় বেরিয়ে আছে
নির্জন শ্বশ্মানে সেই প্রেত নারী কেঁদেই চলেছে
যেখানে
আগুনের মধ্যে জটাজুট শিব
নৃত্যরত
যার বাস আলাঙ্গাতুতে।।'

এঁদের রচনায় জাতি নির্বিশেষে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের পূর্ণ মিলনের আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে। রামানুজ এর শ্রীবৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব ভক্তি তামিল ভাষী এলাকা ছাড়িয়ে অন্ধ্র কর্ণাটক অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে দ্বাদশ শতকে কর্ণাটক-মহারাষ্ট্রে কল্যান অঞ্চলে বীরশৈব ধর্ম শুরু হবার পর কর্ণাটক-অন্ধ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। রামানুজের অনুকারীদের মাধ্যমেই এই আন্দোলন উত্তরভারতেও প্রসারিত হয়েছিল।

দক্ষিনে যে শৈবভক্তির সুত্রপাত তার 63টি জন 'তোন্ডার' বা ভক্তদের জীবনা পাওয়া যায় 'পেরিয়পুরাণম' গ্রন্থে। এর মধ্যে কেবল তিনজন ছিলেন নারী। এরা হলেন করাইককাল অমমাইযার, মঙ্গাইয়ার ককারাসিয়র এবং ইসাইনাবিয়র যিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিবভক্ত সুন্দরমুর্ত্তি নায়নার এর মা। অন্যদিকে 63টি জন বিষ্ণু ভক্তের মধ্যে কেবল অন্ডালই নারী। ইনি 'চুডিকোডুত্তা নাচ্চিয়র' নামে পরিচিত। এই নামের পেছনে গল্প আছে। অন্ডাল এর পিতা বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুসিত্তর ছিলেন শ্রীরঙ্গম মন্দিরের কর্মী। ইনি প্রতিদিন ফুল গেঁথে মালা তৈরী করে সকালে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে অধিশ্বর শ্রী রঙ্গ নাথকে সকালে স্নান করানোর পর পড়াতেন। বালিকা অন্ডাল হলেন বিষ্ণুসিত্তর এর আদরের মেয়ে। ইনি বাবা মারা গেঁথে স্নানে গেলে তার অজান্তে ওই মালা নিজের গলায় পড়ে দেখতেন মালা ঠিক হয়েছে কিনা। একদিন তাঁর এই কাজ ধরা পড়ে গেল। তাঁর স্পর্শে 'কলুষিত' মালা ফেলে দিয়ে সেদিন বিষ্ণুসিত্তর নতুন করে কলুষ মুক্ত মালা গেঁথে শ্রীরঙ্গনাথকে পড়ালেন। কিন্তু রঙ্গনাথ সেদিন সেই পরিচিত সুগন্ধ না পেয়ে সারাদিন অস্বস্তিতে কাটালেন। সেই থেকে অন্ডাল এর নাম হল 'চুডিকডুত্তা নাচ্চিয়র — যে কন্যা দেবমাল্য প্রথম নিজে পড়ে দেবতাকে পরান। মালাবদলের মধ্যে ঈশ্বর বা শ্রীরঙ্গ নাথ এর সাথে অন্ডাল এর দৈববিবাহও ঘটে গেল। ঈশ্বর - ভক্তের এই 'মধুর' লীলা অন্ডালকে বিখ্যাত করেছিল। পরে কথিত আছে যে তিনি রঙ্গনাথের দেবমুর্ত্তিতে বিলীন হয়ে যান যেভাবে প্রায় আটশো বছর বাদে মীরাও দেবমুর্ত্তিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অন্ডাল এর দুটি রচনা পাওয়া যায়। একটি হল 'তিরুপ্পাডাই' (30টি স্তোত্র) এবং 'নাচ্চিয়র তিরুমোলী' (143টি স্তোত্র)। 'তিরুপ্পাডাই'তে সঙ্গম সাহিত্যে বর্ণিত একটি প্রাচীন ব্রত-র **নোনবু** উল্লেখ রয়েছে। ভাল স্বামী পেতে অবিবাহিত মেয়েরা এই **প্পাভাই নোনবু** বা ব্রত রাখতো। এই রচনায় অন্ডাল মায়োন বা কৃষ্ণের স্ত্রী নাপ্পিনাইকে অনুরোধ করছেন তিনি যেন মায়োন কে তাঁর বাহুপাশ থেকে মুক্তি দেন যাতে অন্ডাল তাঁর ব্রত সম্পূর্ণ করতে পারেন। তবে এই মিলনের পরেই আছে বিচ্ছেদ আর 'নাচ্চিয়র তিরুমোলী'র অধিকাংশ জুড়েই আছে 'বিরহের' হাহাকার। সহগম সাহিত্যে 'কাইক্কিলাই' হল একতরফা প্রেম এর অবস্থা (অবশ্যই মানবিক প্রেম)। এখানে এই সাহিত্যিক রূপটিকে ব্যবহার করে অন্ডাল মায়োন এর প্রতি তাঁর একতরফা, প্রতিদান হীন তীব্র ভালবাসাকে চিত্রিত করেছেন।

নাচ্চিয়র তিরুমোল্লীর ছত্রে ছত্রে আমরা সেই তীব্র হাহাকার শুনতে পাই :

'তিনি হলেন বেদের সারাৎসার তবু তিনি আমার শরীরের সব মানেটুকু শুষে নিয়েছেন'।

না তি স্তোত্র নং : 6

মরমিয়া আকুতি দেখা যায়। কেবল নারীরা নয় পুরষ সাধকরাও নিজেদেরকে নারী হিসাবে কল্পনা করেছেন। কবীর বা দক্ষিনের মনিক্কভাসাগার নারীকে ছলনাময়ী, প্রলুব্ধকরিনী হিসাবে চিত্রিত করলেও পরমেশ্বরের সাথে মিলনাকাঙ্খায় নিজেদেরকে কখনো নারী হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। ফলে যে নারী 'প্রকৃতি' জন্মদাত্রী হিসাবে জগৎ সৃষ্টির আধার হবার কারণে 'পরমাত্মা' বা 'পরম পুরুষের স্বত্তা উপলব্ধীর তুরীয় আনন্দ (transcindental joy) অপারগ সেই নারীই শারিরিক কারণেই 'পুরুষ'কে নিজের শরীরে 'ধারণ' করেছেন বলে ভক্তিবাদীরা মনে করেন। ফলে নারীর 'দুর্বলতাই' হয়ে দাঁড়ায় তাঁর বিশেষ শক্তির উৎস।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে বধুঁয়া হিসাবে আত্মোপলব্ধীই মরমিয়া সাধনার একমাত্র পথ নয়। বধু বেশী সাধনার পাশে অর্ধনারীশ্বর এর ধারণা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অদ্বৈত মরমিয়াবাদ (monotheistic mysticism)। অন্ডাল বা মীরা নিজেদেরকে কৃষ্ণের সঙ্গিনী হিসাবে গোপিনীরূপে 'মধুর' ভাবে প্রেয়কে উপাসনা করলেও করাইক্কাল অম্মাইয়র নিজেকে প্রেয়সী হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি। এই লোলচর্মা, কঙ্কালসদৃশা 'সাধিকা' শ্মশান বাসীনী যেখানে তিনি (ভুত প্রেতের সাথে) শিবের তান্ডব নৃত্য উপভোগ করেন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে সাধিকারা সাধারণভাবে 'পাগলিনী' 'উন্মাদিনী' (deviant) হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আবার কোথাও তাদের সঙ্গে দেহপোজীবীনীদের এক করে দেখা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীদের ছোটবেলাতেই মন্দিরের দেবতাদের সাথে 'বিবাহ' দেওয়া হত। যেহেতু দেবতা অবিনশ্বর তাই এই দেবদাসীরাও চির এঁয়োস্ত্রী থাকতেন — এদের বলা হত 'নিত্য সুমঙ্গলী', যাদের মঙ্গল চিহ্ন বা শাখা সিঁদুর অক্ষয় হত। অন্যদিকে নগর বধুদের ও নিত্যনতুন গ্রাহক ছিল ফলে তাঁরাও এক অর্থে চির ত্রঁয়োস্ত্রী। বলা যায় ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ সাধিকাদের কে নারীর কোন নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয় বলে তাঁদের কে বা তাঁদের প্রথা বহির্ভূত আচরণকে এইভাবে সমাজ প্রান্তিক করে রেখেছিল।

৭.৩.১.২ : ভক্তি-আন্দোলনে নারী

এবার আসা যাক ভারতের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে 'ভক্তি' আন্দোলনের আলোচনায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'ভক্তি উৎপনানা দ্রাবিড়ে' অর্থাৎ ভক্তি দ্রাবিড় বা দক্ষিন দেশে জন্মায়। ভারতের অন্যত্র যেমন, দক্ষিনেও খ্রীষ্টিয় শতকের গোড়ায় বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের রমরমা ছিল। পাথরের গায়ে বা গুহায় অঙ্কিত তামিল ব্রাহ্মী লেখমালার সাক্ষ্যই হোক বা 'শিলবদিকারম' অথবা 'মনিমেগলঈ' এর মত কাব্যের সাক্ষই হোক উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপে দক্ষিনে যজ্ঞকেন্দ্রিক ব্রহ্মণ্যধর্ম কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটল ষষ্ট-নবম শতকে যখন শৈব-বৈষ্ণব ভক্তি সাধক বা সাধিকারা, যারা যথাক্রমে নায়নার-আলভার নামে পরিচিত, তাদের পাথর গলানো গানে এবং অচিন্তনীয় কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণের মধ্যে আবার শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

হন তাঁদের নির্লজ্জতার জন্য। মীরা ঘোষণা করেন পায়ে ঘুঙরু বেঁধে কৃষ্ণের জন্য নাচতে তিনি লজ্জা বিসর্জন দিয়েছেন যেখানে আজো প্রতি মূহূর্তে ভারতীয় নারীকে শেখানো হয় 'লজ্জাই নারীর ভূষণ'! তাই ভারতীয় সাধিকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'পাগলিনী' 'উন্মাদিনী' যাঁরা সমাজ সংসারের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক অধিকাংশ সময়তেই নিজের সাথে লড়াই করেছেন — জাত বা বর্ণের আগল কাটাতে।

ভারতীয় নারীর অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্বগুলি নিয়ে আলোচনার আগে সাধারণভাবে ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। 'ধর্ম' বলতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস বা আচরণ বোঝায়, যার যোগ সমাজের সাথে এবং বর্হিঅঙ্গের। সেটি সংস্কৃতি — অনুষ্ঠান, অঞ্চল অনুযায়ী পৃথক হয়ে থাকে। সেখানে অধ্যাত্ম সাধনা আত্মমুখী বা অন্তর্মুখী। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্মসাধনার অনেক রকমফের রয়েছে। উচ্চস্তরের সাধক-সাধিকারা অনেক সময়েই ভাবের প্রাবল্যে 'সমাধি' প্রাপ্ত হন (রামকৃষ্ণ পরমহংসের এমন একটি সমাধি গ্রস্ত ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি) আবার ওঝা গুণিনদের অনেকের উপরে 'দেবতা' বা 'অপদেবতা' ভর করেন। এই 'সমাধি' এবং 'ভর' এর মধ্যে তফাৎ খুবই সুক্ষাতিসুক্ষ এবং অধ্যাত্মসাধনায় কাকে 'ভাবসমাধি' বলব (Loss-ecstative possession) আর কাকে 'ভর' (afflictive possession) বলব সেটা অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা দুস্কর। সমাজও এদেরকে নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে থাকে। সাধিকাদের অনেক ক্ষেত্রেই 'ভাবসমাধি' হতে দেখা যায়।

এরপর আসে স্রষ্টার সাথে মিলনের প্রশ্ন। হিন্দু ধর্মে পরম স্বত্তা যদিও সময়, স্থান ও পাত্র নিরপেক্ষ (time, space and gender) 'তাঁকে পরম পুরুষ' হিসাবে অনুধাবন করা হয়েছে। যা মোটের উপর পুরুষ (male) চরিত্র লক্ষণ দ্বারা কল্পিত। অন্যদিকে বস্তু জগৎ কে চিহ্নিত করা হয়েছে 'প্রকৃতি' হিসাবে যার মধ্যে রয়েছে নারীর গুণ। যেহেতু 'নারী' জন্ম দেয় তাই 'নারী' = 'প্রকৃতি' মধ্যে জগৎ সংসার ত্যাগ করে তুরীয় (transcendence) অবস্থা প্রাপ্তি অসম্ভব কারণ তাহলে জগৎ সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ 'প্রকৃতি'র পক্ষে জগৎসৃষ্টির কারণ পরম পুরুষকে উপলব্ধী অসম্ভব। কাজেই অধ্যাত্মবাদও প্রচলিত লিঙ্গ সম্পর্কেরই প্রতিফলন ঘটায় — পিতৃসুত্রী (patriarchal/male epistemological) জ্ঞানতত্ত্ব মেনে চলে। নারী জন্ম দেয় বলে সংসার ছাড়লে জগৎ/সৃষ্টি ধ্বংস হয়। তাই নারীকে মায়ের উচ্চ আসনে বসিয়ে যতই পুজা করা হোক না কেন তা বস্তুতঃ পিতৃসুত্রী সমাজ এরই সাজান চেহারা।

যেহেতু জগৎ সৃষ্টির কারণকে 'পুরুষ' হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে তাই তাকে নিজের করে পেতে, নিজের মধ্যে পেতে ভক্তি সাধক সাধিকারা নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের রূপক দিয়ে নিজেদের মরমিয়াঁ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা/ব্যাখ্যা করেছেন। দেশে কালে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাই বধু বেশে/রূপে মরমিয়াঁ সাধনা করতে দেখা যায় (bridal mysticism) নারী সুফি সাধিকা রাবিয়া বা পুরুষ সুফি সাধক বসরার হাসান এর রচনা ঈশ্বর সাধনার প্রকাশ ঘটে কামজ প্রেম গীতিকায়। খ্রীষ্টান ধর্মেও ম্যাগ্‌ডেবুর্গের মেথিল্ড ঐশ্বরিক 'স্বাথী'র সাথে তাঁর প্রেমজ সাক্ষাৎকারের পর্ণনা দিয়েছেন। সিয়েনার ক্যাথরিন যিশুর দেওয়া বিয়ের আভাটি দেখাদেন। 'ভক্তি' ধর্মেও অন্ডাল মীরা বা মহাদেবী আক্কার রচনায় এই 'বধু বেশী

৭.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলন কি প্রভাব ফেলেছিল?

(২) ভারতীয় নারীর অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্বগুলি কি?

(৩) বীরশৈব ধর্ম বলতে কি বোঝায়?

৭.৩.১.১ : ভূমিকা

ধর্ম বিশেষতঃ প্রতিবাদী ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনগুলি নারীকে কি চোখে দেখেছিল তার বিশ্লেষণ ভারতবর্ষে নারীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ ধর্ম সব দেশে সবকালে সমাজে নারীর আদর্শায়িত অবস্থা (normative situation) নির্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবাদী আন্দোলন ঐতিহ্যগত, অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করে — ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মহিলাদের সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত সাপেক্ষে এমন নিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সামান্য অংশের মধ্যে হলেও এই ধর্ম আন্দোলন নারীর অবস্থানে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল। হিন্দু ধর্মে যে সংস্কার আন্দোলন দেখা যায় — যাকে সাধারণভাবে 'ভক্তি আন্দোলন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী হিন্দু রমণী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। শুধু তাই নয় 'পতি পরম গুরু' অন্য কোন পুরুষ সে যদি দেবতাও হয়, তার চিন্তা পাপ। হিন্দু রমনী দেবতার আরাধনা করে এসেছে স্বামী, পুত্রের নিজের 'মুক্তি' বা অধ্যাত্মসাধনার জন্য নয় কল্যাণ কামনায়। সেখানে 'ভক্তি' মানে 'পরমাত্মায়' 'জীবাত্মা-'র নিমজ্জন — 'তাঁকে' আপন করে পাবার আকুতি। এর ফলে 'ভক্তি' আন্দোলনে বিশেষতঃ নারী এক অদ্ভুত দোলাচলে ভোগে — বিবাহিত স্বামী আগে না জগৎস্বামীর অগ্রাধিকার এই টানাপোড়েন লাল্লা বা মীরাকে ঘর থেকে 'বাইরে' ফেলেছে।

ভারতের ইতিহাসে নারীর অধ্যাত্মসাধনায় তাকে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহিনাবাঈ (ষোড়শ শতকের মহারাষ্ট্রের ভক্তিসাধিকা) বা মীরাবাঈকে গঞ্জনা আর অপমান সহ্য করতে হয়েছে কারণ অধ্যাত্মসাধনা আর লিঙ্গ সম্পর্কের (gender relation) মধ্যে বিরোধভাষ রয়েছে। অন্তরের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে রেখে বুদ্ধ বা চৈতন্য সংসার ছাড়ালে তারা নন্দিত হন, অন্যদিকে লাল্লা বা মহাদেবী আক্কা (লক্ষনীয় যৌনতা গন্ধ এড়াতে 'আক্কা' বা বড় দিদি নাম ধারণ করতে হয়েছে) নিন্দিত

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

REFORM MOVEMENTS AND WOMEN

একক - ১

(a) Bhakti Movements

(b) Vira Saivism

বিন্যাসক্রম ঃ

৭.৩.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৩.১.১ : ভূমিকা

৭.৩.১.২ : ভক্তি আন্দোলনে নারী

৭.৩.১.৩ : বীরশৈব ধর্মে নারী

৭.৩.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৩.১.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

পর্যায় গ্রন্থ - ৮

WOMEN AND CULTURE

একক - ১

Women's representation and participation in :

(i) Art and Sculpture

(ii) Music

(iii) Dance

বিন্যাসক্রম :

৮.১.০ : উদ্দেশ্য

৮.১.১ : সংস্কৃতি ও বিনোদন

৮.১.২ : প্রাচীনযুগে নারী ও বিনোদন

৮.১.৩ : মধ্যযুগে নারী ও বিনোদন

৮.১.৪ : আধুনিককালে নারী ও বিনোদন

৮.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৮.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.১.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নারী সংস্কৃতি ও বিনোদন -- ইতিচহাসের প্রেক্ষিতে।

(২) প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে নারী বিনোদন।

(৩) মূল্যায়ণ।

৮.১.১ : সংস্কৃতি ও বিনোদন

'কালচার' শব্দের মূলে আছে লাতিন শব্দ কুলতুরা, তার আক্ষরিক অর্থ কর্ষণ। সেই অর্থে কেউ কেউ বাংলায় কৃষ্টি শব্দটি প্রয়োগের পক্ষে মত দিলেও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি' কথাটি যাই হোক না কেন, সংজ্ঞার আভ্যন্তরীণ অর্থের দিক থেকে দেখলে, সংস্কৃতি কথাটির সীমা বিশাল বিস্তৃত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা মত পার্থিব বিষয়গুলি ছাড়াও একটি জাতির জীবনে জড়িয়ে থাকে আরও অতিরিক্ত কিছু, যা তার দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ইত্যাদি। একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তরীণ প্রাণ ও মানসিক অনুপ্রেরণা যা তাই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি। এই বিশাল ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করতে অনেকাংশেই সাহায্য করে বিনোদন বা এনটারটেনমেন্ট। ইংরাজিতে "পারফরমিং আর্ট" বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের মেয়েদের অংশগ্রহণ, পারঙ্গমতা এবং তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

৮.১.২ : প্রাচীনযুগে নারী ও বিনোদন

অতীতে ফিরে দেখলে, ভারতীয় জীবনে সঙ্গীত-নৃত্যাভিনয়ের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে

সংশয় থাকে না। মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করতেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক যুগের প্রথম দিকেও এই চল ছিল, "নৃত্য, গীতবাদ্য তখনকার আর্যপুরুষদিকের নিত্য সহচর ছিল। এ তিনটি না হইলে তাহাদের একেবারেই চলিত না। এই তিনটির অনুশীলন তাঁহারা এত বেশীরকম করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র হিসাবে সঙ্গীতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তাহাদের নজর এড়াইত না। যজ্ঞে উৎসবে খেলায় আমোদে নাচগানের খুব আদর ছিল। খুব ছোট বয়স হইতে ছেলেমেয়েদের নাচগান শেখানো হইত। তবে নাচটা মেয়েরাই একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল।" এ প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫তম সূত্র থেকে জানিয়েছেন যে "মেয়েদের প্রথমে সোমরস তৈরী করিতে শেখানো হইত; তারপর তারা নাচ শিখিত, শেষে তাহাদের বিবাহ হইত।" শুধু তাই নয়, তাঁর কথামত দাসীকন্যারাও উচ্চধরনের নৃত্যশিক্ষা করিত। তিনি বৈদিক যুগে মহাব্রত যজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে তরুণীরা, এমনকি সন্তানবতী - বিবাহিতা পুরনারীরাও নৃত্যে অংশ নিতেন। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালির ইতিহাস'-এ জানিয়েছেন, প্রাচীন বাংলার উঁচুতলার মেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা কলাবিদ্যা নৃত্যগীতেরও তালিম নিতেন। 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে নটগঙ্গোর পুত্রবধূ বিদ্যুতপ্রভার নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুকুমার সেনের মতে, "কালিদাসের সময় মেয়েনাচ, পরবর্তী এমনকি আধুনিক কালের মতই দুরকমের প্রচলিত ছিল। এক ছিল অন্তঃপুরিকাদের এবং আরেকটি ছিল পেশাদার বারনারীদের 'প্রমোদ নৃত্য'। বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে (জাতক, অবদান, গাথাসাহিত্য প্রভৃতি) বৈশালী নগরের কন্যা অম্বপালির মত মেয়েদের কথাও পাওয়া যায়, যারা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। বৈশালী নগরের কন্যা আম্রপালি বা অম্বপালি - নৃত্যগীতে এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, এত ভাল কবিতা লিখতে পারতেন এবং এত সুন্দরী ছিলেন যে তাঁর নগরের তিনি প্রায় মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। রাজা বিম্বিসারের পুত্রও তিনি ধারণ করেছিলেন। সেই পুত্র বুদ্ধের শরণ নেওয়ার পর অম্বপালি একদিন বুদ্ধকে দেখতে যান। ধর্মের বাণী শুনে মুগ্ধ অম্বপালি বুদ্ধকে তাঁর বাগানে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ বৈশালীর নগরপালদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে অম্বপালির নিমন্ত্রণ রাখেন। অম্বপালি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হন, তাঁর বিশাল বাগান দান করেন বুদ্ধকে। এছাড়া, বৌদ্ধ সাহিত্যে বারাণসীর বারাঙ্গনা শ্যামা, দিব্যাবদান থেকে মথুরার গণিকা বাসবদত্তা, অশোকাবদান থেকে চণ্ডালিকা ও রাজগৃহের বিখ্যাত গণিকা শালবতী নামক নৃত্যপটিয়সীদের কথা জানা যায়।

ভবিষ্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে দেখা যাচ্ছে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে বারাঙ্গনারা নৃত্যগীত

পরিবেশন করত। দীপাবলীর সময়ে একজন বারাঙ্গনা ঘরে ঘরে গিয়ে মঙ্গলবচন আবৃত্তি করত, যা লক্ষ্মীর আগমনের জন্য আহ্বান বলে মনে করা হত। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে দেবদাসীদের মন্দিরে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান করার জন্য মন্দিরে স্থান দেওয়া হত। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে পাওয়া শিলালিপি, তাম্রলিপি থেকে রাজা এবং অন্যান্য বিত্তবানদের মন্দিরে নর্তকী উৎসর্গ করা, তাদের দিয়ে নৃত্যগীতের আয়োজন, তাদের সম্মত্তিদান প্রভৃতি বিবরণ পাওয়া যায়। একাদশ শতকে সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুঠ করতে গিয়ে পাঁচশো দেবদাসীর দেখা পেয়েছিলেন। মধ্যযুগে কোন কোন সময়ে রাষ্ট্রকর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা কমে গেলেও ধনী লোকের বাড়িতে যে কোন অনুষ্ঠানে নাচগান দেখানোর জন্য মেয়েদের আনা হত। কলিঙ্গ (ওড়িশা) বা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের দেবদাসী থেকে মুঘল মেহফিলের বাঈজী, সকলেই ছিলেন নৃত্যগীতে পারঙ্গমা। বিখ্যাত পর্তুগিজ ভ্রমণকারী ডোমিনিগো পায়েস ও পারস্যের দূত আবদ-আর-রজ্জাক দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের নৃত্যরতা দেবদাসীদের বিষয়ে লিখেছেন। সেই রাজ্যে দেবদাসীরা ছিলেন অতুল সম্পদশালিনী।

৮.১.৩ : মধ্যযুগে নারী ও বিনোদন

একথা ঠিক যে মধ্যযুগে ইসলামিয় সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্বতন সংস্কৃতিধারার গতিপথ বদলাল। স্বাভাবিক কারণেই রাজসভাকেন্দ্রিক সংস্কৃত নাট্যাভিনয় বন্ধ হল। ঐতিহাসিকদের মতে দশম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় জনজীবনে নটনৃত্য-নাট্যকলা জাতীয় অনুষ্ঠান যে সব লোকগীতির আঙ্গিকের মধ্যে অভিব্যক্ত হল, তার অধিকাংশই বর্ণনাধর্মী এবং পুরুষই তার রূপকার। নারীকে দু-একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যেমন বৈষ্ণবধর্মের উত্থানের কালে রাসলীলায়, মণিপুরী নাচ বা গানে, বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতিপালায় এবং কেরালায় কুড্ডিয়াত্তম সংস্কৃত নৃত্যনাট্যে। তার মেয়েরা ছিল সঙ্গীত চর্চার জগতে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের জগতে বাঈজী ঘরানায়। বাংলার লোকনাট্য যাত্রার উদ্ভব ঘটল কৃষ্ণকথার প্রচারকে কেন্দ্রে রেখে, কিন্তু নারীকে অনেকটাই বর্জন করে। চৈতন্যদের তাঁর যৌবনকালে যাত্রা পালায় অংশ নিয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, সে অভিনয়ে কোন মহিলা অংশ নেননি। কিন্তু বিষ্ণু বসুর মতে নানা ধরনের লোকনাট্যে মধ্যযুগেও যে মেয়েরা যোগ দিতেন, এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। বাংলায় জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী ছিলেন নৃত্যগীতে পারদর্শিনী। দ্বাদশ শতকের এই কবির রচনা গীতগোবিন্দ কাব্য বলে পরিচিত হলেও তা মূলতঃ নাট্যগীতি। জানা যায় এই

সংলাপগুলি গাইতেন জয়দেব এবং তার সাথে নৃত্যাভিনয় করতেন পদ্মাবতী। স্ত্রীর এই অংশগ্রহণে জয়দেবের যে কুণ্ঠা ছিল না, তার প্রমাণ তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন — পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী ও পদ্মাবতী রমন 'জয়দেব কবি' বলে। এছাড়া রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গলে নটীনৃত্যের বর্ণনা করেছেন।

রূপরাম লিখছেন —

"সনকা নটিনী নামে গৌড়ি নিবাসী দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্বশী।" এছাড়া লখনৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর আমলে (১৮৪০ এর দশক) গায়িকা নর্তকী, যাঁরা 'পরী' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের তালিম দিতে বড় বড় ওস্তাদ রেখেছিলেন। একটা সময়ে এক একজন পরীর সাতজন শিক্ষকও ছিল। হিন্দুদের রাসনৃত্যের অনুকরণে 'রাহসধারী' নাচের প্রচলন হয়েছিল। নবাবের নিজের লেখা নানা নৃত্যনাট্য অভিনীত হত, তাদের বলা হত 'রাস কা জলসা'। এক একটি অনুষ্ঠানে আড়াইশো নর্তকী, উপস্থিত থাকত। ওয়াজিদ আলি শাহর নিজের লেখায় পাওয়া যায়, তেরো-চোদ্দ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বহুবার রাস জলসা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সাধারণভাবে, নবম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নির্মিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মন্দিরগাত্রে নির্মিত মন্দিরে মেয়েদের প্রত্যক্ষভাবে বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কোণার্কের মন্দিরে, খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে মেয়েরা সতত বিরাজমান। বিভিন্ন ভাস্কর্যে নৃত্যরতা, বীণাবাদনকারী, তালবাদ্য বাদনকারী মেয়েদের বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত করা হয়েছে।

মেয়েরা সাংস্কৃতিক বিনোদনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করত বলেই মেয়েদের অবস্থান ছিল গৌরবজনক, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। একথা ঠিক যে প্রাচীনযুগে চৌষট্টিকলায় নারীর অধিকার ছিল স্বীকৃত। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনার ভূমিকা নিতান্ত গৌণ ছিল না যদিও নগরনটীদের সম্পর্কে যথেষ্ট তীর্যক দৃষ্টিপাত ছিল। অভিনয়কলায় নারীর অংশগ্রহণ খুব সম্মানজনক ছিল না। সমাজে ও অর্থনীতিতে যে শ্রেণীবিভাগ তা মেয়েদের উপর অনুশাসনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিছেল। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, "শাস্ত্র থেকে যে তথ্য চোখে পড়ে .... বলা নিস্প্রয়োজন, বহু অনুসন্ধানেও নারীকে সেকালের সমাজ সম্মানের আসনে দেখতে পাইনি।" তৈওরীয় সংহিতায় বলা হচ্ছে যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকানো উচিত নয়। দক্ষিণের মন্দিরের দেবদাসীদের জীবনের শেষভাগটি বড় করুণ। তরুণী দেবদাসী বৃদ্ধা হলে মন্দির থেকে তাদের বিদায় করে দেওয়া হত। বাণগড় প্রশস্তিতে রাজা

নয়পালদেবের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের বাণগড়ে বারোতলা মন্দির তৈরির কথা পাওয়া যায়, যেখানে সহস্র দেবদাসী ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে নৃত্যরত দেবদাসীদের কথা পাওয়া যায়, যারা তাদের মণিময় কিঙ্কিনীসহ উদ্ধতভাবে নৃত্য করত। দেওপাড়া প্রশস্তিতে পাওয়া যায়, সেন রাজা বিজয়সেন দেবপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেছিলেন, এবং সেখানে একশো সুন্দরী, অলংকৃতা দেবদাসী নৃত্য করতেন। রাঢ়বঙ্গের মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে 'দেবদাসী পাড়া' বা নটীপাড়া ছিল। এই দেবদাসীরা কৃষ্ণবাঁধের কাছে ইদকুঁড়িতে ইন্দ্র পূজার সময়ে রাজা ও সভাসদদের সামনে নাচগান করতেন। কিন্তু অন্যদিকে, অর্থাৎ বার্ধক্যে দেবদাসীরা ছিলেন ব্রাত্য। মহীশূরে নিয়ম ছিল অবসরের প্রতীক হিসেবে রাজসভায় সবার সামনে কানের গয়না 'পম্পাদাম' খুলে ফেলে পিছন দিকে না তাকিয়ে সভাত্যাগ করতে হত। তিরুপতি মন্দিরে দেবদাসীকে বিদায় দেওয়ার সময়ে লোহা পুড়িয়ে তার উরু এবং বুকে বেঙ্কটেশ্বরের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। একটি প্রশংসাপত্রও দেওয়া হয়। তখন সেই দেবদাসীর নাম হয় 'কলিযুগ-লক্ষ্মী'। একদিন যে ছিল মন্দিরের নর্তকী, সে তখন পথের ভিখারিনী। আধুনিক গবেষকরা তাই মনে করেন যে মনু সংহিতার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ভারতীয় নারীদের বিনোদনকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

৮.১.৪ : আধুনিককালে নারী ও বিনোদন

আধুনিক ভারতে, কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে শহর কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বিনোদনের সংজ্ঞাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত তাত্ত্বিক সংগ্রামের শুরু পাশ্চাত্য জগতে। কিন্তু উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির উচ্চমন্যতা বাঙালি মহিলাকে সরিয়ে রেখেছিল শিল্পীর অবস্থান থেকে। তাই গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি ভদ্রমহিলাদের সম্পর্কে নানা সংস্কারমূলক রচনা পাওয়া গেলেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের সম্পর্কে সে ধরনের মৌলিক কোন ভাবনাচিন্তার প্রয়াস দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতকে শুধুমাত্র নটী বিনোদিনীর 'আমার কথা' — এই আত্মচরিত ছাড়া এই মহিলাদের নিজস্ব ভাষ্য না পাওয়া গেলেও বিংশ শতকে কিছু মহিলা শিল্পীর আত্মকথন পাওয়া গেছে। তা থেকেই বোঝা যায় যে আধুনিকতা ও শিক্ষা মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিসরকে সহজে উন্মুক্ত করেনি। নানা অবহেলা ও বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা অগ্রসর হয়েছেন, বিকশিত হয়েছেন শিল্পী, গায়িকা, অভিনেত্রী হিসাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবর্গের রক্ষণশীল সমাজ মেয়েদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল অন্দরের ঘেরাটোপে। সেটি অতিক্রম করে নাচগানের মত ব্যাপারে অংশ নেওয়া সেই মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে আঠারো-উনিশ শতকে যেসব বিদেশী চিত্রশিল্পী ক্যানভাসে নগরকে এঁকেছিলেন, তার বড় অংশ জুড়ে আছেন নৃত্যরতা মেয়েরা। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ এ মিসেস বেলনসের আঁকা বিশাল ঘাঘরার দুইপ্রান্ত ধরে নৃত্যরত বাঈজীর চিত্র উল্লেখযোগ্য। একইভাবে বটতলায় কাঠখোদাই চিত্রে মিলবে ঝুমুর খেমটাওয়ালীদের উচ্ছ্বসিত নৃত্যভঙ্গিমা ও তাঁদের ঘিরে জনতার প্রাণচাঞ্চল্য। কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতি ছন্দময় হয়ে উঠতে পেরেছিল এদেরই নৃত্যের তালে। সেকালের বিখ্যাত বাঈজী নাচের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করেছিলেন শোভাবাজারের দেবরা এবং কেষ্টচন্দ্র মিত্র, মদনমোহন দত্ত, রামদুলাল সরকার ও মতিলাল শীল প্রমুখ বাবুরা। এছাড়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্দরমহলের মেয়েরা পাঁচালী, বৈষ্ণবীর কথকতা, তপকীর্তনীয়া মহিলার বিরহ সংগীত, খেউড়, খেমটার রসজ্ঞ দর্শক ও শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এগুলিই নব্য শিক্ষিত মহিলাদের 'ভদ্রমহিলা' হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা বলে মনে করা হতে থাকে। মেয়েদের সৃজনী ক্ষমতাকে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখাই ছিল ঊনিশ শতকের সমাজের আদর্শ। ফলে পেশাগত থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে বেছে নিতে হয়েছিল নাচ-গানে পটিয়সী বারাঙ্গনা ঘরের কন্যাদের। গিরিশ এবং শিশির যুগের বেশ কিছু অভিনেত্রীই তাদের মঞ্চজীবন শুরু করেছিলেন সখীর দলে নেচে। বাংলার রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের অভিনয় বা নাচ-গানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', গ্রন্থে থিয়েটারের দূষিত চরিত্রের নারীদের তীব্র সমালোচনা করেন। ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছিল ঠাকুরবাড়ি ও বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা নিয়ে সমকালীন পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল 'ঠাকুরবাড়ির নূতন ঠাট'। তবে পরবর্তীকালে উদয়শঙ্করও তাঁর নৃত্যশৈলী মেয়েদের নৃত্যাভিনয়ের জন্য বৃহত্তর প্রাঙ্গণ সৃষ্টি করেছিলেন। রাধামাধব রায়ের কন্যা রেবা রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে ভদ্র ঘরের মেয়ে হিসাবে নাচের জগতে পা রাখেন। রেবা রায় চৌধুরী, উষা দত্ত, সাধনা গুহের স্মৃতিচারণ পড়ে বোঝা যায়, সাধারণ বাঙালি ঘরের কন্যা থেকে মঞ্চে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশের পিছনে কত সংগ্রাম ছিল।

মেয়েদের সঙ্গীতচর্চার প্রসঙ্গটিও শালীনতার তথাকথিত নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। গায়িকা হিসাবে কিছু মেয়ের জনপ্রিয়তার উৎস ছিল থিয়েটারগুলিই। উদাহরণস্বরূপ যাদুমণির সঙ্গীত প্রতিভার কথা বলা

যেতে পারে। এছাড়া গোলাপসুন্দরী, সুশীলবালা, তিনকড়ি, প্রভৃতি গায়িকা হিসাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগে জনপ্রিয় হন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে গানের জগতে মেয়েদের প্রবেশের এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা হল। ১৯০১এ গ্রামাফোন কোম্পানী আসার পর মিস্ শশীমুখী, আঙুরবালা ও ইন্দুবালার আবির্ভাব ঘটেছিল।

অভিনয়ের প্রশংসা হলেও গোলাপসুন্দরী থেকে সরযুবালার যুগে পৌঁছতে বাংলার রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের যে পরিশ্রম ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা ছিল সমগ্র ভারতেরই একটি খণ্ডচিত্র। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেক মেয়ে সংস্কৃতির জগতে যা রেখেছিলেন আদর্শের তাগিদে। শিল্পী হিসাবে যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা তাঁদের জীবিকা অর্জনেরও বড় সহায়ক হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এদের মধ্যে সবাই না হলেও অন্ততঃ কেউ কেউ পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন নাচ-গান-অভিনয়কে, যোগ দিয়েছেন সংস্কৃতি মঞ্চে। বাকিরাও বহন করেছেন সেই সাহসী চেতনা, যা পরবর্তী সময়ে মেয়েদের সাংস্কৃতিক মঞ্চে অংশগ্রহণে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্পে বিনিয়োগের ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়ায় মহিলা শিল্পীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা অনুকূল হয়েছিল। তবুও সাংস্কৃতিক জগতে পরিপূর্ণ পেশাদারিত্বের অভাব তখনও রয়ে যায়। এই সকল বাধা সত্ত্বেও আজ একবিংশ শতকে মহিলাশিল্পীদের মধ্যে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্বে বিনোদিনী যে কথা বলতে পেরেছিলেন, সেই কথাই আজ আরও পরিণত হয়েছে মহিলাশিল্পীর বর্তমান আত্মচেতনায়।

৮.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। মণিনাগ, স্বাতী ভট্টাচার্য — দেবদাসী থেকে যৌনকর্মী।

২। বিনোদিনী দাসী — আমার কথা।

৩। কানন দেবী — সবারে আমি নমি।

৪। সুকুমার সেন — নট-নাট্য নাটক।

৫। নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালির ইতিহাস।

৬। সুকুমারী ভট্টাচার্য — প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য।

৮.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতি কথাটির মূল্যায়ন কর।

২। প্রাচীনকালে মেয়েদের সংস্কৃতিতে যোগদান করা কতদূর সম্ভব ছিল তা ব্যাখ্যা কর।

৩। দেবদাসীদের অবস্থান সম্পর্কে রচনা লেখ।

৪। মধ্যযুগে মেয়েদের বিনোদনে অংশগ্রহণ ছিল কি ?

৫। স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্বে দেবদাসীদের সম্পর্কে কি জানা যায় ?

৬। আধুনিক যুগে মেয়েদের সংস্কৃতিতে যোগদান কিভাবে সম্ভবপর হল ?

৭। নৃত্য-গীত-অভিনয়ে ঊনিশ শতকের মেয়েদের অবদান কি ছিল ?

পর্যায় ৩

একক ৯

Autobiographies and Biographies of Some Leading Women in Nineteenth and Twentieth Century

উদ্দেশ্য

সূচনা

ফুলন দেবী

নটী বিনোদিনী

কমলা দাস

সুধা মজুমদার

উপসংহার

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন:

১. নারী কেন্দ্রিক ইতিহাসে জীবনী এবং আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের গুরুত্ব

২. ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে নারীদের জীবনী সম্পর্কে

৩. পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীদের লেখনীর মাধ্যমে বিরোধ

সূচনা:

ভারতের নারী কেন্দ্রিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস এর বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে একাধিক মহিয়সী নারীদের কথা জানা যায়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ঐতিহাসিকরা আত্মজীবনী এবং জীবনীগুলির উপর নির্ভরশীল।

একটি জীবনী বা আত্মজীবনী হল কারো জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা বা বিবরণ। এটি "written life of a person" হিসাবে অনেকসময় আখ্যায়িত হয়। জীবনী হল একজন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাগুলির একটি অপেক্ষাকৃত পূর্ণ বিবরণ যা তার চরিত্র, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, সেইসাথে তার অভিজ্ঞতা এবং কার্যকলাপগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। আত্মজীবনী হল জীবনীর একটি রূপ যার বিষয়বস্তুও একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন, কর্ম জীবন তুলে ধরে। তবে এটি সাধারণত সেই ব্যক্তি নিজেই রচনা করে । সাধারণভাবে অনেকেই মহান ব্যক্তিদের জীবনী পড়তে পছন্দ করে এবং সেখান থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন ধারার গ্রন্থের মধ্যে জীবনী বা আত্মজীবনী জনপ্রিয় ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি কেবলমাত্র পাঠককে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বর এবং তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে অবগত করে তাই নয়, তাদেরকে অনুপ্রেরণা এবং পাঠের আনন্দও প্রদান করে।

বর্তমান এককটিতে বিংশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছু ভারতীয় মহিলাদের জীবন এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রকাশিত জীবনী এবং আত্মজীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবন বা পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্পর্কে অবগত হব তাই নয়, বরং তার পাশাপাশি তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও ওয়াকিবহল হব। বিনোদন জগৎ থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ, সোশ্যাল ওয়ার্কার সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রর সঙ্গে যুক্ত নারীদের জীবনী এবং আত্মজীবনীই হবে এই এককের আলোচ্য বিষয়।

ফুলন দেবী:

ফুলন দেবী উত্তর প্রদেশের দেবী ঘুরা কা পুরওয়া নামে একটি গ্রামে মাল্লাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাল্লা কমিউনিটিকে নীচু জাত হিসাবেই গণ্য করা হতো। মাল্লাদের পরিবারে বেড়ে ওঠা ফুলন দেবী একাধিকবার নিপীড়ন এবং অপমানের শিকার হন তাঁর জীবনে কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি ক্ষমতার শীর্ষেও পৌঁছান নিজের চেষ্টায়। সামাজিক কাঠামোগত অবিচারের শিকার থেকে শুরু করে গণধর্ষণ এবং ঠাকুরদের অত্যাচারের শিকার ফুলন দেবী অকথ্য অত্যাচার এবং নিপীড়ণের পরেও দমে

যাননি বরং নিজের হাতেই তাঁর অত্যাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সবকিছুই আমরা জানতে পারি ফুলন দেবী বর্ণিত এবং ফরাসি লেখক মারি-থেরেসি কুনি এবং পল রামবালি রচিত 'I, Phoolan Devi: The Autobiography of India's Bandit Queen' জীবনীমূলক গ্রন্থ থেকে।

ফুলন দেবীর সংগ্রাম ছিল সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে, তাঁর সংগ্রাম ছিল পুরুষতন্ত্রের, পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

ফুলন দেবীর কাহিনী , এটি এমন একজন মহিলার গল্প যিনি ঠাকুর গোষ্ঠীর বর্বরতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যিনি চিরাচরিত নিয়ম নীতি মেনে চলা, পুরুষতন্ত্রের সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিলেন। উল্লেখ্য, ফুলন দেবীর মা সবসময় তাকে অন্যায় মেনে না নিতে উৎসাহ দিতেন।
জানা যায় দশ বছর বয়সে, তিনি তাঁর খুড়তুতো ভাই মায়াদিন, যে তাঁর বাবার জমি দখল করেছিল; তার সাথে লড়াই করেছিলেন এবং পঞ্চায়েতকে জমির মামলা পুনরায় তত্ত্বাবধান করতে বাধ্য করেছিলেন। ছোট থেকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি সাহসের পরিচয় রেখেছিলেন এবং কখনোই সামাজিক অপমান মাথা পেতে সহ্য করেননি, বরং আত্মমর্যাদা কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন।

ফুলন দেবী মাল্লাদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই মাল্লা গোষ্ঠীর মানুষদের বিনা পারিশ্রমিকে ঠাকুরদের পশুপালন করা, সেই পশুদের জন্য ঘাস কাটা, গোবর সংগ্রহ করা, ঠাকুরিয়ানের মাথা মালিশ করার প্রভৃতি কাজ করতে হত। কেউ ঠাকুরদের কাজ করতে অস্বীকার করলে তাদের মারধর করা হত; এমনকি ফুলনকে একাধিকবার মারধর করা হয়েছিল ঠাকুরদের জন্য কাজ করতে অস্বীকার করার জন্য।

উল্লেখ্য, ভারতে বহুলপ্রচলিত বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন ফুলন দেবী। মাত্র এগারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় পুট্টি লালের সাথে, যার বয়স ছিল ত্রিশের কাছাকাছি। এমনকি বিয়ে কী তাও সে জানত না এবং লোকেরা যখন তাকে বলল যে পুট্টি লাল তার স্বামী। তার স্বামী তাকে বারবার মারধর ও ধর্ষণ করে। কোনোভাবে এই নির্যাতনের খবর তার বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছায় এবং সমাজের আপত্তি সত্ত্বেও তার বাবা-মা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এমনকি তার বাড়িতে ফিরে আসার পরেও, জীবন তার পক্ষে সহজ ছিল না কারণ তাকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিল না এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের ঠাকুররা এর সুযোগ নিয়ে তাকে কটূক্তি করতে শুরু করে এবং বাজে মন্তব্য করতে থাকে। একদিন, গ্রামপ্রধানের ছেলে তাঁকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে সে তাকে চড় মেরে পালিয়ে যায় কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত তাকে গ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই, তার বাবা-মা রাজি না হওয়া সত্ত্বেও সে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ফুলন তার বড় বোন রুকমণির কাছে যায়।

তিনি যখন তার বোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন তার গ্রামে ডাকাতি হয়েছিল এবং সেই ডাকাতির জন্য তার চাচাতো ভাই মায়াদিন ফুলন দেবীকে দায়ী করেছিল। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁর বয়ান শোনার চেষ্টাও করেনা। কয়েকদিনের জন্য তাকে তার বাবার সাথে তদন্তের জন্য সিই-এ আটকে রাখা হয়েছিল এবং পুলিশ তাঁকে তাঁর বাবার সামনে ধর্ষণ করেছিল, পরে তাকে এক সপ্তাহের জন্য জেলে পাঠানো হয় এবং যখন তার মা প্রমাণ উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল যে গ্রামে ডাকাতি হওয়ার সময় ফুলন দেবী তাঁর বোনের সাথে ছিল এবং ডাকাতির সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, তখন তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বলা চলে প্রায় তেরো বছর বয়সের মধ্যেই, ফুলন দেবীর বিয়ে হয়েছিল, অনানুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল, একাধিকবার তিনি মারধর খেয়েছিলেন, একাধিকবার ধর্ষণ এর শিকার হয়েছিলেন এবং বিনা কারণে জেলেও ছিলেন। এত লাঞ্ছনার পরেও, তার জন্য কিছুই বদলায়নি এমনকি তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ ঠাকুরদের আচরণও নয়। একবার তাকে তার গ্রামের তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরা তার বাবা-মায়ের সামনে ধর্ষণ করেছিল। এই ঘটনাটির জন্য সুবিচার পেতে সে পাশের গ্রামের ঠাকুরদের কাছে গেছিল, এবং উল্লেখ্য সেই গ্রামের ঠাকুররা তাঁর পাশেও দাঁড়ান। ঠাকুররা এসে ফুলনের গ্রামের ঠাকুরদের হুমকি দিয়েছিলেন । কিন্তু, খুব শীঘ্রই সে বুঝতে পেরেছিল যে সেই ঠাকুররা তাকে উদ্ধার করতে আসেনি বরং এর মধ্যে তাদের নিজস্ব স্বার্থ লুকিয়েছিল। সেই ঠাকুরদের সাথে তার গ্রামের ঠাকুরদের ব্যক্তিগত বিরোধ ছিল তাই সেই স্বার্থদ্বন্দ্বেই অন্য গ্রামের ঠাকুররা এসেছিলেন।

পরে, তাকে তথাকথিত ঠাকুরদের কথায় বাবু গুজ্জর এবং বিক্রম মাল্লার দল দ্বারা অপহরণ করানো হয়। বাবু গুজ্জর ফুলনকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করলে বিক্রম তাকে হত্যা করে এবং ফুলনের জীবন বাঁচায়। এইভাবে, ফুলন দস্যু রানী হয়ে ওঠে এবং ফুলন দেবীর দ্বারা না হলেও, তাঁর জন্য প্রথম নিহত হয় বাবু গুজ্জর। ফুল দেবীর দলে বেশির ভাগ লোক ছিল জাটব, চামার বা মাল্লা সম্প্রদায়ের। তাদের বেশিরভাগই এই জীবন বেছে নিয়েছিল কারণ তারা পুলিশের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পেতে পারেনি এবং উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেছিল। তারা আসলে আধুনিক রবিন হুডের মত জীবন যাপন করেছিল - অর্থাৎ ধনী লোকদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের দান করে এবং জীবনে প্রথমবারের মতো ফুলন বিক্রম মাল্লা এবং রাইফেলের সাথে অসহায় নয় বরং নিরাপদ বোধ করে। লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে এবং উচ্চবর্ণের লোকদের বর্বরতা থেকে বাঁচার জন্য তাকে সমর্থন করতে শুরু করে। তবে ফুলন দেবীর নাম নিয়ে আরও অনেক দল কাজ শুরু করে।

কিন্তু, এই শান্তিপূর্ণ সময় ফুলনের জীবনে সীমিত ছিল, খুব শীঘ্রই যখন বিক্রম শ্রী রাম ও লালে রাম নামের দুজন ঠাকুরের জামিনের জন্য 50000 টাকা দিয়ে তাদের জেল থেকে বের করেন, শ্রী রাম বিশ্বাসঘাতকতা করে বিক্রমকে হত্যা করে। তবে ফুলনের দুঃস্বপ্ন সেখানেই শেষ হয়নি; শ্রী রাম এবং তার দলবল ফুলন দেবীকে অপহরণ করে এবং ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ ধরে ধর্ষণ করে। শ্রী রাম তাকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতে থাকেন যে নিম্ন বর্ণের দেবীদের সাথে এমনই হয়। এই ঘটনাটি ফুলনকে আরও ক্রোধে পূর্ণ করে এবং তিনি শ্রী রামের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে উদগ্রীব হয়ে পড়েন । শ্রী রাম যখন তাকে গ্রাম থেকে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে লোকেরা তাদের লালসা চরিতার্থ করতে পারে একজন সদয় হৃদয় ব্রাহ্মণ তাকে এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে সাহায্য করেছিল। ফুলন দেবী তখন বনে ফিরে গিয়ে আবার নিজের দল গঠন করেন।

এইসময় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল শ্রী রামকে হত্যা করা। তিনি একবার শুনেছিলেন যে শ্রী রাম এবং তার লোকেরা বেহমাই নামে গ্রামে একটি বিয়েতে আসছে। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে সেখানে গিয়ে শ্রী রাম ও তার ভাইকে তাড়া করেন কিন্তু তারা পালিয়ে গেলে ফুলন দেবী তাদের পিছনে তাড়া করেন। কিন্তু তারপর গ্রামে যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তিনি দেখতে পান তাঁর দলের লোকেরা প্রায় ২২ জন ঠাকুরকে হত্যা করেছে!

পরের দিন, সমস্ত সংবাদপত্র, খবরের -চ্যানেলে ঠাকুরদের হত্যার ঘটনাটি সম্প্রচার করেছিল। এতদিন যাবৎ ফুলন দেবীর উপর অত্যাচারের নিপীড়ণের কাহিনী কোথাও সম্প্রচারিত না হলেও ঠাকুরদের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফুলন দেবীকে গ্রেপ্তারের জন্য কর্তৃপক্ষ সরব হয়ে ওঠে। পরে, তিনি মধ্যপ্রদেশ সরকারের সাথে একটি চুক্তি করেন, যাতে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর দলের লোকদের সাথে তাঁকে সর্বোচ্চ ৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় । কেন তিনি ৮ বছরের কারাদণ্ড চান জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন যে তিনি সাংবাদিকদের কাছ থেকে শুনেছেন যে তিনি নিজে থেকে আত্মসমর্পণ করলে সর্বোচ্চ ৮ বছর জেল হবে ! তিনি জনসমক্ষে আত্মসমর্পণ করেন এবং দীর্ঘ 11 বছর জেলে বিনা বিচারে অতিবাহিত করেন!

'I, Phoolan Devi: The Autobiography of India's Bandit Queen' বইটিতে ভারতীয় সমাজে শ্রেণী বৈষম্য থেকে শুরু করে নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার এবং সামাজিক কাঠামোগত বৈষম্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এ কথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে গ্রন্থটি কেবলমাত্র ফুলন দেবীর উপর অত্যাচার এবং নিপীড়ণের কাহিনী নথিবদ্ধ করেনি বরং তার পাশাপাশি তাঁর ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনীও ফুটে উঠেছে এর পাতায় পাতায়।

<u>নটী বিনোদিনী:</u>

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক কলকাতার পাবলিক থিয়েটারের প্রথম দিকের পেশাদার অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিনোদিনী দাসী। একধারে অভিনেত্রী এবং অন্যদিকে একজন প্রতিভাবান লেখিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের গল্প, তাঁর উত্থান-পতন, তাঁর স্বপ্ন সমাজের লাঞ্ছনা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' এবং 'আমার অভিনেত্রী জীবন'। তবে তাঁর জীবৎকালে তাঁর লেখনী যথাযথ লোক সমাজে গুরুত্ব পায়নি। এমনকি তৎকালীন সময়ের ভদ্রমহিলাদের লেখার সংকলনের মধ্যেও
তাঁর লেখনী স্থান পায়নি। যেহেতু এই গ্রন্থগুলো অবহেলিত থেকে গেছে, তাই এখন সময় এসেছে এগুলোকে পণ্ডিতদের ইচ্ছাকৃত স্মৃতিভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করার এবং সেগুলিকে যথাযথ ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়ার। বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থগুলির পাঠের মাধ্যমে সমাজে দীর্ঘদিন যাবৎ অবহেলিত এবং দমিত মানুষদের অতীত সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নতুন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হবো আমরা।

সৌরভ দন্ডপাত তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক বাংলার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির জটিল বর্ণালীর মধ্যে বিনোদিনী দাসীর লেখা আত্মজীবনীর পাঠ করেছেন। তাঁর মতে বিনোদিনী দাসী সমাজে অবহেলিত এবং দমিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নিজের কথা তুলে ধরতে সক্ষম হলেও পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁকে 'radical feminist' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়না।

বিনোদিনীর আত্মজীবনী তাঁর কণ্ঠস্বর, সমাজে তাঁর অবস্থানকে তুলে ধরলেও তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণভাবে এটি উনিশ শতকের শেষের বাংলার মহিলাদের অবস্থা এবং আরও বিশেষভাবে পতিতা-অভিনেত্রীদের সমাজে বেদনাদায়ক, দুর্ভাগ্যজনক এবং অবজ্ঞার কথা তুলে ধরে। নিজেকে বারাঙ্গনা এবং

কলঙ্কিনী/পতিতা (পতিত মহিলা) বলে উল্লেখ করেছেন তিনি, তিনি সমস্ত সুখ থেকে বঞ্চিত এবং বন্ধু এবং সমাজের দ্বারা অবহেলিত হয়ে এসছিলেন বারংবার। মহিলাদের মধ্যে পবিত্র এবং অপবিত্র এই binary এর কথা তুলে ধরেছিলেন বিনোদিনী দাসী। তৎকালীন সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন একটি বাঁধাধরা মর্যাদাসম্পন্ন মহিলাদের চিত্র তুলে ধরেছিল। যেখানে মর্যাদাসম্পন্ন মহিলারা অন্তঃপুরে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতো। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ন্যায় ঘর বাহির, নারী পুরুষ, অন্তঃপুর বাহির এই binary গুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল সেইসময়। যদিও বিনোদিনী তার গুণগত অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন তবুও তাকে সম্মানিত মহিলা (ভদ্রমহিলা) হিসেবে গণ্য করা হতনা । কারণ তিনি অন্তঃপুরে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র এবং দীনবন্ধু মিত্রের নতুন মানবতাবাদ থেকে গিরিশ চন্দ্র ঘোষের উদ্দাম জাতীয়তাবাদী উপস্থাপনা থেকে এবং থিয়েটারে তার জীবনের সময় হিন্দু পুরাণ এবং ধর্মীয় ইতিহাস থেকে নতুন মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির ভাষা এবং সংবেদনশীলতার (বিশেষত নারীদের আচরণবিধি) সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যলীলা নাটকে অভিনয়ের পর তিনি এমনকি আধ্যাত্মিক জীবন বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় তিনি পণ্য বা 'material' হিসাবেই গণ্য হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক বা ' spiritual' হিসাবে নয় কারণ তিনি অন্তঃপুরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রেক্ষাপটে আমরা বাঙালি নারীদের বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে 'বাঙালি শ্রদ্ধেয় (সম্ভ্রান্ত) ভদ্রলোকের ঘর ও বাইরের বাইনারি দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপশি 'ব্যক্তিগত' (ভদ্রমহিলা) এবং 'সর্বজনীন (বারাঙ্গনা/পতিতা), স্ত্রী এবং উপপত্নী এই বাইনারিও লক্ষ্য করতে পারি।

তৎকালীন সমাজ শুধুমাত্র বিনোদিনীকে ' পতিতা ' হিসাবে চিহ্নিত করতেই উদগ্রীব ছিল, কিন্তু থিয়েটার এবং শিল্পের সংহতি এবং মঙ্গলের জন্য তাঁর কাজের সম্পর্কে খুব কম গুরুত্ব প্রদান করেছিল।এমনকি সমাজ তার জনসাধারণের সামনে অভিনয়কে সমাজের আদেশের এবং বিধিনিষেধের লঙঘন হিসাবে বিবেচনা করে, মনে করে তাঁর অভিনয়জগতে অংশ গ্রহণ নারীসুলভ আচরণ ছিল না এবং পুরুষ দৃষ্টির সামনে আসার জন্য তা তাঁর মর্যাদাহানি করেছিল। বিনোদিনী দাসী বিভিন্ন বক্তৃতায়, চিত্রনাট্যে নটী বিনোদিনী হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে তবে উল্লেখ্য উনিশ শতকে ' নটী' কথাটি যতটা না তাঁর পেশাগত পরিচয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তার চেয়েও বেশী ব্যবহৃত হয়েছিল তাঁকে পতিতা হিসাবে দেখানোর জন্য। যদিও বিনোদিনীকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্নক্ষেত্রে বারাঙ্গনা এবং কলঙ্কিনি/পতিতা হিসাবে দেখানো হয়েছিল, তবে তিনি এই মতাদর্শগুলির কাছে সম্পূর্ণভাবে নতি স্বীকার করেননি। উল্লেখ্য, বিনোদিনী, সমসাময়িক পাশ্চাত্যের radical feminist দের ন্যায় পুরুষদের বিরোধিতায় সরব হননি। বরং তিনি সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য পিতৃতন্ত্র দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম কানুনগুলিই অনুসরণ এর চেষ্টা করেছিলেন।

বিনোদিনী তার পেশাগত কর্মজীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন স্তরে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন। যদিও তিনি নিজেকে থিয়েটারের একটি অংশ হিসাবে দেখতেন এবং তার বৃহত্তর পরিবারকে বাঁচানোর জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তবে থিয়েটার তার বিনিময়ে তাকে একটি হীন জীবন থেকে বাঁচাতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, থিয়েটার জীবন ছিল একদিকে আকর্ষণীয় অন্যদিকে প্রতারণামূলক। মায়াময় মঞ্চে অভিনেত্রীরা রাণী, রাজকন্যা, পৌরাণিক/ঐতিহাসিক নায়িকা, মা এবং সামাজিক অনুগ্রহের ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও মঞ্চ তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছিল এবং তাদের ভালো জীবন পাওয়ার প্রত্যাশাও বাড়িয়েছিল কিন্তু আসলে তার পরিবর্তে কেবলমাত্র তারা লাঞ্ছনারই শিকার হয়েছিল বারংবার।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বারংবার জনসমক্ষে অভিনয়ের জন্য তাদের হেনস্থা হতে হয়েছিল, তাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছিল যে তারা 'আধ্যাত্মিকতার' সীমা লঙঘন করেছে, তারা নারী মর্যাদা রক্ষা করেনি।

থিয়েটার সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল এজেন্ডা এতটাও প্রগতিশীল ছিল না যে তৎকালীন সমাজে থিয়েটারের অভিনেত্রীদের সামাজিক মর্যাদা দিতে পারবে। যদিও থিয়েটার পতিতা গোলাপসুন্দরীকে একজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহিলা মিসেস সুকুমারী দত্তে পরিণত করেছিল, কিন্তু তা ছিল সাময়িক।তৎকালীন লোকসমাজে সুকুমারী ও তার স্বামী গোষ্ঠ বিহারী দত্তকে সামাজিকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। খুব শীঘ্রই সুকুমারীকে তার স্বামী ছেড়ে দেয় এবং তাকে তার আগের পেশায় ফিরে আসতে হয় ।

বিনোদিনীও থিয়েটার মতাদর্শের দ্বিধাদ্বন্দ্বে আকৃষ্ট ও প্রতারিত হয়েছিলেন। বিনোদিনী ১০ বা ১১ বছর বয়সে শিশু-অভিনেত্রী হিসাবে পাবলিক থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার নাট্য পেশা তাকে জন্মগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পেশা গ্রহণে বাধা দিতে পারেনি। তাকে তার শরীর বিক্রি করতে হয়েছিল একজন ধনী অবাঙালি পৃষ্ঠপোষক, গুরমুখ রায়ের কাছে। তিনি একমাত্র সেই কারণেই থিয়েটার কোম্পানি তে টাকা ঢালতে রাজি হয়েছিলেন। যদিও বিনোদিনী শিল্পের প্রতি নিবেদনের জন্য প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, ১৯৬০-৭০ এর দশকের আগে অব্দি বেঙ্গল থিয়েটারের আলোচনায় থিয়েটারে তাঁর অবদান সম্পর্কে সকলেই নিরুৎসাহী ছিল। নবগঠিত থিয়েটার, যেটির প্রতিষ্ঠার জন্য বিনোদিনী একজন উপপত্নী, একজন রক্ষিত মহিলা হতে সম্মত হয়েছিল, তার নামকরণ করা হয়েছিল "বি" থিয়েটার যাতে তা পরবর্তী প্রজন্মকে বিনোদিনীর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । কিন্তু থিয়েটারটি "স্টার" থিয়েটার হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। থিয়েটারের নাম পাল্টানোর পিছনে পতিতার নামে নতুন থিয়েটারের নামকরণ ভুল বার্তা দিতে পারে এবং ভদ্রলোকের সমর্থন হারাতে পারে এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে তাকে পতিতাবৃত্তিতে চালিত করা হয়েছিল এবং তার পতিত অবস্থার জন্যও তাকেই দায়ী করা হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর নিজের লোকেরাই থিয়েটার কোম্পানির উন্নতির সাথে সাথে তাঁর সাথে খারাপ ব্যবহার শুরু করে এবং তাঁকে চিরতরে থিয়েটার ছেড়ে যেতে বাধ্য করে। অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হয়ে বিনোদিনী দাসী থিয়েটার ত্যাগ করেন। বিনোদিনী তার উপর লেবেলযুক্ত সামাজিক কলঙ্ক মুছে দিয়ে নিজেকে সম্মানিত নারীর মর্যাদায় উন্নীত করার জন্য কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। 'মঞ্চ' তার উদ্দেশ্য পূরণ করতে না পারায় তিনি তার পেশা থেকে পদত্যাগ করেন।

থিয়েটার ছাড়ার পর বিনোদিনী দীর্ঘ 33 বছর ধরে তার অভিভাবকের সাথে বসবাস করছিলেন। বিনোদিনী নিজেকে ঘরের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রেখে একজন মা এবং একনিষ্ঠ স্ত্রীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু তাকে কখনই ভদ্রমহিলার (ভদ্রলোকের বৈধ স্ত্রী) সমান মর্যাদা ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। গুরমুখ রায়ের মৃত্যুর পর তার 'আসল' পরিবার বিনোদিনীকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীকে ফিরে যেতে হয়েছিল পতিতাপল্লীতে। তাঁর কাছে
একমাত্র পথ বাকি ছিল 'ভক্তি মার্গ (আধ্যাত্মিক পথ) যার মাধ্যমে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন। তার আধ্যাত্মিক জীবন (ভক্তি) শুরু হয়েছিল তার চৈতন্যলীলার প্রস্তুতিমূলক অধিবেশনের সময়। বিনোদিনীর আধ্যাত্মিকতা অন্য মার্গে পৌঁছায় যখন তিনি বাঙালি সাধক শ্রী রামকৃষ্ণের আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ভক্তির পথই হতে পারে নিষ্ঠুরতা, দুর্দশা ও অসমতায় ভরা বস্তুগত জীবন থেকে আত্মমুক্তির একমাত্র উপায়। ১৮৮৭ সালে, শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর বছর, বিনোদিনী তার কর্মজীবনের শীর্ষে থিয়েটার ত্যাগ করেন। তখন তিনি ভক্তিকেই তার 'কলঙ্কিনী জীবন' থেকে মুক্তির

একমাত্র উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে আধ্যাত্মিকতা বিনোদিনীকে পরিত্রাণ ও মুক্তির একটি নতুন উপায় দিয়েছিল। লজ্জার জীবন থেকে বাঁচার জন্য তিনি নিজেকে বারবার নতুন করে খোঁজার এবং তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং এই প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই তিনি সমসাময়িক পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভণ্ডামি এবং দ্বিচারিতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

যদিও ঔপনিবেশিক বাংলায় বিনোদিনীর অবস্থান ছিল একজন নিম্নবর্গীয় মানুষের ন্যায়, বিনোদিনীর ' আমার কথা' তাঁর নিজের বক্তব্য এবং narrative তুলে ধরে সকলের সামনে। কেবলমাত্র উচ্চশ্রেনীর পুরুষদের দ্বারাই নয় বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দ্বারে যে তিনি অবদমিত হয়েছিলেন তা নয় বরং উচ্চশ্রেনীর সম্মানীয় মহিলা এবং সাধারণ মহিলাদের থেকেও নীচুস্থানে তাঁকে দেখা হতো। এই অবদমন এবং প্রান্তিকতার দরুন আদতে তাঁর হারানোর আর কিছুই ছিল না। আধুনিক বাংলার একজন উগ্র নারী লেখিকা তসলিমা নাসরিন দাবি করেছেন যে যতক্ষণ না তিনি তার আদর্শ থেকে মুক্ত না হন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোনও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে না: "যদি না একজন মহিলা 'পতিত' না হয়, তার খাঁচা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একজন 'পতিত' নারী হওয়ার কারণে বিনোদিনী তার প্রান্তিক অবস্থানকে ব্যবহার করেছেন লেখার জন্য।

বিনোদিনীর 'আমার কথা' এবং 'আমার অভিনেত্রী জীবন', এই ধরনের সাহসী প্রশ্নে পরিপূর্ণ, তা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাজ করে। বিনোদিনীর লেখনী হল নারীবাদী, প্রান্তিক এবং সাধারণ নারীদের আধিপত্যবাদী পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতীক স্বরূপ।

ঔপনিবেশিক বাংলায় পাবলিক থিয়েটারের প্রচলিত ইতিহাস একই ধরনের গল্পের পুনরাবৃত্তি করে। বিনোদিনী দাসির আত্মজীবনীর সাম্প্রতিক পুনর্মুদ্রণের ভূমিকায়, প্রবীণ বাঙালি অভিনেতা সৌমিত্র চ্যাটার্জি উল্লেখ করেছেন যে উনিশ শতকের বাংলা থিয়েটার আন্দোলনের ইতিহাসবিদরা বিনোদিনীর বিষয়ে অদ্ভুতভাবে নীরব থেকেছে । তিনি যে সমস্ত থিয়েটার কোম্পানির সাথে কাজ করেছেন তার সাফল্য, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নে তাঁর অবদান থাকা সত্ত্বেও, বিনোদিনী ঔপনিবেশিক বাংলার নাট্য ইতিহাসে তার প্রাপ্য উচ্চ পদ থেকে বঞ্চিত হন। এমনকি তাঁর লেখাগুলোও দীর্ঘদিন অবহেলার শিকার হয়েছে। এটা খুবই দুঃখজনক যে তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আত্মজীবনীমূলক রচনা হিসেবে স্থান পায়নি। এমনকি তিনি যে কয়টি কবিতা লিখেছেন তা বাংলার নারীদের রচনা থেকে পৃথকভাবে দেখা হয়েছে কারণ তিনি 'ভদ্রমহিলা' ছিলেন না এবং সামান্য প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে যে সাহসী আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তা নারীবাদী প্রতিবাদ হিসাবে দেখা যেতে পারে।

বিনোদিনীর আত্মজীবনী 'আমার কথা' এবং 'আমার অভিনেত্রী জীবন' আজও মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় কারণ তারা প্রান্তিক নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিকল্প বিবরণ প্রদান করে ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে। তদুপরি উল্লেখ্য , বিনোদিনী একাই 'নটী' (একজন পাবলিক মহিলা নৃত্যশিল্পী) এর সামাজিক কলঙ্কের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তিনি সমাজকে একজন অভিনেত্রী হিসাবে তার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করেছিলেন। এখন যখন আমরা 'নটী বিনোদিনী' বলি তখন আমরা তাকে একজন মহান অভিনেত্রী হিসেবে বিবেচনা করি, একজন পতিতা নর্তকী হিসেবে নয়।

কমলা দাস:

কমলা সুবাইয়া (১৯৩৪ – ২০০৯), যিনি তার ছদ্মনাম মাধবীকুট্টি নামে পরিচিত একজন ভারতীয় লেখক যিনি ইংরেজি ও মালয়লাম ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেছেন। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নারী, শিশু, রাজনীতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন। কেরালায় তার লেখা ছোটগল্প ও আত্মজীবনী ব্যাপক জনপ্রিয়। তাকে তার প্রজন্মের নারীমুক্তি আন্দোলননের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৩৪ সালের ৩১ মার্চ ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ প্রদেশের মালাবার জেলার পুন্নায়ুরকুলাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার পিতার নাম ভি. এম. নায়ার এবং মাতার নাম বালামণি আম্মা। কমলা নায়ার জন্মগ্রহণ করেছিলেন নায়ার পরিবারে।
তার পিতা ছিলেন বিখ্যাত মালায়ালাম সংবাদপত্র দৈনিক মাতৃভূমির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও মাতা দিলেন মালয়ালম ভাষার বিখ্যাত কবি । তার শৈশব কেটেছে তার বাবার কর্মস্থল কলকাতায়, যেখানে ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে সিনিয়র অফিসার পদে কর্মরত ছিলেন, এবং পুন্নায়ুরকুলাম গ্রামে পৈতৃক বাড়িতে। উল্লেখ্য কমলা নায়ার তাঁর মায়ের কাছ থেকেই লেখালেখির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

১৫ বছর বয়সে ব্যাংক কর্মকর্তা মাধব দাসের সাথে বিয়ে হয় তার। মাধব দাসের সাথে বিয়ের পর তার নাম হয় কমলা দাস। মাধব দাস তাকে লেখালেখি করতে অনুপ্রেরণা দিতেন। তিনি মালয়ালম ভাষায় ছোটগল্প ও ইংরেজিতে কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত। তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার কলাম লিখেছেন। তার লেখা কলামে ফুটে উঠেছে নারীদের বঞ্চনার কথা, ফুটে উঠেছে শিশু অধিকারের কথা, ফুটে উঠেছে রাজনীতির কথা। তিনি কলাম লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তার রচিত কাব্যগ্রন্থ সামার ইন ক্যালকাটা ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। বইটি সমালোচক ও পাঠকমহলে সমাদৃত হয়।

তিনি ৪২ বছর বয়সে তাঁর আত্মজীবনী My Story রচনা করেন। কমলা দাস রচিত আত্মজীবনী 'My Story' বইটির শুরুর অধ্যায়টিতেই বর্ণবৈষম্য-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। কেরালায় নায়ারদের উচ্চ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কেও তাঁর লেখায় উল্লেখ রয়েছে। কমলা নায়ার তাঁর লেখনীতে তাঁর স্কুলের পরিবেশ, শ্রেণী বৈষম্য, জাতপাতের ভেদাভেদ বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন।

এই পর্যায়ের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবনী বা আত্মজীবনী গুলি কেবলমাত্র নারীদের ব্যাক্তিগত জীবনের উপর আলোকপাত করেছ তাই নয় বরং সামাজিক ব্যধিগুলিকেও চোখের সামনে তুলে ধরেছে। কমলা দাস এর আত্মজীবনীতে ইতিহাস লেখার কোনো উচ্চ আদর্শ প্রতিভাত হয়নি। তবে কিছু সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর লেখনীতে উঠে এসছে। My Story তে কমলা দাস সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদের বাইরে গিয়েও নারী পুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারেও অকপটে লিখেছেন। তাঁর ভাষ্য মতে তাঁর বৈবাহিক জীবন খুব একটা সুখের ছিলনা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে খুব অল্প বয়সেই কিশোরী অবস্থায় তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন তিনি শরীর মানসে বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর চিন্তাভাবনা এবং সামাজিক ব্যাধিগুলি সম্পর্কে তাঁর বোধ অনেকাংশেই তৎকালীন সমাজ থেকে তাঁর পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রাখে।

মৌটুসী চক্রবর্তী যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে কমলা দাস রচিত My Story পাঠ করলে বোঝা যায় আমাদের বেশিরভাগ সামাজিক বাধা আসলে মানুষের মানসপটে সৃষ্টি বাধা স্বরূপ। কমলা দাস তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ সমাজের মাথাদের ঘৃণার পাত্রীতে পরিণত হন। বলাবাহুল্য, সমাজের মাথা অর্থাৎ উচ্চবিত্ত এবং উঁচু জাতের লোকজন বিভিন্ন রকমের সামাজিক নিয়ম কানুন মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েই তাদের প্রতিপত্তি বজায় রেখে এসেছে বছরের পর বছর। হঠাৎ সেই নিয়ম কানুনকে কেউ প্রশ্ন করে বসলে আসলে তাদের প্রতিপত্তিকেই বিপদের সম্মুখীন এনে ফেলা হয়। তবে অল্পবয়সী পাঠকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা অবশ্যই উল্লেখের পরিচয় রাখে। তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে তাঁর কাব্যিক দিকটি যেমন ফুটে ওঠে ঠিক একই ভাবে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক নিয়ম কানুনের খারাপ দিকগুলো এবং নারীদের উপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অত্যাচার এর কথাও তুলে ধরেছেন একাধিকবার।

তিনি কেরালা সাহিত্য আকাদেমির ভাইস চেয়ারপার্সন ছিলেন। এছাড়াও তিনি কেরালা ফরেস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারপার্সন, কেরালা চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি, পোর্ট্রেট সাময়িকীর সম্পাদ ও ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার পোয়েট্রি এডিটর হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় ইংরেজি কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে ধরা হয় তাকে। ২০০৯ সালে দা টাইমস তাকে দ্য মাদার অব মর্ডান ইংলিশ ইন্ডিয়ান পোষেটি বলে অভিহিত করে। ২০০৯ সালের ৩১ মে ৭৫ বছর বয়সে পুণের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

<u>সুধা মজুমদার:</u>

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগেও মেয়েদের স্কুলে গিয়ে শিক্ষালাভ করাটা অনেকক্ষেত্রেই অভাবনীয় ছিল। কেবলমাত্র শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরা ফরমাল এডুকেশনের সুযোগ পেতো বলা চলে। সুধা মজুমদার এরকমই এক উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার দরুণ ইংরেজি শিক্ষা লাভ করার সুযোগও পেয়েছিলেন তৎকালীন সময়ে। তবে উল্লেখ্য এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছিল তাঁর বাবার মুক্ত চিন্তাভাবনার জন্য। বলাবাহুল্য সুধা মজুমদারের বাবা তারাপদ ঘোষের চিন্তাভাবনা, পোশাক পরিচ্ছদ এমনকি খাওয়া দাওয়াতেও বিদেশী ছাপ ছিল স্পষ্ট। অন্যদিকে সুধা মজুমদারের মা ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী বাঙালি গৃহবধূ। তবে তিনি কোনোদিনই নিজের চিন্তাভাবনা তাঁর স্বামী বা মেয়ের উপর চাপিয়ে দেননি। সুধা মজুমদার তাঁর আত্মজীবনী 'Memoirs of an Indian Woman' গ্রন্থে তাঁর মা বাবার সম্পর্কে যথাযথ উল্লেখ করেছেন। একধারে তাঁর মা যেমন স্বেচ্ছায় সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলতেন এবং স্বামী বা সন্তানকে চাপ দিতেন না মানার জন্য ঠিক অন্যদিকে তাঁর বাবা একজন non conformist হিসাবেই অর্থাৎ যে সমাজের নিয়ম কানুনের সাথে সহমত পোষণ করে না এবং মানেনা, সেইভাবেই ফুটে উঠেছে মজুমদারের লেখনীতে। উল্লেখ্য, সুধা মজুমদারের মতে, তাঁর বাবা ছেলে বা মেয়ে সন্তানের মধ্যে কোনরকম পার্থক্য করতেন না। তবে মজুমদার তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেছেন যে তাঁদের বাড়িতে দুধরনের রান্নাঘর ছিল, একটি তাঁর মায়ের এবং অন্যটি বাবার। মায়ের রান্নাঘরটিতে ব্রাহ্মণ রাঁধুনি ছিল অন্যদিকে তাঁর বাবার রান্না করতেন একজন ইউরোপীয় খাবার বানাতে পারদর্শী পির মহম্মদ। তাঁর বাবার খাওয়ার সময় তাঁর মা উপস্থিত থাকলেও টেবিলে বসতেন না। উল্লেখ্য এখানে সামাজিক নিয়ম কানুন পালন করতে গিয়ে নিজেকে সরিয়ে রাখছিলেন সুধা মজুমদারের মা। কেবলমাত্র তাই নয়, মজুমদার লিখছেন তিনি যদি মুরগির মাংস খেতেন যা তৎকালীন সময়ে নিষিদ্ধ ছিল বিশেষ করে উঁচু জাতের বাঙালিদের মধ্যে

তাঁকে 'unclean' খাবার খাওয়ার জন্য সমস্ত জামাকাপড় পাল্টাতে হত তাঁর মায়ের ঘরে কিছু ছোঁয়ার আগে। তবে উল্লেখ্য এই খাবার কেবল অপবিত্র বা 'unclean' তাঁর জন্যই ছিল, তাঁর ছোট ভাইয়ের জন্য নয়।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সমাজের নিয়মের বেড়াজালে মেয়েরাই বারংবার জড়িয়ে থাকে। অবশ্যই তিনি এইধরনের দ্বিচারিতার সরাসরি বিরোধীতা না করলেও মহিলাদের প্রতি এরূপ ভিন্ন আচরণের ক্ষেত্রে বিরাগ প্রকাশ করেছেন।

সুধা মজুমদারের বিয়ে হয়েছিল একজন Civil Servant এর সাথে। বলাবাহুল্য তাঁর বৈবাহিক জীবন তাঁকে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছিল। খুব কাছ থেকেই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, বাল্যজীবন, মুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাঁর চিন্তাভাবনাকে অনেকাংশেই প্রভাবিত করেছিল। এছাড়াও জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছনে বিদ্যমান চিন্তাভাবনা এবং আদর্শের সাথে পরিচিত হওয়ায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আরও উন্নত হয়েছিল। তিনি পরিবারের মধ্যে এবং সমাজে নারী পুরুষ বৈষম্য সম্পর্কে অবগত হলেও সেটাকেই একমাত্র সারসত্য বা ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিতে নারাজ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে এবং তাঁর উত্তর সন্ধানের মধ্য দিয়ে সমাজের বাঁধাগতের নিয়ম যে মহিলারা কেবল অন্যদের মতামতকে মেনেই চুপ করে থেকে যাবে, প্রশ্ন করবেন না সেই বিষয়টিকে বারংবার চ্যালেঞ্জ করেছেন। যদিও তাঁর অভিব্যক্তি অনেকটাই ভিন্ন ছিল কমলা দাসের চেয়ে। মৌটুসী চক্রবর্তীর মতে, সুধা মজুমদারের সময়ে অতটাও দৃঢ়তার সাথে মনের ভাব প্রকাশ করা হত না, যতটা কমলা দাস তাঁর সময়ে করেছে।

সুধা মজুমদার পরবর্তীকালে মহিলা সমিতিতে যোগদান করেন এবং মহিলা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও তিনি International Labour Organization এর Women' Work কনফারেন্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেছিলেন।

<u>উপসংহার:</u>

ভারতীয় লেখিকারা দেশীয় ভাষা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় নিজেদের আত্মজীবনী রচনা করেছেন। বলা যায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে নারীদের আত্মজীবনীমূলক লেখার চল শুরু হয়। উল্লেখ্য নারীরা পুরুষদের লেখনী শৈলী অনুসরণ করেনি বরং তাদের জীবন কাহিনী বলার ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব শৈলী এবং কৌশল গড়ে তুলেছে। ভারতীয় মহিলারা তাদের জীবনী বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথা, ঔপনিবেশিক সময়ের কথা তুলে ধরেছেন বারংবার।

নারীর আত্মজীবনীমূলক কাহিনী গুলি শুধুমাত্র আত্ম-অন্বেষণ এর জন্য নয়, আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-পরিচয় গড়ে তুলেছে। আত্মজীবনী লেখার মাধ্যমে মহিলারা নিজেদের পরিচয় খোঁজার চেষ্টা করেছেন, পরিচয় গড়ে তুলেছেন। প্রথম দিকে আত্মজীবনী লিখেছিলেন এমন লেখিকার সংখ্যাই কম। কিন্তু পরবর্তীতে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে, আরও আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় যা মহিলাদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। মহিলাদের রচিত আত্মজীবনী থেকেই তৎকালীন সমাজে মহিলাদের পরিস্থিতি এবং তার পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। তথাকথিত পরিবর্তনশীল এবং প্রগতিশীল

সমাজেও 'নতুন নারী'রা কিভাবে শোষিত হয় সেই কথাও বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন লেখিকার আত্মজীবনী এবং জীবনীতে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

Feminism in India
Velivada
Wikipedia

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Dandapat Sourav, 'Understanding History: A Reading of Binodini Dasi's Autobiography', Journal of the Department of English, Vidyasagar University Vol. 12, 2014-2015

2. Dasi Binodini, My Story and My Life as an Actress, ed. and translated by Rimli Bhattacharya, Kali for Women, New Delhi, 1998.

3. "I, Phoolan Devi – The autobiography of India's Bandit Queen" https://velivada.com/2011/12/21/i-phoolan-devi-the-autobiography-of-indias-bandit-queen/

4. Phoolan Devi with Marie-Therese Cuny and Paul Rambali, The Bandit Queen of India: An Indian Woman's Amazing Journey from Peasant to International Legend, THE LYONS PRESS, Guilford, Connecticut An imprint of The Globe Pequot Press, 2003

5. Chakravartee Moutushi, 'Isolation, Involvement And Identity Indian Women As Autobiographers', Indian Literature , May - June 1995, Vol. 38, No. 3 (167) (May - June 1995), pp.139-151,Sahitya Akademi

6. Lavanya H M, The Theme of Exploring Self in Indian Women Autobiographies, International Journal of Creative Research Thoughts Vol 9 Issue 3 March 2021

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. How some eminent women in 19th and 20th c India have portrayed themselves?

2. Discuss autobiographies and biographies of some eminent women in 19th and 20th c India

3. How did women try to question norms of patriarchal society through their writing?

পর্যায় গ্রন্থ - ৮

WOMEN AND CULTURE

একক - ২

(i) Films

(ii) Theatre

গঠন (Structure) :

৮.২.০ : উদ্দেশ্য

৮.২.১ : থিয়েটারে নারী

৮.২.২ : চলচ্চিত্রে নারী

৮.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৮.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৮.২.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। প্রথম যুগে থিয়েটারে নারীর ভূমিকা ও প্রতিবন্ধকতা।

২। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থায়

৮.২.১ : থিয়েটারে নারী

আমাদের দেশে থিয়েটারী অভিনয় শুরু হয় বিদেশী রঙ্গালয় থেকে। রঙ্গালয়গুলি ছিল পেশাদার। অভিনয়ের জন্য টিকিট বিক্রি করা হতো। শিল্পীদেরও নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়া হতো। প্রথম দিকে মঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু মিসেস ব্রিস্টোর সময় থেকে মঞ্চেঅভিনেত্রীরা প্রবেশ করতে পারল। কলকাতায় যেসব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পার্কার, স্টোকলার, ব্যারী, মিসেস ব্রিস্টো, মিসেস লীচ, মিসেস ডীক্‌ল্‌ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তখনকার নানা পত্রিকায় 'ইংলিশম্যান', 'বেঙ্গল হরকরা' ইত্যাদিতে অভিনয়ের মান সব সময়ে উন্নত স্তরে পৌঁছতে সাহায্য করত।

বিদেশী রঙ্গালয়ের এই অভিনয় ধারা সম্পর্কে বাঙালী দর্শকদের মনে নতুন বোধ ও ধারণা জাগল। বিদেশী রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নামকরা অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি ছিলেন, যেমন — দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত ইত্যাদি। কিন্তু তখনো বাংলা থিয়েটারী অভিনয়ের প্রবর্তন হয়নি। অথচ ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ফলে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অনেক বাঙালীরই পরিচয় ঘটে গিয়েছিল। যা বাঙালীকে থিয়েটারে সার্বিকভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

যে থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয়েছিল তার নাম গেরাসিম লেবেডেফের The Bengali Theatre. ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর এবং ১৯৭৬ সালের ৩ রা মার্চ The Disguise নাটকটির বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' নামে অভিনীত হয়েছিল। নাটক ও অভিনয় তারপর থেকে এমন সর্বব্যাপক আকারে শিক্ষিত ও ধনপতি বাঙালীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল যে নাট্যশালা ও অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত নন এমন বাঙালী তখন ছিল না বললেই হয়। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তি বিভিন্ন থিয়েটার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তখনো কোনো বাঙালী মহিলা থিয়েটারে পেশাদারী ভাবে অভিনয়ে নামেননি। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে নারী-পুরুষের অভিনয়ের প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে তাঁদের পুত্র, কন্যা, বধূ, পুত্রবধূ, জামাতা অনেকেই অভিনয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। যেমন শরৎচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনেতা রূপে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। 'শকুন্তলা' নাট্যাভিনয়ে শকুন্তলার ভূমিকায় তাঁকে মানিয়েছিল চমৎকার। শর্মিষ্ঠা

নাটকে শরৎচন্দ্র ঘোষ শুক্রাচার্য শিষ্য কপিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু স্ত্রী-ভূমিকায় অল্পবয়স্ক ছেলেরা অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেছিল। বোধহয় গিরিশচন্দ্র ছাড়া সব নামকরা অভিনেতারাই কোন না কোন স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করে সবচেয়ে খ্যাত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গিরিশ চন্দ্র কিন্তু অভিনেত্রীর পক্ষে পুরুষ ভূমিকায় অভিনয় সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলেছেন 'যে রূপবদলের দ্বারা স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় ভালো হয় না, পুরুষ চরিত্রের অভিনয়ও সেইরূপ স্ত্রীলোক দ্বারা অসম্পূর্ণ হয়'।

সাধারণ নাট্যশালার প্রথম যুগে বিনোদিনী (১৮৭৪-১৮৮৬) অভিনেত্রীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যশস্বিনী ছিলেন। বিনোদিনী যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন, তখন সবেমাত্র স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী নেওয়া শুরু হয়েছে। বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৩এ জগত্তারিনী, গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী এবং শ্যামা নামে চারজন অভিনেত্রীকে নিয়োগ করা হয়েছিল। বিনোদিনী যখন গ্রেট ন্যাশানালে অভিনয় করতে যান তখন যাদুমণি, ক্ষেত্রমণি, নারায়ণী, লক্ষ্মীমণি, কাদম্বিনী এবং রাজকুমারী। বিনোদিনীর প্রথম অভিনয় শত্রুসংহার অর্থাৎ বেনীসংহার নাটকে (১৮৭৪)। এতে তিনি অভিনয় করেন দ্রৌপদীর পরিচারিকার ভূমিকায়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১১/১২ বছর। এ নাটকে ভাল অভিনয়ের কারণে পরবর্তী নাটক হেমলতায় একেবারে নায়িকার ভূমিকা লাভ করলেন। এরপর কলকাতায় গ্রেট ন্যাশানালে অভিনয় করলেন। রোমান্টিক নায়িকার ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন। 'নবীন তপস্বিনী'র কামিনীর ভূমিকায়, 'লীলাবতী' নাটকে লীলাবতীর ভূমিকায়, 'নীলদর্পণ' নাটকে সরলতার ভূমিকায়, 'শরৎ সরোজিনীর' সরোজিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'আদর্শ সতী', 'কনক-কাকন', 'আনন্দ লীলা', 'কামিনী কুঞ্জ' প্রভৃতি গীতিনাট্যে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অভিনয় করেছেন 'সধবার একাদশী' (কাঞ্চন), 'কিঞ্চিত জলযোগ', 'চোরের ওপর বাটপাড়ি' প্রভৃতি প্রহসনে। বিনোদিনী ১৮৭৪, ডিসেম্বর - ১৮৭৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৭৬ ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭ জুলাই এই কয়েকমাস বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারেই তাঁর অভিনয় শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। তাঁর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিল দর্শকরা। তখন বিনোদিনী যৌবনে প্রবেশ করেছেন, বয়স চোদ্দ। দেহের যৌবন, লাবণ্য, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব — অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনশক্তি তাঁকে আবেগসমন্বিত জটিল অভিনয়ে উপযোগী করে তুলেছে। বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিনোদিনী। হয়েছেন আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, মনোরমা প্রভৃতি। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে প্রমীলা চরিত্রের অভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও গীতিনাট্যগুলির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য গীতেও তাঁকে অংশ নিতে হয়েছে। পৌরাণিক নাটকগুলিতে তাঁর বিপরীতে নায়ক হয়েছিলেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। ১৮৮৩ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের শেষ পর্যায়। তখন যুক্ত ছিলেন স্টার থিয়েটারে। তাঁর অভিনয়ের নতুন সাক্ষ্য পাওয়া গেল ভক্তিরসাত্মক চরিত্রের অভিনয়ে যেমন চৈতন্য (চৈতন্য লীলা), প্রহ্লাদ (প্রহ্লাদ চরিত্র), নিমাই (নিমাই সন্ন্যাস), গোপা (বুদ্ধদেব চরিত্র), চিন্তামণি (বিল্বমঙ্গল ঠাকুর) প্রভৃতি ভূমিকায়। বিষাদময়, আবেগসমন্বিত অভিনয়ের প্রমাণ মেলে সতী (দক্ষযজ্ঞ), দময়ন্তী (নল+দময়ন্তী), পদ্মাবতী (বৃষকেতু), খুল্লনা (কমলে কামিণী), সত্যভামা (প্রভাসযজ্ঞ) ইত্যাদি চরিত্রে।

হাস্যরসাত্মক অভিনয়েও বিনোদিনী ছিলেন সমান পারদর্শী। এই ধরনের অভিনয়ের নজির মেলে বিলাসিনী কার মা (বিবাহ বিভ্রাট), রঙ্গিনী (বেল্লিক বাজার) প্রভৃতিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই রঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনয়ের পরেই রঙ্গভূমি থেকে চির বিদায় নিলেন অভিনয়ের এই সম্রাজ্ঞী। দীর্ঘ বার বছর দর্শক চিত্তকে ভরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভার মাধ্যমে।

বিনোদিনী নাটক শিক্ষা করেছিলেন। তাই বোধহয় এতো রকমের বৈচিত্র্যময় চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরেছিলেন তিনি। বিনোদিনী নিজের স্মৃতিকথায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে শিক্ষালাভের কথা স্বীকার করেছেন। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী, মহেন্দ্র লাল বসু, অমৃত লাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বিনোদিনীকে অভিনয় শিক্ষার সঙ্গে গীত ও নৃত্যও শিক্ষা করতে হয়েছিল। বাল্যবয়সে তাঁদের বাড়ির ভাড়াটিয়া গঙ্গামণির কাছে শিখেছিলেন গান। তবে সঙ্গীতে তাঁর উচ্চাঙ্গের পারদর্শিতা ছিল। বিনোদিনীর অভিনয়ের সঙ্গে তাঁর নৃত্যও দর্শকদের অভিভূত করেছে। গভীর ভাবরসাত্মক অভিনয়ের সঙ্গে পরিপূরক নৃত্যকলাকে যুক্ত করে দিয়েছিলেন যা দর্শকদের বিমুগ্ধ করেছিল।

বিনোদিনীর অসামান্য অভিনয় দক্ষতার মূলে ছিল তাঁর একাগ্র সাধনা ও অনলস অধ্যাবসায়। বিনোদিনীর অভিনয় নৈপুণ্যের মূলে ছিল অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গীণ একাত্মতা।

বিনোদিনীর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল। রূপসজ্জা ও পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান প্রণালীতে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা। অঙ্গপ্রসাধন ও বস্ত্রসজ্জা নিজেই করতেন। শুধু তাই নয় অপরের প্রসাধন ও সাজসজ্জাতেও তিনি সাহায্য করতেন। 'নল-দময়ন্তী'-র অভিনয়ের আগে নলের অঙ্গপ্রসাধন তিনিই করে দিতেন।

বিনোদিনীর মৃত্যু বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারে এক অন্যরকম শূন্যতা তৈরি করেছিল। তাঁর করুণ মৃত্যুতে মিশেছিল মানুষের লোভ, লালসা, প্রতারণা, অকৃতজ্ঞতা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা। সাধারণ নাট্যশালার প্রথম যুগে বিনোদিনী অভিনেত্রীদের মধ্যে সে সর্বাপেক্ষা যশস্বিনী হয়েছিলেন সে কথা আজও নির্দ্বিধায় বলা যায়।

বাংলা থিয়েটারের অপর উজ্জ্বল অভিনেত্রী হলেন তিনকড়ি (১৮৭০-১৯১৭)। ভক্তিরসাত্মক নাটকে এবং মধুর ও কোমলভাব পরিস্ফুটনে বিনোদিনী ছিলেন অদ্বিতীয়া এবং ঘাত প্রতিঘাত পূর্ণ ট্রাজিক নাটকে তীব্র জ্বালাময় ভাব প্রকাশে তিনকড়ি ছিলেন অতুলনীয়া। বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবার পরেই তিনকড়ি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন। চেহারার কমনীয় মাধুর্যে, কণ্ঠস্বরের সুললিত লাবণ্যে, সংযত গাম্ভীর্যে বিনোদিনী ছিলেন খাঁটি ভারতীয় নারী। কিন্তু চেহারার দীর্ঘতা ও রঙের ঔজ্জ্বল্যে, কণ্ঠস্বরের মার্জিত, উচ্চনাদী ওজস্বিতায়, মুখভঙ্গি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের তীব্রতায়, বীর-রৌদ্র ও করুণ রসের মিশ্রিত উপাদানে তিনকড়ি পাশ্চাত্য নারীর সমতুল্য ছিলেন। বিনোদিনীর মত তিনকড়িও ছিলেন গিরিশচন্দ্রের শিষ্যা। অভিনয়ের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ থাকলে কিভাবে ধাপে ধাপে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্তরে ওঠা যায় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনকড়ি। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে 'রাবণ-বধ' নাটকের অভিনয় দেখে তাঁর অভিনয়ের সখ জন্মায়। 'বিল্বমঙ্গল' ও 'বিবাহ-বিভ্রাটে' দুটি নির্বাক ভূমিকা পেলেন। কিন্তু স্টার থিয়েটারে একবছর ধরে তাঁকে শুধু শিক্ষানবিশিই করতে হয়েছিল। তারপর একটি প্রাইভেট

থিয়েটারে কিছুকাল তিনি অভিনয় করেছিলেন। সেখান থেকে এলেন বীণা থিয়েটারে। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৮ তিনকড়ির অভিনেত্রী জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। 'আবুহোসেনে' দাইয়ের ভূমিকায় নৃত্যগীতে তিনি সকলকে মাতিয়েছিলেন। 'পাণ্ডব গৌরবে' সুভদ্রার ভূমিকায় বিচিত্র অভিনয় ভঙ্গিমার 'ধিয়া তাধিয়া বনমালী' গানখানি গেয়ে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছিলেন তিনকড়ি। সেজন্য তাঁর অভিনয়ে ও গানে সংলাপ ও সঙ্গীত সমান রসাশ্রিত হ'ত। তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা চরিত্রে তিনকড়ির অভিনয় শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদী সম্মত। তিনকড়ির সবচেয়ে প্রশংসা-ধন্য দুটি অভিনয় হল লেডী ম্যাকবেথ ও জনার ভূমিকায় ট্র্যাজিক রসাত্মক অভিনয়। লেডী ম্যাকবেথের অভিনয় করেই বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জনার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি স্বয়ং নাট্যকারের পরিকল্পনাকেও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

সর্বশেষে বলা যায় দু একটি ক্ষেত্রে তাঁর দুর্বলতাও ছিল। সামাজিক নাটকে, ভক্তিরসাত্মক অভিনয়ে তিনি তেমন উৎকর্ষ দেখাতে পারেননি। দুর্দম প্রবৃত্তিতে বিক্ষুব্ধ ও প্রচণ্ড শোকের আঘাতে জর্জরিত যে অভিনয়, তাতে তাঁর প্রতিভা উল্লসিত হয়ে উঠত।

গিরিশ যুগের তিন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অন্যতমা হলেন তারা সুন্দরী (১৮৭৮ ? - ১৯৪৮)। বীর ও রৌদ্র রস সৃষ্টিতে তিনকড়ি ছিলেন অদ্বিতীয়া ; কিন্তু শৃঙ্গার ও করুণ রসে তারা সুন্দরী ছিলেন অনুপমা। তারা সুন্দরীর অভিনেত্রী জীবন শুরু হয়েছিল স্টার থিয়েটারে। অরোরা থিয়েটারে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের পূর্ণতম সিদ্ধি ঘটেছিল রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করে। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফীর শিক্ষায় জহরা, আয়ষা প্রভৃতির ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। 'আলমগীর' নাটকে উদিপুরীর অভিনয় তাঁকে অন্যরকম জায়গা করে দেয়। এছাড়াও 'হরিশচন্দ্র' নাটকে শৈব্যার ভূমিকা, 'হারানিধি' নাটকে হেমাঙ্গিনী, 'প্রফুল্ল' নাটকে জ্ঞানদা, 'বিবাহ বিভ্রাটে' বিলাসিনী কারযার মা, 'গৃহলক্ষ্মী'র বিরজা চরিত্রে অভিনয় তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এছাড়াও ঐতিহাসিক কয়েকটি বীরাঙ্গনা চরিত্রে, যেমন — চাঁদবিবি, লক্ষ্মীবাঈ, জাহানারা, মহামায়া ইত্যাদিতে অভিনয় করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যে চরিত্র বিপরীত প্রবৃত্তির ঘাত প্রতিঘাতে সক্রিয় ও অস্থির সেই ধরনের অভিনয়ে তারা সুন্দরী ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

গিরিশ যুগের তিন প্রধান অভিনেত্রী ছাড়াও সুকুমারী দত্ত, ক্ষেত্রমণি, কুসুমকুমারী, সুশীলাবালা ছিলেন উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী। কুসুমকুমারী 'আলিবাবা' গীতিনাট্যে অসাধারণ পটুতা দেখিয়েছিলেন। তিনি থিয়েটারের প্রথম নারী নৃত্য শিক্ষিকা ও নৃত্য পরিচালিকা। সুশীলাবালা 'হারানিধি' নাটকে হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন।

শিশির-অহীন্দ্র যুগের সবচেয়ে শক্তিশালিনী অভিনেত্রী হলেন কৃষ্ণভামিনী। কৃষ্ণভামিনী প্রায় সব নাটকেই প্রধান স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটক 'ইরাণের রানী' তে রানীর ভূমিকায় অভিনয় হয়েছিল অতিচমৎকার। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের বীরত্ব, তেজস্বিতা দর্শককে মুগ্ধ করেছিল।

নাচে গানে চৌখস অভিনেত্রী ছিলেন নীহারবালা। নীহারবালা ট্র্যাজেডি, কমেডি, ফার্স, গীতিনাট্য,

নৃত্যনাট্য সবরকম নাটকেই অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। চণ্ডীদাস নাটকে রামীর ভূমিকায়, গৃহপ্রবেশে হিমির ভূমিকায়, শ্রীকৃষ্ণ নাটকে অস্তির ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নীহারবালা কয়েকটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সেগুলিতে নটেরই প্রাধান্য ছিল। তাছাড়াও এই সময়কার উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী ছিলেন প্রভাদেবী, সরযূদেবী প্রমুখ।

আধুনিককালের নবনাট্য আন্দোলনে বহু প্রতিভাবান অভিনেত্রী আত্মপ্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে তৃপ্তি মিত্র অন্যতমা। তিনি মাঝে মাঝে পেশাদার মঞ্চে অভিনয় করেছেন। কিন্তু বহুরূপী প্রযোজিত অভিনয়গুলিতেই তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখা গেছে। 'নবান্ন' নাটকে বিনোদিনী চরিত্রে 'ছেঁড়াতারে' ফুলজানের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। যদিও গলাটাকে হঠাৎ স্যাঁতসেঁতে করে দেওয়া তৃপ্তি মিত্রের এক অদ্ভুত মুদ্রাদোষ হিসেবে বিবেচিত হতো।

তৃপ্তি মিত্রের সুযোগ্য কন্যা শাঁওলী মিত্র থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। সায়ক প্রযোজিত 'যদিও স্বপ্ন' নাটকে হোটেল মালিকের মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ে তাঁর দুর্ধষ ব্যক্তিত্ব, প্রচণ্ড দাপট তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় থিয়েটারে নারী, পুরুষের সঙ্গে তাল রেখে স্বতন্ত্র এক জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। চিত্রা সেন, অপর্ণা সেন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সরযূদেবী, জয়শ্রী সেন থিয়েটারের ধারাকে বর্তমানে আরো সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছে।

৮.২.২ : চলচ্চিত্রে নারী

শিল্প মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র বয়সে নিতান্ত নবীন। প্রযুক্তির অগ্রগতির দ্বারা মানুষের নান্দনিক জগৎ কতটা বিস্তৃত হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল চলচ্চিত্র। বর্তমান কালে চলচ্চিত্রের প্রভাব প্রায় সর্বব্যাপী এবং সুদূরপ্রসারী। প্রযুক্তির নিত্য নতুন উদ্ভাবন এর সীমানা ও সম্ভাবনাকে প্রতিনিয়তই বিস্তৃততর করে তুলছে। আগে যেভাবে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হত তার সঙ্গে বর্তমানে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ধরন একেবারেই বদলে গেছে। এখন ঘরে বসেই চলচ্চিত্রের স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি। বৈদ্যুতিক মাধ্যম থেকে চলচ্চিত্রের প্রযুক্তি বৈদ্যুতিনে রূপান্তরের ফলেই এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে, প্রাথমিক ভাবে এটাই বলা চলে। উপস্থাপনার আঙ্গিক, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের পাশাপাশি এর বিষয়বস্তু, অভিনয়ধারা, মূল্যবোধের প্রেক্ষিত এসমস্ত কিছুতেও পরিবর্তন এসেছে। ভারতীয় নারীদের অবস্থানগত পরিবর্তনের দিকটিও এই চলচ্চিত্রে তাই ধরা পড়ে। সাহিত্যের ন্যায় চলচ্চিত্রও তাই সমাজের চলমান দর্পণ হিসেবে প্রতিভাত হয়।

বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী এডিসন ১৮৯০ সালে চলমান বস্তুর ছবি তোলার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বলা যায়, এই আবিষ্কার চলচ্চিত্র শিল্পের আবির্ভাবের সম্ভাবনা উসকে দিয়েছিল। যদিও চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ১৮৯৫ সালকে এর সূচনা কাল হিসেবে ধরা হয়। ঐ বছর ফ্রান্সের দুই ভাই লুই এবং অগস্ত ল্যুমিয়ের চলচ্চিত্রের প্রযুক্তির আবিষ্কার করেন এবং সর্ব সমক্ষে তা প্রদর্শন করেন। অবশ্য

চলচ্চিত্রে যে প্রজেক্টর যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তার আবিষ্কর্তা ইংলণ্ডের রবার্ট ফ্রীজ গ্রীন। যদিও জীবদ্দশায় গ্রীন নিদারুণ অবহেলার শিকার হয়েছেন। শীতের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে হাইড পার্কের বেঞ্চিতে। তাঁর আবিষ্কার শিল্প-প্রযুক্তির ইতিহাসে কী বিপ্লব এনে দিয়েছে তা যদি তিনি দেখে যেতে পারতেন। যাইহোক, ইউরোপের চলচ্চিত্র শিল্পের প্রযুক্তি অচিরেই ভারতের মাটিতে পা রাখল।

১৮৯৬ সালে কলকাতার স্টার থিয়েটারে প্রথম দেখানো হল চলচ্চিত্র, যা সে সময় বায়োস্কোপ নামে পরিচিত ছিল। ঐ বছরই হীরালাল সেন 'দি রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানী' স্থাপন করলেন। হীরালাল সেন ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পরবর্তী সময়ে কিছু ছবিও তোলেন। আরও নানা কারণে হীরালাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। ক্ল্যাসিক থিয়েটারে ১৯০১ সালে তিনি বায়োস্কোপ দেখানোর বন্দোবস্ত করেন। বস্তুতঃ জে. এফ. ম্যাডানের কলকাতা ময়দানে তাঁবু ফেলে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থার পূর্বেই একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করেন হীরালাল সেন। শুধু তাই নয় ১৯০৩ সালে প্রথম বিজ্ঞাপনী চিত্র তোলার গৌরবও তার প্রাপ্য। এইভাবে ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের ইতিহাস অগ্রসর হচ্ছিল। আধুনিক মানে যাকে পূর্ণ দৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র বলা হয় তা তখনও তৈরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তৈরী হয় বিশ শতকের প্রথম দশকে।

১৯০৯ সালে ফ্রান্সে প্রথম পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র তৈরী হয়। ভারতবর্ষে ধুন্দি রাম গোবিন্দ ফালকে (যিনি দাদা সাহেব ফালকে নামে সমধিক পরিচিত) ১৯১৩ সালে প্রথম কাহিনী চিত্র নির্মাণ করেন। হিন্দি ভাষায় নির্মিত এই কাহিনী চিত্রটির নাম 'রাজা হরিশচন্দ্র'। আর ১৯১৭ সালে বাংলায় রুস্তমজী ধোতিয়াল প্রথম কাহিনী চিত্র 'বিল্বমঙ্গল' তৈরী করেন। তবে এসমস্তই নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। প্রথম বাংলা নির্বাক চিত্র 'নল দময়ন্তী' ঐ বছরই মুক্তি পায়। প্রথম সবাক চিত্র 'আলমআরা' হিন্দি ভাষায় নির্মিত হয়ে মুক্তি পায় ১৯৩১ সালে। আর ঐ বছরই বাংলা ভাষায় সবাক চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী' মুক্তি পেয়েছিল। এর পরিচালনা করেছিলেন অমর চৌধুরী। আর পূর্ববর্তী 'আলম আরা'র পরিচালক ছিলেন আদ্রেশ্বর ইরানি।

তথ্যচিত্র, কাহিনী চিত্র, চলচ্চিত্র-চিত্র শিল্পের তিন চলমান ধারার ক্রমশঃ পুরিপুষ্টি ঘটতে থাকে। ভারতে প্রথম তথ্যচিত্রও তুলেছিলেন হীরালাল সেন। ১৯১১ সালে তিনি তৈরী করেন 'দিল্লীর দরবার' নামক তথ্য চিত্রটি। শুধু চলচ্চিত্র নির্মাণ নয়, এর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করাও জরুরী ছিল। তাছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে এই চিত্র নির্মাণ করা দরকার হয়ে পড়ছিল। জে. এফ. ম্যাডাল ১৯১৭ সালে এল ফিনস্টোন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন; যা বর্তমানে চ্যাপলিন হল নামে খ্যাত। ১৯১৮ সালে ম্যাডান থিয়েটার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালে ধীরেন্দ্রনাথ সরকার নিউ থিয়েটার্স স্থাপন করেন। ফিল্মে আঙ্গিক ও উপস্থাপনাগত দিক দিয়েও নতুন নতুন সংযোজন হতে থাকে। যেমন নেপথ্যে সংগীত সংযোজন ১৯৩৫ সালে নীতিন বসুর ভাগ্যচক্র ছবিতে প্রথম নেপথ্য গায়ন ব্যবহৃত হয়। হীরেন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পাশাপাশি সুপ্রভা সরকার, পারুল বিশ্বাস, কাননদেবীর কণ্ঠ শোনা যেতে থাকে। এর মধ্যে কাননবালা দেবী অভিনয়ের জগতে কৃতিত্বের সঙ্গে বিচরণ করতে থাকেন।

কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের নির্মাণ, প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন উপস্থাপনা ও অন্যান্য প্রযুক্তির উন্নতি সাধনই নয়, চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু বক্তব্য ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ বা নজরদারি জরুরী হয়ে ওঠে। এই শিল্পের সুবিধা, প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য টি রঙ্গচারী কমিটি গঠন করা হয় ১৯২৭ সালে। অবশ্য এর পূর্বে ১৯২০ সালেই সেন্সর বোর্ডের জন্ম হয়ে গেছে, যদিও তার কাজকর্মের বর্তমান রূপটি তখনও দেখা যায়নি। নির্মিত চলচ্চিত্রকে শ্রেণীবিভাজিত করে তার বক্তব্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে 'U' 'A/U', 'A' প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করে শংসাপত্র প্রদান শুরু হয় ১৯৪৯ সাল থেকে। সে বছর সদ্য স্বাধীন সরকার 'ফিল্ম এনকোয়ারি কমিটি' গঠন করে। এবং এর পরের বছরই ফিল্ম ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার জন্ম হয়। অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে চলচ্চিত্র নিয়ে যে আগ্রহ ছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাতে বাধা পড়েনি।

চলচ্চিত্রের প্রথমযুগের ইতিহাসটি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি প্রাথমিক ভাবে এটি একটি পুরুষ প্রধান জীবিকা ছিল। আয়োজক, মালিক, পরিচালক সমস্ত ক্ষেত্রে পুরষরা প্রায় একশোভাগই অধিকার করে রেখেছিল (অর্থাৎ অভিনয়ের দিকটি ব্যতিরেকে যদি এই শিল্পের নির্মাণগত প্রেক্ষিতটি পর্যালোচনা করি, তাহলে সেখানে একটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ছবিকেই আমরা স্পষ্ট হতে দেখি।) ভারতীয় চলচ্চিত্রের মধ্যেও এই ছবিটিই বারবার ফুটে উঠেছিল। প্রথম মহিলা পরিচালক হিসেবে আমরা যাকে পাচ্ছি তিনি হলেন প্রতিভা শাসমল। ১৯৪৬ সালে তিনি 'নিবেদিতা' নামক চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রথমদিকে অভিনেত্রীদের অনেকেই দেহোপজীবীনী ছিলেন। তথাকথিত ভদ্রঘরের মহিলারা অভিনেত্রী হতে চাইতেন না। যদিও সে সময় মঞ্চে কিন্তু অনেক অভিনেত্রী দাপটের সঙ্গে অভিনয় করছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় অভিনয়ে মহিলাদের নিয়ে আসার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। গত শতাব্দীর বিশের দশকে ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি ডি জি নামে সর্বাধিক পরিচিত, ইন্দো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যে ছবিগুলি পরিচালনা করলেন তার মধ্যে নারীপ্রধান চরিত্রের দিকে একটি ঝোঁক দেখা গেল। যেমন 'দি লেডিটিচার', 'দি স্টেপ মাদার' ইত্যাদি। এই ডিজিই তাঁর স্ত্রী প্রেমলতিকা দেবীকে প্রথম অভিনয়ে নিয়ে আসেন। সমসাময়িক আরও একজন অভিনেত্রীকে তিনি ফিল্মে আনেন ইনি হলেন মনিকা গাঙ্গুলী। এর পর ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে অভিনয়ে আমরা মহিলাদের অনুপ্রবেশ দেখতে পাই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পরিচালক মধু বসুর প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী স্ত্রী সাধনা বসু। 'রাজনর্তকী (১৯৪১) ন্যায় চলচ্চিত্রে সাধনা বসুর অবিস্মরণীয় অভিনয়ের স্বাক্ষর দেখা যায়। তবে এখানে একটি কথা বলার, আধুনিক চলচ্চিত্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রেক্ষিত এবং অভিনয়ের আঙ্গিক প্রত্যক্ষ হয়, তখনকার দিনের চলচ্চিত্রে তা লভ্য ছিল না। বরং কিছুটা কৃত্রিমতা সে সময়ের আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য ছিল। অবশ্য এর পেছনে তৎকালীন দেশীয় প্রযুক্তিরও একটি ভূমিকা ছিল বলা যেতে পারে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র একটি পরিবর্তমান সমাজ বাস্তবকে প্রতিফলিত করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে সাংগঠিক, আঙ্গিক তথা উপস্থাপনা, বক্তব্য বিষয়, ইত্যাদি সমস্ত কিছুর মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত তথা বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ভারতের

স্বাধীনতা প্রভৃতি ঘটনার সুস্পষ্ট প্রভাব ভারতীয় চলচ্চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব নারীদের উপরেও যথেষ্ট ছিল। ভারতীয় সিনেমার পর্যালোচনায় সেটিও যে ধরা পড়ে একসময় বলাই বাহুল্য।

চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রথমপর্বের ছবিগুলি একটি রক্ষনশীল সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরেছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কাহিনী মূলতঃ চিত্রে বাঁধা পড়ছিল। যদিও সামাজিক বিষয় যে আসেনি তা নয়। ১৯১২ সালে দাদা সাহেব ফালকে করেছিলেন রাজা হরিশচন্দ্র। ১৯১৯শে তৈরী হয় 'বিল্বমঙ্গল'। পরবর্তী যে চিত্রগুলি নির্মিত হয়েছিল সেগুলি হল— 'বিষবৃক্ষ' (১৯২২), 'শিবরাত্রি', 'প্রফুল্ল' (১৯২৬), 'চন্ডীদাস' (১৯২৭), 'জানা' (১৯২৭), সরলা (১৯২৮), 'কাল পরিণয়' (১৯৩০) ও 'নৌকাডুবি' (১৯৩০)। ১৯৩১ সালে তৈরী হল 'চাষার মেয়ে'। এর পরবর্তী সময়ে কিন্তু সামাজিক বিষয় প্রধান চলচ্চিত্রের দিকেই ঝোঁক বেড়ে যায়। প্রমথেশ বড়ুয়ের 'দেবদাস' (১৯৩৫) এই পর্বে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। বাস্তব পরিমিত, অভিনয়ের সঙ্গে রোমান্টিক মাদকতা, যা চলচ্চিত্রকে ঘিরে রেখেছিল দীর্ঘকাল, (বর্তমানেও যার ব্যপ্তি) তাকে সুপ্রতিষ্ঠত করলেন তিনি। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে প্রযোজিত চলচ্চিত্রের সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পেল; তেমন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ও ভূমিকার নানাদিক চলচ্চিত্রে উঠে এল। ১৯৪৬ সালে যেখানে মোট ১৫টি ছবি প্রযোজিত হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে হল ৩৩টি প্রযোজনা, ১৯৪৮ এ হল ৩৭টি আর তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়াল ৬২টিতে। চলচ্চিত্রের এই উর্দ্ধগামী সংখ্যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে এই মাধ্যমটি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ কিরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' (১৯৬০) পঞ্চাশের দশকে নারীর সংগ্রামকে তুলে ধরল। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া গেল এই ছবির মধ্যে। সত্যজিৎ রায় তাঁর 'মহানগর' (১৯৬০) এ নারীর এই সংগ্রামের ছবিটিকে ধরেছেন। ক্রমশঃ পারিবারিক ঘেরাটোপ ছেড়ে বৃহত্তর পেশাগত জীবনে পা-রাখছে মেয়েরা। পরিবর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নারীর এইভাবে বেরিয়ে আসা যে অনিবার্য হয়ে পড়ছিল তা সত্যজিতের ছবি তুলে ধরল। আবার পাশাপাশি 'পথের পাঁচালী'র (১৯৫৫) অনবদ্য নির্মাণে ধরা পড়ল আবহমান ভারতের একটি গ্রামজীবনের ছবি, যেখানে নারীর অবস্থান নানা টুকরো টুকরো ফ্রেমে ধরা পড়েছে। বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণের প্রান্তিক জীবনের ছবি — বৃদ্ধা বিধবা মহিলাদের করুণ অবস্থাকে চিত্রিত করল। আবার এই বৃদ্ধা ইন্দির ঠাকরুণ আর দুর্গা একই ফ্রেমে বাঁধা পড়ে গেল যখন ছোট্ট অপু পড়াশোনার আয়োজনে প্রথম যুক্ত হয়। ছবিটি মোটামুটি এই রকম, বাবা-মায়ের তুমুল উৎসাহের মধ্যে অপু পাঠরত, আর সে সময় দুর্গা ইন্দির ঠাকরুণের সঙ্গে গল্প করছে কিংবা খেলা করছে। অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার আয়োজনের এই যে পার্থক্য - ভারতের নারীর শিক্ষায় পশ্চাদ্‌পদতা বা সামাজিকভাবে অবনমিত অবস্থানকে স্পষ্ট করে।

ভারতীয় নারীর পোশাক-আশাক, আচার-আচরণ যেভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্রে ধরা পড়েছে তাও আমাদের কাছে ভারতীয় নারীর অবস্থানটি স্পষ্টতর করে তোলে। বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কারণে দেখা যায় ভারতীয় চলচ্চিত্রে নারীকে অনেকটাই খোলামেলা পোশাক বা পশ্চিমী পোশাক পরতে হয়। অথচ

দেখা যায় জিনস্-টপ পরা ভারতীয় নারীই কিন্তু আচার-আচরণে নিতান্ত ভারতীয়। তার মাথায় সিঁদুর, তার প্রণামের ঘটা, তার সহজাত রক্ষণশীলতা এই সমস্ত কিছুই একান্ত ভারতীয়। অর্থাৎ অন্তঃস্থলে একধরনের রক্ষণশীল সমাজ কাঠামোকে ধারণ করে রাখে নারীরা। যদিও সেই কাঠামোর নির্মাণ মূলতঃ পুরুষদের হাতে। সেকারণেই 'একদিন প্রতিদিন' চলচ্চিত্রে দেখি, মেয়ে রাতে বাড়ি না ফিরলে সমাজ কিভাবে ভ্রূ কোঁচকায়। তাছাড়া মেয়েরা যে সমাজে 'সফট্ টার্গেট' হয়ে যায় তার পরিচয় পাই 'আতঙ্ক'-এ। বাবাকে শিক্ষা দিতে গিয়ে মেয়ের মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে দুষ্কৃতীরা। সেই সঙ্গে নারীকে কেন্দ্র করে গৃহের যে নৈতিক বেড়া, ভোগবাদের দাপটে তা কিভাবে ভেঙে পড়ে তার চলচ্চিত্রায়ন আমরা দেখেছি 'আস্থা'-য়। এখানে দেখা যায় পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে গৃহবধূ বাইরের হঠাৎ যৌনতার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দেয়।

৮.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস / ড. অজিত কুমার ঘোষ/সাহিত্যলোক/দ্বিতীয় সংস্করণঃ বৈশাখ ১৪০৫। এপ্রিল ১৯৯৮।

২। বাংলা নাটকের টেকনিক — শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহা ; পুস্তক বিপনি, কলকতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭

৮.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। গিরিশ যুগের তিন বিখ্যাত থিয়েটার অভিনেত্রী কারা?

২। বিনোদিনী, তিনকড়ি ও তারাসুন্দরী, এই তিনজনের অভিনয়ের পার্থক্য কোথায়?

৩। সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত থিয়েটার অভিনেত্রী কারা?

৪। শিশির-অহীন্দ্র যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিনেত্রী কে? তাঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য কি?

৫। সিনেমার আবির্ভাব হয় কিভাবে ?

৬। প্রথম পর্বে পরিচালনার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা কী ছিল ?

৭। চলচ্চিত্রে মহিলাদের অভিনয় বিষয়ে কিরূপ প্রতিবন্দকতা বর্তমান ছিল ? এই সময়ে অভিনেত্রী কয়েকজনের নাম করুন।

৮। চলচ্চিত্রে বিষয় বস্তুর মধ্যে মহিলাদের অবস্থানটি কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ?

৯। ভারতীয় চলচ্চিত্রে নারীর অবস্থানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উলেখ করুন।

৬। কে.এম.আশরাফ ঃ হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্যা, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা।

৭। বিনয় ঘোষ ঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

৯। Kumkum Roy (ed) : Women in early Indian Societies, Manohar, New Delhi

১০। Gail Minault, Secluded Scholars : Women Education and Muslim Social Reform In Colonial India, Oxford University Press.

১১। N.S. Bose : Indian Awakening and Bengal, Calcutta.

১২। Borthwick Meredith : The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905, Princeton University Press, Princeton.

১৩। A. S. Altekar : Education in Ancient India, Varanasi.

৭.৬.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। প্রাচীন ভারতে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা কর। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান কি শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল?

২। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের ভূমিকা সদর্থক ছিল বলে কি তুমি মনে কর?

৩। মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে মুসলিম মহিলাদের অবদান কতখানি?

৪। 'শিক্ষা আনে চেতনা'-এই মতানুযায়ী কি নারীদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল বলে তুমি মনে কর? প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়কে বিশ্লেষণ করে তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

এগুলিকে নারীদের সমিতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে ও চেষ্টায় গড়ে ওঠেছিল মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন 'সখী সমিতি' কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী গড়ে তুলেছিলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। এই সংগঠনটির কিছু কাজকর্ম ও স্থায়িত্ব দুই ছিল। মহিলা সংগঠনটিকে তিনি একটি সর্বভারতীয় রূপ দেবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে ১৯১০ সালে গড়ে ওঠে 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন'। এটিকেই প্রথম মহিলাদের নেতৃত্বে, মহিলাদের জন্য, সর্বভারতীয় চরিত্রের মহিলা সংগঠনের স্বীকৃতি দেওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংগঠনের এবং রাজনৈতিক দলের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন। এই সংগঠনগুলির মধ্যে অনেকগুলি কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহিলাদের নানা সমস্যার সমাধানে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ, নানাপ্রকার দাবী আদায়ের সংগ্রামে, এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা প্রাকৃতিক-সামাজিক বিপর্যয়ের সময়েও এই সংগঠনগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই সমিতিগুলির নেতৃত্ব, পরিচালনা, কর্মী সকলেই মহিলা কিন্তু এই জাতীয় সমিতিগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু কোন একটি সংগঠনের সঙ্গে এই মহিলা সমিতিগুলি জড়িত সুতরাং এই সমিতিগুলির আদর্শ মূল সংগঠনের আদর্শেই নির্দ্ধারিত। তবু সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং মহিলাদের পরিবার থেকে রাষ্ট্র সর্বস্তরেই নিজস্ব নানাবিধ সমস্যার সমাধানে এই নারী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যেহেতু এদেশের সমাজে নারীরা এখনও স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি এবং বেশীরভাগ মহিলাই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নন সুতরাং নারীর একান্ত নিজস্ব কার্যকরী সমিতির উপস্থিতিও সহজ নয়। তবু সীমিত পরিসরে হলেও মহিলাদের বিভিন্ন সংগঠন অবশ্যই মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মহিলাদের সাহায্য করে, মহিলাদের আত্মবিশ্বাস তৈরীতে যথেষ্ট সহায়ক শক্তি হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেখানেই এই মহিলা সংগঠনগুলির যথার্থতা।

৭.৬.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত) ঃ ইতিহাসে নারী ঃ শিক্ষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। যোগেশ চন্দ্র বাগল ঃ বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৩। বিনয়ভূষণ রায় ঃ অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা, নয়াউদ্যোগ, কলকাতা।

৪। ড: আনোয়ার হোসেন ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৪৭, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

৫। নিবেদিতা পুরকায়স্থ ঃ মুক্তিমঞ্চে নারী, প্রিপট্রাস্ট, ঢাকা।

সার্বিক নীতি অনুযায়ী ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং নারী পুরুষে শিক্ষার বিষয়ে সমতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিন ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান হয়েছে। এক সরাসারি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুই সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তিন পুরোপুরি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে সামগ্রিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লাঘব করা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য পরবর্তী সময়ে গঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র পর্ষদ। আবার বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং আরও পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণও বিভাজিত হয়েছে স্বতন্ত্র পর্ষদের উপর। স্ত্রী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও নানা আর্থ-সামাজিক কারণে শিক্ষাকে সার্বজনীন করা যায় নি। অনিবার্যভাবেই আজও শিক্ষিতের হার পুরুষের তুলনায় মেয়েদের কমই থেকে গেছে। নারী শিক্ষার সংখ্যাগত দুর্বলতার কারণে সমাজে কুসংস্কার সামাজিক নিপীড়ন স্বাধীনতার অভাব আজও নারী জাতির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। যে অংশ শিক্ষার সুযোগ পান তাঁদেরও চিত্তের মুক্তি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। কারণ ব্রিটিশের কেরানী তৈরীর শিক্ষাপদ্ধতি থেকে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাও খুব বেশী দূরে সরে আসতে পারেনি। তাই কার্যত আজও আমাদের কাছে শিক্ষা 'সাপলাই' হয়ে আছে যা বাইরে থেকে ঘরে এসে গুছিয়ে বাক্সে ভরে রাখা হয়। শিক্ষা জীবনের ও মননের অঙ্গ হয়ে ওঠে না। এই সীমাবদ্ধ শিক্ষাও আবার সবার কাছে পৌঁছায় না। তবু চেষ্টা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে শিক্ষার বিকাশের লক্ষ্যে। অধিক অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের, সমাজের মূল স্রোতের নিকটবর্তী করতে শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাধীনতার পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কালক্রমে বোঝা যাচ্ছে সে ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে স্বাধীনতার পর যতটা অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে এবং নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আশা করা হয়েছিল সেই পরিমাণ অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। অথচ একথা যথার্থ যে মা শিক্ষিত হলে সন্তান নিরক্ষর থাকে না। তাই নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া অবশ্যই অধিক জরুরী। নারী শিক্ষার অগ্রগতিই সর্বশিক্ষার প্রচেষ্টাকে সাফল্য দিতে পারবে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন যে, ভালো মায়েরাই ভালো জাতি তৈরী করেন। সত্যিকার ভালো জাতির নির্মাণে শিক্ষিতা মায়েদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। কাজেই নারী শিক্ষা যেকোন জাতিরই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা আনে চেতনা। তাই যখন নারীরা শিক্ষিত হয়েছেন তাঁদের চেতনারও উন্মেষ হয়েছে। নারী তার অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য সকল বিষয়েই সচেতন হয়েছেন। ফলে নারীরা সংঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করেছেন। নারীরা কখনো আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার পাবার জন্য, কখনো বা দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য, কখনো বা নিজেদের মননের বিকাশের জন্য নানা স্তরে, নানা সময়ে গড়ে তুলেছেন নিজেদের নানা প্রচার সংগঠন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় নারীদের উন্নতি কল্পে কতকগুলি সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলির হোতারা ছিলেন কিছু উদার মনস্ক পুরুষ। তাঁরা নারী শিক্ষা বা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও নারীদের প্রতি সামাজিক নির্যাতনের বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। তবু

দশক থেকে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির একটা ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০ সালে বৃত্তিমূলক কলেজগুলিতে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০৮, উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে ৫২৪, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১০৫০, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৪, ২১, ৪২০ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ৫৯৬২ জন। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলিম মেয়েরা অগ্রসর হচ্ছিল। মক্তব এবং মাদ্রাসাগুলির সংখ্যা ও ছাত্রীর সংখ্যা দুই ক্রমবর্ধমান ছিল। মক্তবগুলি প্রধানত গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল। এবং এগুলি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল।

৭.৬.১.৪ : স্বাধীনতা – উত্তরকালে নারী শিক্ষা

সুতরাং হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সময়ের সঙ্গে নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে--- কি বিষয়গত ক্ষেত্রে, কি সংখ্যাগত ক্ষেত্রে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার এবং পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় জনগোষ্ঠীতেই 'নারী শিক্ষার হার যথেষ্টই নীচে ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এবং দেশবিভাজনের ফলে অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেশভাগের ফলে বাংলায় ঘটে এক ব্যাপক জনবিস্ফোরণ। ওদেশ থেকে এদেশে যাঁরা চলে আসেন তাঁদের বেশীর ভাগই এসেছিলেন এক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার মধ্যে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গা না বাধলেও যেকোন মুহূর্তে তা বাধবে --- এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে। ফলে এই মানুষগুলি কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাদির মাধ্যমেও দেশান্তরিত হননি। প্রায় আকস্মিকভাবে বিষয় সম্পত্তি সব ছেড়ে তাঁরা চলে আসতে বাধ্য হন। ফলে দেশে ব্যাপক বেকারি - অভাব - অরাজক অবস্থা এবং আগত মানুষগুলির হাতেও খাওয়ার-পরার-বাঁচার কোন সংস্থান ছিল না। এই জনবিস্ফোরণের ধাক্কায় একটা বিষয় এই হয়েছিল যে মেয়েরা বিরাট সংখ্যায় লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হন। কারণ একদিকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের মনের যে রক্ষণশীলতা তা ভেঙে যায়। অপর দিকে বাঁচার তাগিদে চাকরীর জন্য লেখাপড়াটাই একমাত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সহজাত যে মেধা ও বুদ্ধি সেটাই তখন মানুষের একমাত্র সম্পত্তি। ফলে সেই সম্পত্তির জোরেই তাকে তার বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হয়। তারফলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ, তারচেয়েও অভিভাবকদের শেখানোর আগ্রহ নারী শিক্ষার বিস্তারের পথ প্রণয়ণ করে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে মহিলারা শিক্ষিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের দ্বারা শিক্ষিকা পাবার সমস্যাও দূরীভূত হয়। ফলে বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় --- সর্বত্রই ছাত্রী সংখ্যা বাড়ে--- যা ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয় সংখ্যা ও শিক্ষিকার সংখ্যাও বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবর্গকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেলায় উৎসাহিত করে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণের জন্য সরকার একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কিন্তু মূল শিক্ষা কাঠামোয় খুব নতুন কোন ব্যবস্থা বা পরিবর্তন দেখা যায়নি। অবশ্যই দেশের

প্রগতিশীল সচেতনতার সাক্ষর। অর্থাৎ মুসলিম মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষার জন্য আগ্রহ এবং রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে ভাঙন যে এসেছিল এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয়, প্রধানত স্বাধীন জীবিকার পরিবার থেকেই ছাত্রীরা এসেছেন। একটি মাত্র কৃষক পরিবারের কন্যা ছাড়া। অর্থাৎ জীবিকাগতভাবেই যাঁরা সামাজিক রক্ষণশীলতার বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন তাঁরাই সেই সুযোগটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গটিকে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন, ডঃ পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, --- ''অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ব্যতীতও মানসিক বন্ধন মুক্তি মুসলমান মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছিল। এই মানসিক মুক্তির পিছনে উপস্থি ছিল এক রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলন - খিলাফৎ আন্দোলন। এক যুগ আগে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম মানসে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাকে গ্রহণ করে অগ্রসর হবার চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব সর্বাত্মক হয়নি। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অনেক ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত, মুসলিম সমাজ যখন বাঁচার তাগিদেই একটা প্যান ইসলামিজম তৈরী করতে যত্নবান তখন তারা নিঃসন্দেহ এবিষয়েও যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ একান্তই প্রয়োজনীয়। সুতরাং অতীতের সিংহাসন হারানোর স্মৃতি এবং ইংরেজ শাসকদের মুসলমানদের পশ্চাদপদ করে রাখার কৌশল --- সবকিছুকেই অতিক্রম করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে যে, একতাবদ্ধ হলেও অগ্রসর হওয়া যাবে না --- এ বোধে মুসলমান সমাজ উত্তরিত হয়। একটা সমাজ যখন শিক্ষার আলোয় ও অস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে তখন ক্রমে অনিবার্য হয় তার নারীদেরও শিক্ষিত করে তোলা। এক্ষেত্রে ধর্মমত, দেশ, কাল সব অতিক্রম করে নিয়ম একই। ফলে ১৯৩০-এর দশকের শেষান্ত থেকে সমাজ নারীশিক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে জীর্ণ পুরাতন বাধা বন্ধ হারা হয়ে। এর আনুপাতিক অংশ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই বৃহৎ।'' মুসলিম নারীরাও ক্রমশই বেশী সংখ্যায় শিক্ষার অঙ্গণে এসেছেন তাই নয় ক্রমশ তাঁরা প্রথাগত উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগেও অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন, ইদ্দেন্নেসা বিবি মাত্র ১৯ বছর বয়সে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল থেকে মেডিসিন ও সার্জারিতে ভার্ণাকুলার লাইসেন্সিয়েট পাশ করেন। ১৯০৩ সালের সরকারী রেকর্ডে তাঁকে ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী ফিমেল হাসপাতালের বাঙালী মুসলমান লেডি ডাক্তার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর খ্যাতনামা মহিলা মোসাম্মাৎ লতিফুন্নেসা, যিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল পরীক্ষায় ডিস্টিংসনসহ পাশ করেন। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে বিশ শতকের প্রথমাংশেই বেশ কয়েকজন হিন্দু মহিলা স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছেন। অথচ মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দুই অতিক্রম করেনি। খুজিস্তা আখতার বানুই সম্ভবত প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেন। ১৯১৯ সালে ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের কন্যা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেগম সুলতান মুয়ায়িদজাদা বি. এ. সম্মানিক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০-র দশকে বেগম সাকিনা ফারুক সুলতান মুয়ায়িদজাদা আইনে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ সালে ফজিলাতুন্নেসা ফলিত গণিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে মেহের তোয়েব বি.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৪০-এর

মধ্যেও পড়তে হয়। তাঁর নিজের প্রাতিষ্টানিক শিক্ষার অভাবহেতু বিদ্যালয়ের কাজকর্মে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধা পান। রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজও তাঁর প্রতি তীব্র বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রও করতে থাকে। এমনকি মুসলিম সমাজের এক অংশের ধনী ও প্রভাব লোকেরা তাঁর সম্পর্কে এমনও কুৎসা রটনা করে যে 'যুবতী বিধবা স্কুল খুলে নিজের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।' কিন্তু হতাশা, অনিশ্চয়তা, কুৎসা সবকিছু জয় করে ক্রমাগতই রোকেয়ার বিদ্যালয়টি উন্নতি পথে অগ্রসর হতে থাকে, বাড়তে থাকে ছাত্রী সংখ্যাও। এই বিদ্যালয়ে শুরুতে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যদিও সেই সময় থেকেই বাংলা বিষয়ে একটি ক্লাশ করানো হত। রোকেয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল বাংলা বিভাগ চালু করার। কিন্তু ছাত্রী অভাবে তা অনেকদিন বিলম্বিত হয়। ১৯১৭ সালে অল্প কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে বাংলা বিভাগ চালু করলেও ছাত্রীর অভাবে ১৯১৯ সালেই তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশের দশকের শেষে সন্তোষজনক ছাত্রী নিয়ে বাংলা বিভাগও উর্দু বিভাগের পাশাপাশি চালু করা সম্ভব হয়। কেবলমাত্র সংখ্যাগত বা বিষয়গতভাবেই বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। ছাত্রীদের সাফল্যও ছিল প্রথমাবধি প্রশংসনীয়। কেবলমাত্র পরীক্ষাতেই এই সাফল্যের মাত্রা আবদ্ধও ছিল না। হাতের কাজ, বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এসব ক্ষেত্রেও এখানকার ছাত্রীদের সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা ও উর্দু উভয় বিভাগেই সাফল্য এসেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু করে তৃতীয় দশক পর্যন্ত বহু বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে রোকেয়া যে ত্যাগ ও সাধনা দিয়ে বিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলেছিলেন তার ফলেই তাঁর জীবদ্দশাতেই শাকাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এই বিদ্যালয়ের অবদান বিরাট।

মুসলিম মহিলাদের বিদ্যাচর্চার জন্য কেবলমাত্র বিদ্যালয়ই নয়, ক্রমে অনুভূত হয়েছিল উচ্চশিক্ষারও প্রয়োজন এবং আগ্রহও। সুতরাং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়, প্রধানত মুসলিম ছাত্রীদের লক্ষ্য করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লেডি ব্রেবর্ণ কলেজ ১৯৩৯ সালে। প্রথম বছরে মোট ৩৭ জন ছাত্রী এই কলেজে পড়েছিল যার মধ্যে ৩২ জনই মুসলিম। দ্বিতীয় বছরের ছাত্রীসংখ্যা ৪৫ জন যাদের মধ্যে ৪০ জনই মুসলিম ছাত্রী। এখানে যে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছিলেন তাঁদের বেশীরভাগই সরকারী চাকুরীজীবী পরিবারের মেয়ে। দুবছর মিলে মোট ৭২ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩০ জনের অভিভাবকই চাকরিজীবী। বাকিরা ব্যবসায়ী, জমিদার, তালুকদার, উকিল, ডাক্তার এবং একজন এম.এল.এ. অপরএকজন ছাত্রীর পিতা কৃষক। সকল ছাত্রীদের মধ্যে ঐ একজনই কেবলমাত্র কৃষক পরিবার থেকে আগত। নিশ্চিতভাবে জানা যায় না কোন শ্রেণীর কৃষক ছিলেন এই অভিভাবক। তবে অনুমান করা যায় 'বড় কৃষক'ই হওয়া সম্ভব। যাহোক, লেডি ব্রেবর্ণ কলেজের প্রথম ২ বছরের অভিভাবকদের পরিচয় লক্ষ করলে দেখা যায় একাধিক মুসলিম ছাত্রীর অভিভাবক মা। মা অভিভাবক হওয়ার নিশ্চয় কিছু কারণ ছিল কিন্তু যে কারণে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হচ্ছে মুসলমান সমাজের যে মহিলারা অভিভাবক হিসাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্যে কলেজে পাঠাচ্ছেন তাঁদের এই কাজ তাঁদের

হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতার কিছু সুধী মুসলমান কলকাতায় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে আগ্রহী হন। কারণ তখন বেথুন স্কুলে মুসলিম মেয়েদের পড়ানো হত না। ১৮৯৭ সালের ১৭ জানুয়ারী বেগম শামসি ফেরদেস মহলের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। ১৯০৯ সালে আর এক সমাজসেবী এবং বিখ্যাত বাঙালী মুসলিম নেতা হোসেন শহিদ সোহারাওয়াদির মাতা খুজিস্তা আখতার বাণু কলকাতায় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি 'সোহরাওয়ার্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়। খুজিস্তা আখতার বানু নিজেও সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেন। তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং মেয়েদের সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পরবর্তী কালে খুজিস্তা আকতার বাণু গার্লস স্কুল নামে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে কাজ করতে থাকে।

বাঙালী মুসলিম নারীদের অগ্রগতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রই ছিল মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা। হাতিয়ার ছিল ১৯০৯ সালে প্রয়াত স্বামী শাখাওয়াতের নামাঙ্কিত শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৯০৯ সালেই বিহারের ভাগলপুরে স্বামীর বাড়ীতেই ৫/৬ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন রোকেয়া। কিন্তু পারিবারিক সম্পত্তি কেন্দ্রিক ঝগড়ার ফলে ১৯১০-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় বলে আসতে বাধ্য হন রোকেয়া। ফলে ১৯১১ সালে কলকাতাতে তিনি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন ১৬ই মার্চ দিনাঙ্কে। শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তার যাত্রা শুরু করে ৮ জন ছাত্রী ও দুটি বেঞ্চ এবং রোকেয়ার শিক্ষায়িত্রী ও পরিচালকের যৌথ ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। নারী শিক্ষার বিস্তারে রোকেয়ার প্রাণপণ প্রয়াস কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মানুষকে তাঁর বিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে যুক্ত করে। প্রথমাবধি নানা কারণে বিদ্যালয়টি অর্থসংকটে পড়ে। রোকেয়া তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৩০ হাজার টাকা দান করেন। অতঃপর বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর তথা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। রোকেয়া চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই আবদ্ধ থাকবে না। একদিকে তারা হয়ে উঠবে আদর্শ সুকন্যা-সুগৃহিনী-সুমাতা অন্যদিকে ব্রতী হবে দেশ ও সমাজ গড়ার কাজে, জাতির সেবায় ও পরোপকারের ব্রতে। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষিকা সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হন। কিন্তু শিক্ষিকার ও অর্থের যুগোপৎ অভাব সমস্যাও সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক বছর পর থেকে সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র হলেও আর্থিক সাহায্য পায়। বছর দুই পরে তা বৃদ্ধিও পায়। কিন্তু বিদ্যালয়টির মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয়, এই বর্ধিত সাহায্য থেকে নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। তাই রোকেয়াকে উদ্বিগ্ন থাকতেই হত। তবে তিনি বহু উচ্চ প্রতিষ্ঠিত মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতাও পান। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ দিনাঙ্কিত এক পত্রে সরোজিনী নাইডু রোকেয়াকে তাঁর নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও অসাধারণ শিক্ষানুরাগের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। কিন্তু এর বিপরীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকেই রোকেয়াকে তীব্র সমালোচনা ও বাধাবিঘ্নের

প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যায়, যে, ১৮৮০ সালে ইডেন গার্লস স্কুলের ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলিম ছিল। ১৯১১ তে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১১। ১৯২৬ সালে এই বিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগ চালু হয়। স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের ছাত্রীদের কাছে এটিই ছিল উচ্চতর শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহু খ্যাতনামা মুসলিম মহিলা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকা হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন, মালেকা আখতার বানুর নাম যিনি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করে ইংল্যান্ড থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করে ইডেন গার্লস কলেজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন। এছাড়া ফজিলাতুন্নেসা জোহা গণিত শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে বেথুন কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন এবং পরবর্তী সময়ে ইডেন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল হন।

সরকারী উদ্যোগে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টার সমকালীনই বেশ কয়েকজন মুসলিম নারীকে পাওয়া যায় যাঁরা নিজেরা মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। দুই কন্যার জননী, স্বামী পরিত্যক্ত ফয়জুন্নেসা নিজেও উর্দু, বাংলা, পার্সী ভাষায় দক্ষ এবং গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করে সময় কাটানো মহিলা। পিতার জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি তিনি সামাজিক ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘির পাড়ে ৫ একর জমির উপর গড়ে তোলেন একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মেয়েরা বৃহত্তর জগতে পা রাখতে পারবে না। এই বিদ্যালয়টি 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়' নামে খ্যাত হয়। তিনি কেবলমাত্র বিদ্যালয়টি স্থাপন করেই নিরত হননি। মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন, হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছেন এবং নিজের জমিদারীর আয় থেকে হোস্টেলের যাবতীয় ব্যয় বহন করেছেন। রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক ১৯১১ সালে স্থাপিত শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল ১৯৩১ সালে। তার ৫৮ বছর আগে ফয়জুন্নেসা তাঁর নিজের উদ্যোগে, নিজের জমিদারীতে মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সাহস দেখান। কিন্তু কেবলমাত্র নারীদের জন্য উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ই নয়, তাঁর জমিদারীতে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা—প্রাথমিক শিক্ষা, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য বাংলা ও ইংরেজী উভয় ধরনের শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা—তিনি প্রবর্তন করেন। ফয়জুন্নেসা নিজ গ্রামে এবং তাঁর জমিদারীর ১৪টি মৌজার প্রত্যেকটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর এস্টেট থেকে বহন করা হয়। ফয়জুন্নেসা তাঁর শিক্ষানুরাগ নিজের জমিদারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরেও তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং মক্কা শরীফে 'মাদ্রাসা-ই-সাওলাতিয়া ও ফোরকানিয়া' মাদ্রাসার ব্যয়বহনে সহায়তা করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বহু কৃতি ছাত্রী নানা ক্ষেত্রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের পত্নী বেগম শামসি ফেরদৌসও নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ যত্নবান

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের শিক্ষাকল্পে এঁদের প্রচেষ্টায় সমগ্র সিলেট শহরে কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই নয়, অন্তঃপুরের মহিলারাও এঁদের আয়োজনে পরীক্ষা দিতে পারতেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনী আয়োজিত পরীক্ষায় ছাত্রীদের লিখিত ও মৌখিক দুই পরীক্ষাই দিতে হত। বাংলা অথবা ঊর্দু যেকোন ভাষাতেই পরীক্ষা দেওয়া যেত। ১৮৮৩ সালে এঁদের আয়োজিত পরীক্ষায় ১০জন মুসলিম ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায় ১৮৮৪ সালে উত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮৩ জন, যার মধ্যে ২১ জন মুসলিম। ১৮৮৯ সালে ৬১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ ৫২৮ জন যাদের মধ্যে ৭৪ জন মুসলিম মহিলা। পরবর্তীকালে মুসলিম মহিলার সংখ্যা আরও বাড়ে। এই সম্মিলনীর নিয়মানুযায়ী ৪ বছরের শিশু থেকে ৩৫ বছর বয়সী মহিলারাও পরীক্ষা দিতে পারতেন। কখনও কখনও ৪৫ বছর বয়সী মহিলারাও পরীক্ষা দিয়েছেন। অনেক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ভদ্রলোক স্ত্রী শিক্ষাকে উৎসাহ দিতে এই সকল পরীক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতেন।

১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'। অন্তঃপুরের মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন প্রধানত ঢাকা কলেজের কিছু প্রগতিশীল ছাত্র। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতা, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর ইত্যাদি জায়গায় মেয়েদের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হত। সমাজের জাগরণ ও উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যে গভীর সম্পর্ক তা বিবেচনা করেই তারা একাজে ব্রতী হয়েছিল। সমাজের বিরূপ মনোভাবকে মাথায় রেখে তারা তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিরূপন করে। তাদের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় কঠোর পর্দা প্রথার মধ্যে রেখেই মুসলিম মেয়েদের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হত। কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে এবং বাংলা ও ঊর্দু উভয় ভাষাতেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এটি একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ছিল। উত্তীর্ণ ছাত্রীদের এরা সংশাপত্র ও পারিতোষিক দিতেন। প্রথম বছরে সম্মিলনীর তত্ত্বাবধানে মোট ৩৭জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে ১৪ জন, ঊর্দু ভাষায় ও ২৩ জন বাংলায়। ঊর্দু বিভাগে ১২ জন এবং বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত এই সম্মিলনী সক্রিয় ছিল, ১৯০৫ সালের পর এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নোয়াখালি সম্মিলনী'। স্ত্রীশিক্ষায় পেছিয়ে থাকা নোয়াখালিতে অন্তঃপুরবাসী মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বদেশহিতৈষী কিছু ছাত্র এটি গঠন করে। এরা সকল ছাত্রীদের ছাড়াও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহিতে করার জন্য দু'জন লেখিকাকে এবং হস্তশিল্পকর্মের জন্যও মহিলাদের পুরস্কৃত করে।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী শিক্ষার জন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ১৮৯৭ এর আগে পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই ১৮৭৮ সালে পূর্ববঙ্গের ঢাকার লক্ষ্মীগঞ্জে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন গার্লস স্কুল। বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৮৮০ সালের মার্চে প্রকাশিত

সালে মিস কুক যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন তখন শ্যামবাজার অঞ্চলে একজন মুসলিম মহিলার কাছ থেকে তিনি প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। ঐ মুসলিম মহিলা খৃষ্টান মহিলার প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে ১৮জন ছাত্রী নিয়ে নিজের পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উৎসাহে বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে ৪৫ জনে দাঁড়ায়। লক্ষ্যণীয় যে সময়ে কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠী এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট বিরুপ সেই সময়ে একজন মুসলমান নারী মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে যত্নবান হচ্ছেন। অবশ্য তিনি একাজে একা নন। মির্জাপুর, এন্টালি জানবাজার ইত্যাদি অঞ্চলের স্থানীয় কিছু মুসলমানরাও কুকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐসব জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন।

বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। এরা 'জুভেনাইল স্কুল' নামে কলকাতার গৌরীবাড়ীতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষাই ১৮২১ ও ১৮২২ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর ১৪০ জনের মতো ছাত্রী পরীক্ষা দেয় যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই ছিল। লেডিস অ্যাসোসিয়েশানের উদ্যোগে ১৮২৭ সালে কলকাতায় যে ১২টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মোট ১৬০ জন ছাত্রীর বেশীরভাগই মুসলিম। অবশ্য তারা বেশীদূর পড়াশুনা চালাতে পারেনি। ১৮৪৪ সালে মির্জাপুরে স্থাপিত হয়েছিল একটি বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০-৮০ জন ছাত্রী ছিল। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল মুসলিম।

কিন্তু কেবলমাত্র এই খৃষ্টান মিশনারী বা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরাই এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়েছিলেন তা নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন সভাসমিতি ও সংগঠন তৈরী হয় যারা বিভিন্ন জেলাতে হিন্দু মুসলমান সকল নারীর মধ্যেই শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দুদের মতোই বহু মুসলিম মেয়েরাও বিদ্যালয়ে আসতে না পারলেও অন্তঃপুরে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ফলে ঐ জাতীয় সংগঠনগুলি অন্তঃপুরে পড়াশুনা শেখা মেয়েদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ছিল 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা'। এই সংগঠনটির শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই উন্মুক্ত ছিল। এই সভায় রিপোর্ট অনুযায়ী হুগলী জেলার ভিটাসিন থেকে প্রথম মুসলিম মহিলা চান্দেকন্নেসা ১৮৯১ সালে পরীক্ষায় পাশ করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের অন্তঃপুর পরীক্ষায় ১৫জন মহিলা উত্তীর্ণ হন। যাঁদের মধ্যে বাঁকুড়া থেকে একটি মুসলিম বালিকা বৃত্তি লাভ করে। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় বসবাসকারী শ্রীহট্টবাসী যুবকরা প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' যাদেরও লক্ষ্য ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। এঁদের কর্মকান্ড কেবল কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র সিলেটবাসীর মঙ্গল এবং মহিলাদের উন্নতি সাধনে তারা দৃষ্টি দেয়।

১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়। এম.এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষে দুটি ছাত্রী—অমিয়া রায় ও চারুলতা রায় বা মিনি—ভর্ত্তি হয়। এরা দুজনেই লরেটো হাউস থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে। গ্রীষ্মাবকাশের পর ছাত্রী দুটি ক্লাসে এলে কলেজের ভেতরে সহপাঠী, এমনকি কোন কোন অধ্যাপকও তাদের মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কলেজের বাইরে সারা দেশেই ঝড় উঠে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এমনকি ব্রাহ্ম পত্রিকাতেও নানা বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের এই সহশিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা থেকে সরে যান। কিন্তু যেটি লক্ষ্যণীয়, বালিকা দুটি ভেতরের-বাইরের এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্লাসে আসা বন্ধ করেনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ভালো ফলও করে। অমিয়া রায় কলেজের সব ছাত্রকে অতিক্রম করে কলেজের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে তৃতীয় স্থানটি দখল করে। চারুলতা বা মিনি রায়ও সম্মানের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। যদিও এই দুই ছাত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই সে-যাত্রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সহশিক্ষার বিষয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৯৪৪ সালে নিয়মিতভাবে এখানে সহশিক্ষা চালু হয়। কিন্তু সহশিক্ষা সাফল্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছে ১৯৩২ সালে, কলকাতা থেকে দূরে আর এক শিক্ষা-সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের পুরানো কেন্দ্র, কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে অরুণ বালা খাঁ কৃষ্ণনগর লেডি কারমাইকেল গালর্স স্কুল থেকে পাশ করে এফ.এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হিসাবে ভর্ত্তি হন। প্রথম বছরে ছাত্রী সংখ্যা ১ হলেও পরের বছরই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪-এ। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে সহশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ঐ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ সেন এবং একদা কৃষ্ণনগরের পুরপিতা তদানীন্তন বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী স্যার মহম্মদ আজিজুল হক সাহেবের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে নারী শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং সামাজিক গোঁড়ামির শিথিলতা যা বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই ক্রমশ সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রপাত ঘটাতে পেরেছিল। এবং ক্রমশই কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরতলী ও মফঃস্বল শহরে একাধিক মহিলা মহাবিদ্যালয় ও সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বাংলার প্রায় সর্বত্রই। যদিও তা পুরুষের তুলনায় এবং জনসংখ্যার তুলনাতে শতকরা হিসাবে যথেষ্টই কম। তবু যে লড়াই নারীদের এর জন্য ক্রমাগতই করে চলতে হয়েছে তার গুরুত্ব ও গভীরতা যেকোন প্রকার আন্দোলনের তুলনাতেই যথেষ্ট বেশী এবং অনেক বেশী কঠিন।

এদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মুসলিম। মুসলমান জনগোষ্ঠী নানা কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়েছিল। তাছাড়া সামাজিকভাবেও মুসলমান জনগণ হিন্দুদের তুলনায় বেশী রক্ষণশীল বিশেষত নারীদের প্রসঙ্গে। সেই কারণে প্রথমদিকে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়টি আরও বেশী কঠিন ছিল। তবু ক্রমশ মুসলমান যুব সমাজও মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এক্ষেত্রেও মেয়েদের উৎসাহ এবং কার্যকর সহযোগিতা উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করে। বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' বই থেকে জানা যায় যে ১৮২২

বাংলার সরকার তাঁদের দুজনকে বৃত্তি দিয়ে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে পাঠান। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চন্দ্রমুখী বসু এম.এ. পড়া শুরু করেন বেথুন কলেজের মাধ্যমেই। কিন্তু কাদম্বিনী বসু ইতোমধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চান। আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্রী ভর্ত্তিতে আপত্তি জানায়। এবারে বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিভার্স অগাষ্টাস টমসন স্বয়ং কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক সভার আপত্তি অগ্রাহ্য করে সরকারী নির্দেশনামা জারি করে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৮৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করে দেন। উক্ত সরকারী আদেশনামায় স্পষ্ট জানানো হয় যথাযোগ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাদেরও মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করতে হবে।

বেথুন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়তে থাকে। ফলে ১৮৮৮ সালে বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগকে স্বতন্ত্র কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নাম হয় বেথুন কলেজ। স্কুলটি পরিচিত হয় বেথুন কলেজিয়েট স্কুল নামে। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের ধর্মীয় দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথমাবস্থায় ছাত্রীদের বেশীরভাগই ব্রাহ্ম ও বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারভুক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার থেকেও বেশ ভালো সংখ্যায় মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য এসেছে। এই চিত্রটা কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে না অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা অবশ্য উল্লেখ্য। হিন্দু ঘরের বালবিধবা সরলাবালা মিত্র বেথুন স্কুল থেকে পড়াশুনা করে, কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ঐ স্কুলেরই শিক্ষায়িত্রী হন ১৯০১ সালে। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে তিনি শিক্ষিকা হিসেবে ট্রেনিং প্রাপ্ত বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। দু'বছর পরে সেখানের পড়াশুনা শেষ করে ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বরে দেশে ফেরেন এবং অক্টোবর মাসেই নব প্রতিষ্ঠিত সরকারী শিক্ষায়িত্রী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করে মহিলারা যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হচ্ছেন—এটা তারই স্মারক। এই প্রকার মহিলাদের সংখ্যা শতাংশের বিচারে যতই কম হোক না কেন সেই যুগ ও সমাজের পক্ষে ঘটনাটি যথেষ্ট অগ্রগতি নির্দেশক। নারীদের সাফল্যের কারণেই নারী শিক্ষা এদেশে অগ্রগতি পেয়েছিল। ১৯১৬ সালে তটিনী গুপ্ত সংস্কৃতে এবং সীতা ও সুজাতা চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে সম্মানিক পরীক্ষা দিয়ে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফল করেন। তটিনী গুপ্ত সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণী পান। এর ফলেই এর পরের বছর থেকেই এই কলেজের ছাত্রী হিসাবেই ঐ দুটি বিষয়ে সম্মানিক পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এ পর্যন্ত যাঁরা কোন বিষয়ে সাম্মানিক পরীক্ষা দিতে চাইতেন তাঁদের নন-কলেজিয়েট ছাত্রী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে সেই পরীক্ষা দিতে হত। ১৯২৩-২৪ সাল থেকে বেথুন কলেজে শুরু হয় আই.এস.সি. এবং দর্শন ও গণিতে সম্মানিক পড়ানোও।

আগ্রহ, সাহস - এইসব কিছুকে হাতিয়ার করে উন্মুক্ত করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের জন্য রুদ্ধ দ্বার। ১৮৭৬ সালে দেরাদুনের একটি বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চন্দ্রমুখী বসুকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে দেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এবিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সিদ্ধান্ত বা নিয়মাবলী ছিল না। ফলে সেনেট ও সিন্ডিকেটের সভায় স্থির হয় যে, ছাত্রদের জন্য নির্মিত প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রীটিকে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। ১৮৭৭ সালে চন্দ্রমুখী বসু কৃতিত্বের সঙ্গে সেই যোগ্যতা প্রমাণ করে দেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের কোন নিয়ম ছিল না। অতএব চন্দ্রমুখীর কৃতিত্বের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে মেয়েদের পরীক্ষা নেবার নীতি প্রণয়ণ করতে হয়। এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রনয়ণ করার অব্যবহিত পরেই ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুলের ছাত্রী হিসাবে কাদম্বিনী বসুও অন্য সব পুরুষ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সমভাবে পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি মাত্র কয়েকটি নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ পাননি। মহিলা ছাত্রের এই কৃতিত্বে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। সরকারও আলোড়িত হন। শিক্ষা অধিকর্তা এ. ডবলু. ক্রফট-এর চেষ্টায় কাদম্বিনী মাসিক ১৫ টাকা জলপানি পান। কাদম্বিনী নিজে পড়াশুনায় আগ্রহী ছিলেন এবং জলপানিরও অন্যতম শর্ত ছিল লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া। সুতরাং কাদম্বিনী এফ.এ. পড়তে সবিশেষ যত্নবান হন। কিন্তু মেয়েদের এফ.এ. পড়ানোর কোন বন্দোবস্ত তখন ছিল না। এমতাবস্থায় বেথুন স্কুলের পরিচালকমন্ডলীর আবেদনক্রমে সরকার বেথুন স্কুলে এফ.এ. পড়াবার স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর বেথুন স্কুলের এফ.এ. ক্লাস শুরু হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা কলেজ তার জয়যাত্রা শুরু করে অন্তত একজন মহিলার উচ্চশিক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহ ও যোগ্যতাকে বাস্তবায়নের জন্য। এই পরিস্থিতিতে চন্দ্রমুখী বসুও এফ.এ. পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বাঙালী খৃষ্টান পরিবারের এই কন্যা কলকাতার ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে এফ.এ. পড়ে কৃতকার্য হন। সুতরাং এবার এঁদের বি.এ. পড়ানোর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হয়ে যায়। সুতরাং ১৮৮১ সালে বেথুন স্কুলে বি.এ. ক্লাস খোলা হয়। সেখানে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী একসঙ্গে বি.এ. পড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৮৭৯ সালে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন স্কুলের এফ.এ. ক্লাসে পড়ার অনুমতি চেয়ে অনুমতি পেয়েছিলেন কুমারী অ্যালেন ডি.আব্রু। সেই প্রসঙ্গে শিক্ষা অধিকর্তা স্পষ্ট করেই জানান যে বেথুন স্কুল যেহেতু হিন্দু বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং অহিন্দু বালিকাদের স্কুল কলকাতায় আছে তাই বেথুন স্কুল সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করা না হলেও বেথুন কলেজ অংশ যেহেতু স্বতন্ত্র পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র এবং ভারতের একমাত্র মহিলা কলেজ সুতরাং বেথুন কলেজ অংশে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল যোগ্য ছাত্রীকেই পড়তে দেওয়া হবে।

নারীর উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আরও একটি দিকের সূচনাও এই কালখন্ডেই ঘটে। অবলা দাস ও অ্যালেন ডি. আব্রু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে চান। কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজ মহিলা ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা পড়াতে অস্বীকার করে। সুতরাং ১৮৮২ সালে

কারণেই তাঁর শিক্ষা চিন্তাও ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। নারী কেবল গাহ্যস্থ বিদ্যা বা পুরুষের প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করবে—এমন ধারনার বিপরীতে তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে যাতে অন্ধ কুসংস্কার থেকে তাঁদের মুক্তি ঘটে। শিক্ষা যাতে নারীর চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। নারী জাতির প্রতি সমাজ যে ব্যবহার করে আসছে তা যে অত্যন্ত অন্যায়—সেই বোধশক্তির উন্মেষ যেন নারীজাতির ঘটে। এই ধারনা নিয়েই বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান। কেবলমাত্র স্ত্রী শিক্ষাই নয়, এমনকি সর্বশিক্ষার যে কথা আজ আমরা বলছি ঊনবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সেই সর্ব শিক্ষার জন্যও বিদ্যাসাগর মশায় লড়াই করেছিলেন। নারীশিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর ধারণা এতটাই সুস্পষ্ট ছিল যে ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন সেগুলি কেবলমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল না। মফঃস্বল-গ্রামাঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমদিকে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হলেও পরবর্তী সময়ে সরকার বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করে নিলে বিদ্যাসাগর নিজ অর্থব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সচল রেখেছিলেন। তিনি সহজ সরল গদ্যে পাঠ্য বই রচনা করেছেন। সংস্কৃত ব্যকরণকে বাংলায় সহজবোধ্যভাবে প্রণয়ণ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারে একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টা ছিল সর্বতোমুখী। তাঁর চারিত্রিক উদারতা, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টা তাঁকে কেবলমাত্র বেথুন সাহেবের বন্ধু ও সহযোগীই করেনি, বেথুনের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল করেছিল যে বেথুনের প্রতিকৃতি তিনি নিজগৃহে স্থাপন করেছিলেন। একটা বেশ দীর্ঘ সময় বেথুন স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্বই তিনি কেবল পালন করেননি, এই বিদ্যালয়টির জন্ম মুহূর্ত থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি ওতপ্রতোভাবে জড়িয়েও ছিলেন। বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মরণিকা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের উল্লেখও পাওয়া যায়। বেথুন কলেজের ছাত্রী হিসাবে চন্দ্রমুখী বসু প্রথম বাঙালী মহিলা এম.এ. পাশের সম্মান লাভ করলে স্বভাবতই অত্যন্ত আনন্দিত হন বিদ্যাসাগর মশায়। তিনি চন্দ্রমুখীকে আর্শীবাদ জানিয়ে শেকস্‌পীয়ারের গ্রন্থাবলী উপহার দেন।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার পেছনে অবশ্যই সহযোগিতার প্রসারিত হস্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কিছু মুক্তবুদ্ধি পুরুষরা—এও যেমন সত্য, তেমনি সত্য মেয়েদের ঘরে বাইরে দীর্ঘদিনের লড়াই। যেখানে মেয়েরা গৃহাভ্যন্তরে বাবা বা স্বামীর সাহায্য পেয়েছেন সেখানে তবু তাদের লড়াইটা কিছুটা হলেও সহজ হয়েছিল। কিন্তু রাসসুন্দরী দেবী তাঁর 'আমার জীবন'-এ যেমন জানিয়েছেন গোপনে শাড়ীর আঁচলে লুকিয়ে রান্নাঘরে তিনি বই পড়তে শিখেছেন এমন আরও কেউ কেউ ছিলেন। এই রাসসুন্দরী দেবী বা বামাসুন্দরী দেবীরা নিজেদের চেষ্টায় একটি একটি করে অক্ষর চিনে পড়তে শিখেছেন-কেউ তাঁদের সাহায্য তো করেন ইনি, প্রবল বিরোধিতাই পেয়েছেন—তাঁদের লড়াই স্বভাবতই আরও কঠিন লড়াই। এই লড়াই আরও একটা স্তরে পৌঁছেছে বিদ্যালয়ে যাবার জন্য লড়াই-এ। নারীকে এদেশে শিক্ষার অধিকার পেতে নিজেদের লড়াই দিয়ে পথ কেটে নিতে হয়েছে সর্বস্তরেই। এমন কি উচ্চশিক্ষা লাভের পথও সহজ হয়নি নারীদের কাছে। কিন্তু নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঐকান্তিক

সোসাইটি ও বেঙ্গল 'ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি' একত্রিত হয়ে যায়। এঁদের শিক্ষা বিস্তারে প্রচেষ্টার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে মিস কুক এবং 'দি ব্রিটিশ এন্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির' ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২০০ মহিলাকে তাঁরা শিক্ষার অঙ্গণে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮২৪ সাল নাগাদ বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনারী সংস্থার দ্বারা কলকাতা, চুঁচুড়া, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সমাচার দর্শনের হিসাবানুযায়ী শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭১ এবং ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজার দুশো সত্তর জন।

খৃষ্টান মিশনারীরা ছাড়াও বাংলার নবজাগরণের পথিকৃত ব্যক্তিবর্গও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ও যত্নবান হয়েছিলেন। এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একাংশ মনে করতেন যে নারী শিক্ষা হিন্দু শাস্ত্রে অনুমোদিত বিষয়। এই চিন্তাধারার ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালংকার প্রমুখ। বাংলার নবজাগরণের পথিকৃত রামমোহন স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন ভূমিকা পালন করতে না পারলেও তিনি যে স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮২০ সালে লিখিত তাঁর সতীদাহ বিষয়ক পুস্তিকায়। রক্ষণশীল চিন্তাধারার নেতা হলেও রাজা রাধাকান্তদেব স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছিলেন। নিজের বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা ছাড়াও ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম পরীক্ষা তাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-এর 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়িকা' গ্রন্থটি প্রণয়ণে ও প্রকাশে উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যও তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। অপর আরও একটি অংশ ছিল যাঁরা বিশেষত বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র শুধুমাত্র মহিলাদের সমস্যা আলোচনার জন্য একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। জ্ঞানান্বেষণ সভার মাধ্যমেও শিক্ষিত যুবকরা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্যক্তিধর্ম স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি রচনাও করেন। কিন্তু এপ্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে এই যুব সম্প্রদায় তথা ডিরোজিয়ানদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন নারী জাতির মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নয়, বরং শিক্ষিত, ইঙ্গরুচিশীল যুবকদের উপযুক্ত স্ত্রী হিসাবে মেয়েদেরও শিক্ষিত হওয়া জরুরী—এই ধারণা নিয়ে। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের ধ্যান-ধারণা আবর্তিত হয়েছিল এই কেন্দ্রিয় ভাবনা থেকে যে শিক্ষিত আধুনিক যুবকদের পক্ষে মূর্খ স্ত্রীদের কাছ থেকে শারীরিক-মানসিক সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্প্রীতিও তৈরি হওয়া অসম্ভব হবে।

কিন্তু পুরুষের প্রয়োজনে স্ত্রী শিক্ষার এই ধারণা থেকে অনেক দূরে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি স্ত্রী শিক্ষা চেয়েছিলেন নারী জাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থেকে এবং নারী জাতির প্রতি যে অবমাননা ও নিপীড়ন তিনি সমাজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা থেকে নারীদের মুক্তি দিতে চেয়ে। সেই

স্ত্রী শিক্ষার এক করুণ চিত্র উল্লেখিত। অ্যাডাম স্পষ্টই বলেছেন যে রাণী ভবানীর মত বিচক্ষণ মহিলার নেতৃত্বাধীন অঞ্চলেও পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সমস্ত মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই নন, এমনকি অকাল বৈধব্যের কুসংস্কারের জালে জড়িত অভিভাবকরা কন্যাদের শিক্ষার কথা চিন্তাও করেন না। এদেশের শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ, কালজয়ী, মেকলের প্রস্তাবেও, অ্যাডামের রিপোর্ট সামনে থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে একটি শব্দও উল্লেখিত হয়নি। শাসক হিসাবে কোম্পানীর স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে এই নির্লিপ্ত নির্বিকার মনোভাব এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত। এর প্রমাণ ব্যবহারিকক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। দেখা যায়, ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার জমিদারদ্বয় জয়কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে একটি মহিলা বিদ্যালয় খুলতে চেয়ে এবং তার অর্ধেক ব্যয় সরকারকে বহনের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে, অনুমতি প্রার্থনা করেন। কাউন্সিল অব এডুকেশানের কাছে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কাউন্সিলের উক্ত সভার সভাপতি হিসাবে কাউন্সিলকে বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের যুক্তিতে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই বেথুন নিজে উদ্যোগী হন। এবং লক্ষ্যণীয় নিজে উচ্চপদস্থ সরকারী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও বেথুন কোন সরকারী সাহায্য না নিয়ে দেশীয় প্রগতিশীল ভদ্রলোকদের সহায়তায় ১৮৪৯ সালের ৭ই মে প্রথম মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর ১৫দিন পরেই বাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরপরই সুখসাগর, উত্তরপাড়া ইত্যাদি জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বারাসাতে মহিলা বিদ্যালয় পুনর্গঠন ইত্যাদি হতে থাকে। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলোর কোনটিই স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা ও সরকারী নিষ্ক্রিয়তার কারণে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। কিন্তু বেথুন লর্ড ডালহৌসিকে লেখা এক বিখ্যাত চিঠিতে এই সব বিদ্যালয়গুলির প্রতি সরকারী মনোযোগের আবেদন জানিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ এপ্রিল ১৮৫০ দিনাঙ্কিত একটি সরকারী আদেশনামাও প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ সালের ১২ আগস্ট বেথুনের অকাল প্রয়াণ হলে লর্ড ডালহৌসীর উদ্যোগে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণ করে। বেথুন নামাঙ্কিত হয়ে এটিই হয় এদেশের প্রথম সরকার পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এর বহু আগে এদেশের পুরুষদের শিক্ষার অনেক অগ্রগতিই সরকারী উদ্যোগে ঘটে গেছে। নারী পুরুষের শিক্ষায় সরকারের এই বৈষম্যবাদী নীতি গ্রহণের বহু রৈখিক ও বহুমাত্রিক কারণ অবশ্যই ছিল।

কিন্তু এত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অন্তত একেবারে থেমে থাকেনি। এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন খৃস্টান মিশনারীরা। তাঁদের উদ্দেশ্য খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহী করা হলেও একথাও অনস্বীকার্য যে তাঁরাই কোন প্রকার সরকারী সাহায্য ব্যতিরেক ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতা ও শহরতলীর নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার বিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন। সংঘবদ্ধ ভাবে এ কাজ শুরু হয়েছিল কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির নেতৃত্বে ১৮১৯ সালে। এঁদেরই চেষ্টায় গড়ে ওঠে কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮২৪ সালে ফিমেল জুভেনাইল

নিশ্চয় হিসাবশাস্ত্র জানেন। তিনি কোন শাহজাদী নন, অভিজাত গোষ্ঠী থেকে আসেননি, সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন অমুসলমান যিনি এসেছিলেন কায়স্থ পরিবার থেকে।" এই ধারা ভবিষ্যতেও প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ১৮২৩ সালের সিন্ধের একটি আদমশুমারী থেকে। এই সূত্রে জানা যায় যে বেশ কিছু নারী সিন্ধি লিখতে ও পড়তে পারেন। যদিও তারা ফারসী পড়তে বা লিখতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে, সিন্ধিলিপি আরবি লিপি হওয়ায় সিন্ধি লিপি জানলে কোরানের আঘাত পড়া সম্ভব ছিল। এছাড়া ১৯শ শতকের মালাবারে ৩১৯৬ মুসলমান পুরুষ পিছু ১১২২ জন মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়ে যেত অর্থাৎ স্বাক্ষর। সুতরাং মুসলমান পুরুষদের তুলনায় মুসলমান নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩৫শতাংশ। দক্ষিণভারতে দেবদাসীদের সাক্ষর হওয়া আবশ্যক ছিল। আবার ১৮২৩ সালে বিশাখাপত্তনমে ৯৪জন ব্রাহ্মণ ও ৭০ জন শূদ্র নারী বিদ্যালয়ে যেতেন। অর্থাৎ বুকাননের যে বক্তব্য ছিল যে উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা ছিল কিন্তু নিম্নবর্ণের নারীরা শিক্ষার বাইরে ছিলেন না—তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তেমনি এমন বিবাদের নথিও রয়েছে যাতে বোঝা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে গ্রামীণ জমিদার যা অন্য পদমর্যাদার মহিলারা যুক্ত হচ্ছেন যাঁরা নিশ্চিতভাবেই নিরক্ষর ছিলেন। কাজেই এই মহিলাদের জমি ছিল, তাঁরা আইনী অধিকার সম্পন্ন ছিলেন, সম্পত্তির অংশভাগ দাবী করতেন, নিজেরা কাজীর সামনে হাজির হয়ে নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতেন—অথচ তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর। অর্থাৎ মুঘল যুগে সর্বত্র এবং সব সময় নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল এমন সার্বিক ঘটনা প্রমাণ করা যাবে না। এক এক সময়ে এক এক অংশে নারী শিক্ষার এক এক প্রকার চিত্র ছিল।

৭.৬.১.৩ : আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষা

অষ্টাদশ শতক সামগ্রিকভাবেই এক সংকটের কাল। নারী শিক্ষা তো বটেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই এই শতাব্দীতে তার নিজস্ব রূপকে ধরে রাখতে ব্যর্থ। সুতরাং উচ্চবর্গের কিছু মহিলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করলেও সামগ্রিকভাবে মহিলাদের বিধির বিধান ছিল অশিক্ষা। সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া সম্পত্তির অধিকার, নিজেদের শরীর ও মনের উপর অধিকারসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার থেকেই নারীজাতি ছিল বঞ্চিত। সামাজিক অধিকার থেকে দূরে থাকার কারণেই অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যতিরেকে সমাজের সব শ্রেণীতেই বলবৎ ছিল নারী ও পুরুষের আরও এক শ্রেণী-বৈষম্য। যত সংকীর্ণ স্বার্থ এবং পরিসরেই হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের এই অচলায়তনে, প্রথম আঘাত হানে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানীর শাসন। কোম্পানীর শাসকরাও কিন্তু শাসনের প্রথম দিকে বেশ দীর্ঘকালই নারী শিক্ষার বিষয়ে মৌন থেকেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে কোম্পানী পরিচালিত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ যথেষ্ট রক্ষণশীল। ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী। রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডামের শিক্ষা সংক্রান্ত বিখ্যাত রিপোর্টে

বলেছেন। প্রথমটি হল "বালিকাটি নিশ্চিতভাবেই আরবি লিখতে চেষ্টা করছিল না, হয় ফারসি অথবা সে যুগের কোন ভাষা লিখতে চাইছিল।" অর্থাৎ মুলমানদের মধ্যে নারীদের লিখতে শেখা নিষিদ্ধ বলে যে সাধারণ ধারনা প্রচলিত আছে তা সঠিক নয়। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চিত্রের "বালিকাটি শাহজাদী নয়, মধ্যশ্রেণীর মেয়ে।" শাহজাদীদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন—একথা সবারই জানা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। হুমায়ুন-কন্যা গুলবদন বেগম যে কেবল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা লিখেছিলেন তাই-ই নয় তাঁর একটি অসাধারণ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল যেটি রাজকীয় গ্রন্থাগারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এবং সে যুগে নিয়ম ছিল প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থের দুটি করে কপি তাঁকে পাঠাতে হত। একটি তাঁর নিজের পড়ার জন্য, অন্যটি সাধারণের ব্যবহার্যে গ্রন্থাগারে রাখার জন্য।" এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিজেই কেবলমাত্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাই নয়, সর্বজনের মধ্যে বিদ্যা তথা জ্ঞানচর্চায় উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর জীবনের আরও একটি কৌতূহলপ্রদ বিষয় হচ্ছে এমন একজন রুচিশীলা, অতি শিক্ষিতা, সাহিত্যপ্রেমী শাহজাদীর স্বামী খুব ভালো সৈনিক হলেও নিরক্ষর ছিলেন। এই যুগে উস্তানীরা মধ্য বা উচ্চমধ্য শ্রেণীর বালিকাদের গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতেন কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার এবং কাব্য ও কলাবিদ্যা চর্চার প্রচলন ছিল। কোরান পাঠ যেহেতু পবিত্র কাজ তাই তা সকল শ্রেণীর নারীর জন্যই অবশ্য করণীয় বলে বিবেচ্য হয়েছে।

মুঘলযুগের মহিলারা প্রধানতই কবি ও চিত্রকর হতেন। এক্ষেত্রেও বদায়ুনী ও আবুল ফজলের রচনা থেকে জানা যায় যে সমাজের সব শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই এই গুণ ছিল। এমনকি বদায়ুনী যাঁকে সকল মহিলা কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন এবং তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই নেহানি একদম সাধারণ পরিবার থেকেই এসেছিলেন। মুঘল যুগে বহু নারীই আপন স্বাক্ষর বিশিষ্ট ছবি রেখে গেছেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম নাদরা বানু যাঁর আঁকা অনেক ছবিই জাহাঙ্গীরের খুবই বিখ্যাত আতেলিয়ার-এ রয়েছে।

মুঘলযুগে বিশেষত গুজরাট ও পশ্চিমাঞ্চলে মহিলারা আইনি ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সম্পত্তি কেনা-বেচা, বন্ধক রাখা ইত্যাদি তো করেইছেন, এমনকি সম্পত্তিকেন্দ্রিক বিবাদে কাজীর সামনে নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। অতএব তাঁরা নিজেদের মান দস্তখত করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাক্ষী হিসাবেও দস্তখত করেছেন। কোন কোন ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের নথি থেকে এমনও জানা যায় যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার কোন অনুচর ব্যবসাটি হাতাতে চাইলে স্ত্রী ব্যবসাটিতে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন কারণ তিনি শিক্ষিত এবং বিদেশের ব্যবসা চালানোর কাজে পুরোপুরি দক্ষ। এলাহাবাদ, বিলগ্রাম ও অন্যান্য স্থান থেকেও প্রাপ্ত নথিতে মুসলমান নারীদের ভূমিদান গ্রহণের প্রমাণও পাওয়া যায়। শিরিন মুসভি আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "জাহাঙ্গীর একজন মহিলাকে সমস্ত মদদ-ই-মাশ জমি বা ভূমিদানের তত্ত্বাবধায়ক করেছিলেন, শুধু দান প্রক্রিয়ার দেখভালের জন্য নয়, দানযোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়নের জন্যও। এরকম একজন মহিলা কোনোভাবেই নিরক্ষর হতে পারেন না। তিনি যখন নথিপত্রের প্রক্রিয়াকরণ করছেন তখন তিনি

ধর্মের নিয়মানুযায়ী বিশুর ৪ বছর, ৪ মাস, ৪ দিন বয়সের দিনে উদ্‌যাপিত হয় বিসমিল্লা অনুষ্ঠান। অর্থাৎ সেদিন সে প্রথম পবিত্র কোরানের শ্লোক আবৃত্তি করে এবং তার বিদ্যাচর্চার শুভ সূচনা হয়। এই পর্বে গৃহে এসে শিক্ষক বা 'ওস্তাদ' শিশুকে কোরান শরিফ মুখস্থ করাতে শুরু করেন। মেয়েরাও একই প্রথায় ঐ দিন পাঠাভ্যাস শুরু করেন কেশ বৃদ্ধ ওস্তাদ অথবা মহিলা শিক্ষক বা ওস্তানীর কাছে। এই সময় আরবি ভাষায় তারা কোরান আবৃত্তি করতে শেখে কিন্তু তার অর্থ বোঝে - এমন কোন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা থাকে না। শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে যে তিনি কোরানের যে শ্লোকগুলি আবৃত্ত করাচ্ছেন তার অর্থ শিশুটিকে বলবেন কিনা বা কতটা বলবেন। ছেলে মেয়েদের এই পর্বে আরবি ভাষায় পবিত্র গ্রন্থ এবং পার্সী ভাষায় কিছু সাধারণ জ্ঞান এবং নীতিকথা শিক্ষামূলক গল্প কবিতা শেখানো হয়। গৃহের শিক্ষা শেষে ছেলেরা মন্তব্যে বা মৌলভীর গৃহে বিদ্যাচর্চার জন্য যায় কিন্তু মেয়েরা একটু বড় হলেই পর্দা প্রথায় গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে বলে বাইরে শিক্ষার জন্য যেতে পারে না। এবং শুরুতে বৃদ্ধ শিক্ষকের কাছে পাঠ শুরু করলেও অল্পদিন পরেই মেয়েদের জন্য বাড়ীতে ওস্তানীরা আসতেন। এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রের এঁদের জ্ঞান কোরানের নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশের আবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতো। ফলে মেয়েরা যদিও বা অল্প বিস্তর পড়তে শেখে কিন্তু মোটেই লিখতে শেখে না। প্রথম যে মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের কথা জানা যায় তা মধ্যযুগের ঘটনা নয়, (১৮৪৫ সালে) অবশ্যই সরকারী উদ্যোগে, এবং দিল্লীতে অবস্থিত ছিল মোট ৬টি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। দিল্লীর একটি বিশেষ অঞ্চলে পাঞ্জাবী মহিলাদের দ্বারা এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়েছে এবং মূলত তাঁদের মেয়েরাই এখানে পড়েছে। খুবই স্বল্প সংখ্যক মহিলা বা একেবারে উচ্চ বংশীয়াদের কেউ কেউ মধ্যযুগেও শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রমী চরিত্র ও ঘটনা। কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটু অন্য কাহিনী শোনা যাবে মুঘল ভারতের জীবন-যাপনে।

মুঘল যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। একটি আরবি-ফারসি শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্যটি সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যে দ্রাবিড় শিক্ষা-পদ্ধতি পড়তো। আরবি-ফারসি শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রিস্তর ব্যবস্থা যার প্রথম স্তর মন্তব্য বা দবিস্তান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। দ্বিতীয় স্তরটি হল মাদ্রাসা যেখানে সামান্য উচ্চশিক্ষা কিন্তু মূলত ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। এবং উচ্চ শিক্ষার অর্থাৎ ইনশারা ও সিয়াক লিখন শিক্ষা, হিসাবশাস্ত্র, ফরমান, নানাবিধ হুকুমের মুসাবিদা করা—ইত্যাদি বিষয় অর্থাৎ আমলা হবার জন্য যা লাগত সেগুলি শেখানো হত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে। নারীরা যেহেতু আমলা হতেন না এবং এই স্তরের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহে যেতে হত অতএব উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনও তাঁদের হত না এবং উচ্চ শিক্ষার অঙ্গণে মুঘল যুগেও নারীদের অবস্থান ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ মন্তব্য স্তরে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের চেয়ে বেশী ছিল—এমন প্রমাণ যথেষ্ট বলে জানিয়েছেন শিরিন মুসভি। ১৪৬৮-৬৯সাল নাগাদ রচিত একটি শব্দার্থকোষে মিস্তাউল ফজলব শাহদাবাদীতে মুদ্রিত একটি ক্ষুদ্র চিত্রের সাক্ষ্যে এও বোঝা যায় যে মন্তব্য ছাত্রের পাশে বসে ছাত্রীও কাষ্ঠখনেঢ (অয়তি) লিখতে শিখছে উল্টোদিকে বসা জনৈক পুরুষ শিক্ষকের কাছ থেকে। ডঃ মুসভি এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

নারীদের ক্ষেত্রে গৌরীদানও হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখা যায় কোনও নায়িকারই শৈশবে বিবাহ হয়নি। নাচ, গান, ছবি আঁকা, কাব্যপাঠে তাঁরা পারদর্শিতাও অর্জন করেছিলেন।

সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার দরজা বন্ধ থাকার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই বাল্যবিবাহ এবং পুরুষদের বহু বিবাহের প্রথা। সংসারের দায়িত্বে বদ্ধ নারী, সংসারে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগে না, এমন বিদ্যাচর্চার সুযোগ পায়নি। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ পরিবারে বধূর জন্য শিক্ষাখাতে খরচ করার প্রশ্নই ওঠেনি। পুরুষের বহু বিবাহ কেবলমাত্র যে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তাই নয় অগণিত নিরক্ষর বালবিধবারও সৃষ্টি করেছে। এদের সুরক্ষার জন্য এককভাবে নারীর উপরই বর্তেছে কঠোর ব্রহ্মচর্যের বিধান। পুরুষ শাসিত সমাজ আর্থিকভাবে সক্ষম পুরুষজাতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি কিংবা চায়ওনি। 'সতী' শব্দের কোন পুংলিঙ্গ শব্দই কোনদিন তৈরী হয়নি। সুতরাং সহজাত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার না থাকার জন্য সাধারণ নারীর পক্ষে শাস্ত্র নির্ভর কর্তব্য ও অকর্তব্য নিরূপণ করা সম্ভব নয় বলেই সমাজে তাদের স্বাধীনতার অভাব রয়েছে—নবম শতাব্দীর দেহলিতে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও এর কোনও প্রতিকার করা শাস্ত্রকারদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং প্রাচীন ভারতে নারীদের সংগঠন হিসাবে আলাদাভাবে কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। যদিও ঋক বৈদিক যুগে সাধারণ সংগঠন 'সভা' ও 'সমিতি'তে নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন। সমাজের উচ্চাংশের নারীরা ক্রমেই পুরুষাধীন হয়ে পড়ায় তাঁদের জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশের মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা বজায় ছিল। পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্যই যেহেতু সেটা প্রয়োজনীয় ছিল তাই সেখানে সামাজিক বাধা তেমন ছিল না। এছাড়া এই অংশের নারীদের এক বড় অংশ দাসীবৃত্তির সঙ্গেও যুক্ত ছিল যাদের স্বাধীনতা প্রধানতই নির্ভর করত তাদের প্রভুদের দয়া ও মানসিক উৎকর্ষের উপর। এই ধরনের স্বনির্ভর মেয়েরা সংশ্লিষ্ট কর্ম জগতের সংগঠন যেমন গিল্ড ইত্যাদির সঙ্গে অবশ্যই অনিবার্যভাবেই যুক্ত থাকতো।

৭.৬.১.২ : মধ্যযুগের ভারতে নারী শিক্ষা

পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে সমাজে নারীর যে অবস্থানগত অবনতির শুরু হয়েছিল ক্রমশই তা বৃদ্ধি পেয়েছিল আমরা তা দেখলাম। অবশ্য ই. বি. হরনার দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সমাজে নারীর অবস্থান সম্মানজনক জায়গায় স্লথগতিতে হলেও যাচ্ছিল। কিন্তু মধ্যযুগ অর্থাৎ ইসলাম আগমনের পর মেয়েদের জন্য বিশেষত উচ্চাংশের মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা প্রবলতর রূপ পরিগ্রহ করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং অ-ইসলাম জনগোষ্ঠী—উভয় ক্ষেত্রের নারীরাই এর শিকার হন। ফলে কার্যত শিক্ষার অঙ্গণ থেকে তারা দূরে - বহু দূরে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেন। ইসলাম

সামাজিক সংস্থায় তা রূপান্তরিত হয়েছিল। এই সংস্থার আশ্রয়ে কিছু নারী স্বতন্ত্র চিন্তার সুযোগ এবং নিজ মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজপরিবারের ও ধনী ব্যাপারী কুলের সাধারণ গৃহিনী, বণিতা, এবং সর্বনিম্নস্তরের দাসীদের সঙ্গে ভিক্ষুণী সংঘের বিশেষ সদস্য ঘেরি, স্থবির ও প্রবীণারূপে স্বীকৃত যাঁরা তারাও থাকতেন। এই ভিক্ষুণী সংঘের এই বিশেষ সদস্যদের রচনা সপ্তম শতাব্দীতে সংকলিত হয় 'থেরিকাথা' নামে। সঙ্গে ছিল এক ভাষ্য যাতে ভিক্ষুণীদের বিবরণ উদ্ধৃত হয়। এথেকে জানা যায় যে থেরিয়া ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীর এবং অনেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান শাক্য গণরাজ্যে ছিলেন। এই থেরিকাথা সপ্তম শতাব্দীতে সংকলিত হলেও এর অনেক রচনাই যথেষ্ট প্রাচীন। এই রচনাগুলিতে নির্বান লাভের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের মত বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে সহজ, সরল, স্পষ্ট ও ভাবাবেগপূর্ণভাবে। উদাহরণ হিসাবে দাসি পুন্নার রচনার উল্লেখ করা যায়। ভাষ্য থেকে জানা যায় যে ভিক্ষুণী হবার আগে পুন্না ছিলেন দাসি। তাঁর রচনাটি সংলাপের আকারে। সংলাপটি ছিল নদীতীরে গার্হস্থ্য কর্মের জন্য জল নিতে আসা পুন্না এবং নদীতে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে আসা ব্রাহ্মণের মধ্যে। পুন্না ব্রাহ্মণকে বিদ্রূপ করে বলেন নদীতে স্নানের দ্বারাই যদি পুণ্য অর্জন সম্ভব হয় তাহলে নদীতে সদা নিমগ্ন মাছ ও কচ্ছপ অনায়াসেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। তাছাড়া জলের যদি পাপ ধৌত করার ক্ষমতা থাকে তবে অর্জিত পুণ্যও জলস্রোতে ভেসে যেতে পারে। অতত্রব শীতে শারীরিক ক্লেশ স্বীকার না করে পুণ্য প্রাপ্তি অন্য উপায়ে প্রয়োজন। নিরুত্তর ব্রাহ্মণ পুন্নার যুক্তি স্বীকার করে বৌদ্ধ সংঘে যোগ দেন। লক্ষ্যণীয়, পুন্নার যুক্তি স্পষ্ট কিন্তু কোন জটিল শাস্ত্র চর্চার প্রচেষ্টা নেই। আছে অনুভব ও বাস্তব সাধারণজ্ঞানের প্রভাব।

সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপিত হওয়ার পর নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, শাস্ত্র চর্চা ও সদধর্মের অনুশীলনে কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠাই শুধু নয় নিজস্ব রচনাশৈলীর উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি বিশাখার মত ধনী শ্রেষ্ঠা পরিবারের মেয়েরা নানাবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধ-হিন্দু নির্বিশেষে রাজকুল ও অভিজাত পরিবারের এবং পণ্ডিত বংশের নারীরা বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। বিবাহের পরেও কেউ কেউ বিদ্যাচর্চা বজায় রেখেছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে হাল রচিত 'গাথাসপ্তশতী' থেকে নবম শতকের রাজশেখরের রচনা পর্যন্ত বহু নারী কবির নাম পাওয়া যায়। শীলভট্টারিকাকে রাজশেখর বাণভট্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কর্ণাটের মহিলা কবি বিজয়াংকার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজশেখর মন্তব্য করেছেন—শ্যামাবর্ণা বিজয়ংকাকে জানতেন না বলেই দন্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে সরস্বতী সর্বশুক্লা বলে বর্ণনা করেছেন। বিবাহিতা হয়েও বিদ্যাচর্চা বজায় রেখেছিলেন এমন নারীদের মধ্যে উভয় ভারতীয় নাম অবশ্য উল্লেখ্য। বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের দুই দিক পাল শংকরাচার্য ও মাণ্ডন মিশ্রের বিতর্কে মাণ্ডন মিশ্রের পত্নী হয়েও উভয়ভারতীয় পক্ষপাতহীনভাবে যোগ্যতার সঙ্গে মধ্যস্থতা করেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় নারীর সাহস, বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যার প্রয়োগেও পিছপা ছিলেন না। অন্ধ্র, বাকাটক, কাশ্মীর, চালুক্যরাজ্যের রাণীদের অস্ত্রনৈপুণ্য ও শাসনদক্ষতা ঐতিহাসিক সত্য। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এইসব উচ্চ বংশীয়া

বিধিবাক্যটিতে পুংলিঙ্গ যথার্থ নয় কারণ স্বর্গকামনা পুরুষেরই একচেটিয়া নয়, নারীরও স্বর্গকামনা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত নিজস্ব ধনের প্রশ্নে এ উদাহরণ যথেষ্ট মেলে যে নারীর ধনাধিকার শ্রুতি সিদ্ধ। রামায়ণ ও মহাভারতে বিবাহিতা নারীরা স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞ করেছেন এমন বহু উদাহরণ আছে। যদিও দম্পতির একত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানই কাম্য। কৌশল্যা থেকে বালিপত্নী তারা পর্যন্ত সকল অংশের নারীই একাকী যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। সীতা সন্ধ্যাকালে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করতেন। কুন্তী অর্থববেদে পারদর্শিনী ছিলেন। - এই সকল তথ্য সমাজকে প্রতিবিম্বিত করে বৈকি।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের প্রমাণ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩০০ অব্দে রচিত পাণিনির ব্যাকরণেও মেলে। ছাত্র্যাদয়ঃ কালায়াম সূত্রে পাণিনী ছাত্রীশালা অর্থাৎ ছাত্রীদের 'বোর্ডিং হাউসের' কথা বলেছেন। তাছাড়া 'আচার্যা' ও 'উপাধ্যায়' শব্দদুটি পাণিনির ব্যাকরণে উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বোঝা যায় সে যুগে নারীরা নিজেই শিক্ষকতা করতেন। মন্ত্রোচ্চারণে অশুদ্ধি বিষয়ে পুরোহিতদের ভীতিই যে সাধারণ নারীকে বৈদিক শিক্ষার অঙ্গণ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল তার প্রমাণ অন্য গ্রন্থ থেকেও বোঝা যায়। উত্তরকালীন হারীতস্মৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ম বাদিনী ও সদ্যবধূ এই দুধরনের নারীর উল্লেখ তাৎপর্যময়। ব্রহ্ম বাদিনী নারীরা অবিবাহিতা কন্যারূপে নিজগৃহে থাকতেন এবং যাবতীয় বিদ্যাচর্চা তথা বেদাধ্যয়ন করতেন। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের সকল জীবন আবর্তিত হয় এবং গার্হস্থ্য জীবনের সকল কর্তব্যকর্মই গৃহপতি ও গৃহিনী মিলিতভাবে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন বলেই শাস্ত্রের বিধান ছিল; তবু গৃহিনী সকলের সুখদর্শিকা 'সম্রাজ্ঞী'। সুতরাং এই 'সম্রাজ্ঞী নারীর' পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ অভিনিবেশ অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং অপর তিনটি আশ্রমের প্রতিপালক এবং প্রাত্যহিক সাংসারিক যাবতীয় কর্তব্য পালনের সঙ্গে বিদ্যার্জনের জন্য যে দীর্ঘ সময়, মনোনিবেশ ও শ্রম স্বীকার প্রয়োজন তাও করা একজন নারীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অতত্রব সদ্যবধূদের বিদ্যাচর্চা থেকে অব্যহতি দেওয়া হত। গৃহস্থশ্রমের সুস্থিতি যাঁদের উপর নির্ভরশীল নয় সেই ব্রহ্ম বাদিনী তপস্বিনীর বিদ্যাচর্চায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করতেন। এঁরা সামাজিক সম্মানও পেতেন এবং বিদ্যাচর্চার জন্য একা দীর্ঘ পথ ভ্রমণও করতেন। তার জন্য কোন সামাজিক বাধা তাঁরা পেতেন না। সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী নামের এক ব্রহ্ম চারিণী বাল্মীকি মুনির আশ্রয় ছেড়ে একাই সুদূর অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন বেদান্ত শিক্ষার জন্য। কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামে দুটি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র আসায় ঋষির মনোযোগ তাদের দিকেই গেছে। ফলে তাঁর পড়াশুনা ভালো হচ্ছিল না। লক্ষ্যণীয় অষ্টম শতাব্দীর কবি ভবভূতির বাল্মীকির আশ্রমে সহসিক্ষার কল্পনা করতে পেরেছিলেন। কেবলমাত্র 'উত্তররাম চরিত'ই নয় ভবভূতি তাঁর 'মালতীমাধব' নাটকেও কামন্দকী নামের বৌদ্ধ শ্রমণীর চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন যিনি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের সময় বিভিন্ন জায়গার ছাত্রদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। শ্রমণা কামন্দকী কেবলমাত্র ভবভূতির সৃষ্টিই নন। বস্তুতপক্ষে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের প্রেরণায় এবং বুদ্ধের নিরুৎসাহ সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভিক্ষুণী সংঘ। এই ভিক্ষুণী সংঘ শুধুমাত্র শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না মহত্বপূর্ণ

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ঋকবৈদিক যুগে সমাজ ছিল পশুচারণ ভিত্তিক। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারনাটা এখানে স্পষ্ট নয়। এযুগে মানবজাতির পিতৃপুরুষরা সমবেতভাবে পূজিত হয়েছেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে এই চিত্রটা সর্বাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ যুগে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামাজিক জীবনের কেন্দ্রে। ফলে বেড়েছে যজ্ঞীয় সাহিত্যের কলেবর। এই বিরাট সাহিত্য যার মধ্যে গণিত, জ্যামিতি জ্যোর্তিবিদ্যার মত কঠিন সব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল তা কেবলমাত্র শুনে মুখস্ত রাখা হয়ে উঠেছিল জটিলতর। ফলে পুরোহিত শ্রেণীকে একাজে নিয়োজিত হতেই হয়। অপরপক্ষে ক্রমশই ব্যবহারিক জীবনের অন্য ধরণের নানা বিষয়ের সঙ্গে এই শাস্ত্রের যোগও ক্ষীণতর হতে থাকে। ফলে সব বর্ণের সকল মানুষ সারাজীবন এই শাস্ত্রকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত হলে তো সমাজই অচল হয়ে যেত। ফলে বেদবিদ্যার রক্ষা ও চর্চার দায়িত্ব পুরোপুরি পুরোহিত শ্রেণীর অধীনস্থ হয়ে যায়। কৌটিল্যের তর্কশাস্ত্রে বেদবিদ্যার পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকে বিদ্যাচর্চার বিষয় হিসাবে যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির প্রতি আগ্রহী হচ্ছিলেন অন্য বর্ণের জনগণ। ফলে একদিকে যেমন, পুরোহিত শ্রেণীর প্রচেষ্টার ফলেই প্রাচীনতম সাহিত্য উত্তরকালের মানুষের হাতে এসেছে প্রায় অবিকৃতভাবে অপরদিকে বৈদিক সাহিত্যের জটিল বিস্তৃতির এবং তাকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৎকালীন স্ত্রীশিক্ষা। পরবর্তী বৈদিক যুগে পারিবারিকভাবে পিতৃপূজার রীতি প্রচলিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ ঘোষণা করে যে মানুষের জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পুত্র অনিবার্য। এই তীব্র পুত্রাকাঙ্খাই, জটিল বেদবিদ্যার অধ্যয়নে মেয়েদের ব্যাপৃত রেখে সময় নষ্ট করানোর পরিবর্তে তাদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেবার জন্য সমাজের আগ্রহ বাড়ায়।

এ. এস. অলটেকার -এর মতে নারী শিক্ষার অবনতির অপর একটি কারণ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে সমাজে শুদ্রাবিবাহ প্রবণতার শুরু এবং খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে অনার্য স্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থানের অবনতি ঘটা। কারণ বৈদিক সাহিত্যের শুদ্ধি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ পুরোহিত সম্প্রদায় কোনভাবেই অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অতএব প্রথমাবস্থায় তাঁরা অনার্য স্ত্রীকে স্বামীর ধর্মসঙ্গিনী হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থানকারী নরপতিদের ক্ষেত্রে তাদের কেবলমাত্র অনার্য স্ত্রীদের বাদ দেওয়া সহজ ছিল না। ফলে সকল নারীর জন্যই যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যজ্ঞকেন্দ্রিক সমাজে নারীর মন্ত্রাধিকার চলে যাবার অর্থ শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারও হারানো। কারণ সঠিক মন্ত্রোচ্চারণে সক্ষমতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বৈদিক শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, সবর্ণা ধর্মপত্নীই তাঁর যজ্ঞীয় অধিকারের বলে পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতেন। নারীর মন্ত্রাধিকার সংক্রান্ত বিতর্কে তার অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি জৈমিনীয় মীমাংসা গ্রন্থে (খৃষ্টপূর্ব ৫০০-২০০) আলেচিত হয়েছে সেখানে স্পষ্ট করেই জৈমিনি রক্ষণশীল ঐতিশায়নের মত নিজস্ব জোরালো যুক্তি দ্বারা এবং প্রাচীন প্রবক্তা বাদরায়ণের প্রামাণ্যে, খণ্ডন করে তাঁর অবিচল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈমিনি স্পষ্ট করেই দুটি কথা বলেছেন। প্রথমত 'যজেত স্বর্গকামঃ' অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করবে এই

৭.৬.১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা -- নারীর আর্য-সামাজিক অবস্থান শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিলো কিনা।

(২) মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা।

(৩) আধুনিক ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার প্রসার।

(৪) স্বাধীনতা-উত্তরকালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি।

৭.৬.১.১ : প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা

প্রাচীন যুগ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত এদেশে নারী শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস বেশ জটিল এবং স্বতন্ত্র আলোচনা সাপেক্ষ। নারী শিক্ষা বিষয়টি নারীর সামাজিক অবস্থানের বাইরে নয়। এমনকি এরসঙ্গে জড়িত নারীর আর্থিক সঙ্গতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বের প্রসঙ্গও। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারী পুরুষের সমানাধিকারের অবস্থান প্রায় নেই। হরপ্পা সভ্যতার বিষয়ে সাহিত্যিক উপাদানের অভাবে নিশ্চিত করে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। তাই বৈদিক যুগ থেকে নারী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। কিন্তু বৈদিক যুগের সাল তারিখের প্রসঙ্গে 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন লয়ে তারিখ সাল।' সে বিবাদের মধ্যে না ঢুকে আমরা বৈদিক সাহিত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্যায়, পূর্ববৈদিক যুগে যখন ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল --- এটিকে আমরা ঋক্‌বৈদিক যুগ নামে চিহ্নিত করতে পারি এবং দ্বিতীয় পর্যায় উত্তর বৈদিক যুগ, যখন বেদাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই যুগকে আমরা পরবর্তী বৈদিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ঋকবৈদিক যুগে নারী শিক্ষার প্রসারের প্রসঙ্গে বিশ্ববারা, ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রা, বাগাম্ভুনা ইত্যাদি অন্তত কুড়ি জন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী নারীর নাম সর্বত্রই উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, উপনিষদের যুগে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যথেষ্ঠ আত্মবিশ্বাস নিয়েই যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ী পার্থিব সম্পদ উপেক্ষা করে 'অমৃতা' হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন --- এসব তথ্য যুগান্তরিত হয়ে আজও নারীকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অথর্ববেদের নির্দেশানুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে যথার্থ শিক্ষা শেষেই একজন কন্যা একটি যুবককে বিবাহ করতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরিবারে কাঙ্খিত সুপণ্ডিত ও দীর্ঘজীবী কন্যা লাভের জন্য পিতাকে একটি বিশেষ খাদ্যগ্রহণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

EDUCATION AND WOMEN & WOMEN'S ORGANISATIONS

নারী – শিক্ষায় ও মহিলা সংগঠনে (প্রাচীন যুগ থেকে স্বাধীনতা উত্তরকাল)

একক - ১

(a) Ancient India

(b) Medieval India

(c) Colonial India

(d) Post Independence

বিন্যাসক্রম :

৭.৬.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৬.১.১ : প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা

৭.৬.১.২ : মধ্যযুগের ভারতে নারী শিক্ষা

৭.৬.১.৩ : আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষা

৭.৬.১.৪ : স্বাধীনতা-উত্তরকালে নারী শিক্ষা

৭.৬.১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৬.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

POLITICAL PARTICIPATION

একক - ১

(a) Gandhian Satyagraha (b) Revoluntionary Movements (c) Peasant and Workers' Movements (d) Tribal Movements

---

বিন্যাস ক্রম ঃ

৭.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

৭.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

৭.১.২ ঃ গান্ধীয়ান সত্যাগ্রহে নারীদের অংশগ্রহণ

৭.১.৩ ঃ বিপ্লবী আন্দোলন এবং নারী

৭.১.৪ ঃ কৃষক এবং শ্রমিক মহিলাদের আন্দোলন

৭.১.৫ ঃ আদিবাসী মহিলাদের ভূমিকা

৭.১.৬ ঃ উপসংহার

৭.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Reference Books)

৭.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

৭.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং নারীদের অংশ গ্রহণ

(২) সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারী জাতির অবদান

(৩) কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসী মহিলা অর্থাৎ নিম্ন বর্গের ভূমিকা

৭. ১.১ ঃ প্রস্তাবনা

সমাজে নারীর স্থান সেই সমাজের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নির্ণায়ক। বৈদিক যুগে নারীরা উচ্চ সম্মানে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে এবং বুদ্ধি বিকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। আর্যরা নারীদের সহযোগিতা তাদের জীবনের প্রতিটি আঙ্গিনায় কামনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নারীর সম্মান ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। মনুর ভাষায় নারী আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল; অতএব তাকে চিরস্থায়ীভাবে পুরুষের অভিভাবকত্বে রাখা প্রয়োজনীয়। নারীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দেওয়া হল এবং তার জন্য কঠোর নিয়মাবলী তৈরী হল। নারী শিশুবয়সে পিতার উপর, দাম্পত্য জীবনে স্বামীর উপর এবং বার্ধক্যে সন্তানের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা কখনই স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করবে না এবং সমাজের থেকে একটি বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করবে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নারী তার পুরাতন অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হয় (নগন্য সংখ্যায়) এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। নারী মানব প্রজাতির অর্ধাংশ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই নারী ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটা দিকচিহ্ন। তাই আমরা এই পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

৭.১.২ ঃ গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহে নারীদের অংশগ্রহণ

গান্ধীজী (মহান মুক্তিদাতা) ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন অবহেলিত এবং অবদমিত শ্রেণীর সামাজিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টার ফল হল নারী জাগরণ, যা নারীকে তার চিরাচরিত হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সম্মান, আত্মত্যাগ ও কৃতিত্ব অর্জন করতে সাহায্য করেছে। গান্ধীজীর কাছে নারী অহিংসার অবতার এবং সমাজের প্রশ্নাতীত নেত্রী। নারী পুরুষের সঙ্গিনী এবং পুরুষের সমান তার মানসিক ক্ষমতা। নারী পুরুষের সমস্ত কর্মে অংশগ্রহণের উপযুক্ত এবং পুরুষের সমান স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী।

সত্যাগ্রহ প্রধানতঃ নারীর জন্য যথোপোযুক্ত কারণ নারী সমস্ত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। অহিংসা মানে 'অনন্ত ভালবাসা' যার অর্থ 'অসীম সহ্য'। নারী ছাড়া এই ক্ষমতা আর কারো নেই কারণ নারী সমস্ত গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে নতুন প্রাণের জন্ম দেয়। তাই সত্যাগ্রহের নেত্রী হিসেবে গান্ধীজী নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর 'যাদুস্পর্শে' প্রাচীন ঐতিহ্যের দেওয়াল ভেঙ্গে গেল। হাজার হাজার পরিবারের বন্দিনীরা মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধার ভূমিকা নিল। রেণুকা রায় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'রোল এ্যাণ্ড স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'তে মন্তব্য করেছেন যে নারীর অবস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয় গান্ধীজীর প্রচেষ্টায়। যিনি প্রচলিত নীতি এবং প্রথা অস্বীকার করে তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলিতে নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কোন আইন নারীদের অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্তন সূচিত করতে পারত না, যা মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সম্ভব হয়েছিল। তিনি একদা বলেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ সৈন্যবাহিনীতে পুরুষ অপেক্ষা তিনি নারী সৈনিক দেখতে চান। তিনি তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, নারীর মুক্তি তার নিজ হাতেই নিহিত আছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুরু থেকেই সদস্যপদ নারীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাখী বন্ধনের' সূচনা করেন (১৬ই অক্টোবর, বঙ্গভঙ্গের দিন)। নারীরা এতে অংশগ্রহণ করে এবং 'অরন্ধনে' যোগ দেয়। তারা প্রতিবাদী মিছিল এবং মিটিংয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং দেশজ দ্রব্যের স্বপক্ষে দেশব্যাপী প্রচার শুরু হয়। নারী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়। তারা বিদেশী জিনিস বর্জন করে ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক জগতে অংশগ্রহণ করে। দেশপূজার সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের একাত্মকরণ করা হয় এবং 'শক্তি' ও নারীশক্তি জাগরণের বন্দনা চলতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনে মহিলাদের রাজনৈতিক আগ্রহ জাগরিত এবং বিকশিত হয় অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে তাঁর 'হোমরুল' আন্দোলনে। এই আন্দোলন নারীকে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের কাছে এক বিশেষ বার্তা বহন করে। বেসান্ত মনে করতেন যে, নারীর প্রগতি তাঁর মুক্তির উপর নির্ভরশীল। নারীর অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, পুরুষ কেন আন্দোলন করছে এবং নারীর সেখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। হোমরুল আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে নারীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে।

১৯১৯-২০ সালে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং অনেক বেশি সংখ্যায় নারীকে সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গিনায় নিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীরা ছিল তাঁর প্রধান 'বাহিনী'। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন নারীদের পরোক্ষ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে। আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় তাঁরা প্রধান সহকারিণী ছিলেন অনুসূয়া বেহেন (সূতি বস্ত্র শিল্পের মালিক অম্বালাল সরাভাইয়ের ভগ্নী)। গান্ধীজীর চুম্বকসম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্বচ্ছতা নারীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সাথে ১৯২০সালে গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে নারীরা বিভিন্ন

মিছিলে অংশগ্রহণ করে। খদ্দর এবং চরকার ব্যবহারের কথা প্রচার করে এবং কেউ কেউ সরকারী স্কুল ও কলেজ পরিত্যাগ করে। গান্ধীজীর বাণী নারীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে এবং অনেকে তাদের টাকাপয়সা ও গহনা দান করে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র যখন চাঁদা সংগ্রহ করছিল, তখন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর সোনার বালাজোড়া দান করেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল যে তিনি আরো বেশি কিছু দিতে পারলেন না।

বাসন্তীদেবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় যান এবং নারীদের বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও পিকেটিংয়ের নেতৃত্ব দেন। ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করার জন্য ঊর্মিলাদেবী এবং সুনীতিদেবীর সাথে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁরা মুক্তি পান। তাঁদের গ্রেপ্তার জনসাধারণকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করে। ১৯২২ সালে বাসন্তীদেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হয় এবং এই ঘটনা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাবে একজন বাঙালী নারীকে নিয়ে আসে। এই বছরে কস্তুরবা গান্ধী গুজরাট প্রাদেশিক সভার সভাপতিত্ব করেন এবং নারীদের কাছে চরকায় সুতো কাটা ও খাদি বস্ত্র ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানান। এলাহাবাদে রামেশ্বরী নেহেরু "কুমারী সভা" গঠন করেন যেখানে মেয়েদের গণ আলোচনায় বক্তব্য রাখতে ও বিতর্কে অংশ নিতে শেখানো হয়। হেমপ্রভা মজুমদার অনেক পুলিশি অত্যাচার সহ্য করেন এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মতে তিনি "জেলের বাইরে একমাত্র পুরুষ"। বি. আম্মান (সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা) তাঁরা অবগুণ্ঠন সরিয়ে জনসমক্ষে বক্তৃতা এবং খাদীর ব্যবহার ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা প্রচার করেন। বাসন্তীদেবীর ননদ ঊর্মিলাদেবী স্বরাজ্যের মূল মন্ত্র নিঃশব্দে প্রচার করেন এবং মহিলাদের মধ্যে চরকা প্রচলন জনপ্রিয় করে তোলার জন্য 'নারী কর্মমন্দির' এর কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেন।

নারীরা একত্রিতভাবে জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করেন। বাংলায় লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের সৃষ্টি হয়। প্রায় ছয় মাস ধরে এই সংঘের সদস্যরা পিকেটিং অভিযানের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঊর্মিলাদেবী নারী সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন এবং সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে মিছিল বার করেছিলেন। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (সিংহলে শিক্ষকতা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন), হেমপ্রভা দাস প্রভৃতি ছিলেন এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা। নারী পিকেটিং বোর্ড গঠিত হয়। এই সংস্থার অনেকগুলি শাখা ছিল। যথা - বয়কট এবং পিকেটিং শাখা; স্বদেশ প্রচার শাখা যেখানে খাদি ব্যবহারের কথা প্রচার করা হত; প্রভাত ফেরী শাখা-যারা বিভিন্ন মিছিলের আয়োজন করতেন; সংগঠনমূলক শাখা — যেখানে চরকা ব্যবহারের পন্থা শেখানো হত এবং তাদের তৈরী সুতো বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারের সাথে পরিচয় করানো হত ইত্যাদি। সংগঠন বিদেশী দ্রব্য বয়কটের উদ্দেশ্যে, হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য, পর্দা এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য মহিলা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

রাজনীতিতে সরোজিনী নাইডু, ঊর্মিলাদেবী ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি মহিলাদের প্রবেশ জাতীয়তা আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নারী জগতের কাছে সত্যিকারের প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, নারী পরিচিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয়েছে যে মহিলারা প্রতিদিন রাস্তায় নামেন এবং পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য উৎসাহীদের সমবেত করে গান গাইতে থাকেন এবং দোকানদার ও সাধারণ মানুষদের বিদেশী

দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার জন্য সর্নির্বন্ধ অনুরোধ করতে থাকেন। জনসমাবেশ ও মিছিলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অমান্য করার মধ্য দিয়ে মহিলাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব সত্ত্বেও প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত এবং তারাই প্রধাণতঃ যোগদান করেছিল — যাদের পিতা, স্বামী বা পুত্র এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং জেলবন্দী হয়েছে।

১৯৩০ সালে স্বাধীনতার জন্য মানুষ আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে ডাণ্ডি অঞ্চলে অভিযান করে লবণ তৈরীর মাধ্যমে সরকারের লবণ তৈরীর একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী ১২ই মার্চ, ১৯৩০ সালের এই অভিযানে তাঁর ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে কোন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। যখন আশ্রমের মহিলারা তাঁকে অনুরোধ করেন যে, অন্ততঃ চার-পাঁচ জন মহিলাকে তাঁর সাথে নেওয়ার জন্য, তিনি জানান যে এর জন্য পরে অনেক সময় আছে। নারীরা গান্ধীর এই মনোভাবের বিরোধিতা করেন এবং মহিলাদের 'ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ করে জানায় যে কোন অহিংস আন্দোলনে লিঙ্গ বৈষম্য অনুচিত এবং সদ্য জাগ্রত নারী সচেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

দাদাভাই নওরোজীর নাতনী খুরসীদ বেহন রাগতভাবে গান্ধীজীকে চিঠি লিখে জানতে চান কেন তিনি নারীদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখছেন। মৃদুলা সরাভাই নামে গুজরাট বিদ্যাপীঠের এক ছাত্রী অধ্যক্ষের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহিলারা নিজেদের কোন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বন্দী রাখতে অস্বীকার করেন এবং মনে করেন যে কোন মিছিল, মিটিং বা হাজতবাস তাদের অংশগ্রহণ ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়।

যদিও কোন মহিলা গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযানে তাঁর সঙ্গে যায়নি, কিন্তু তারা সর্বত্র তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করেছে। কারো কারো মনে হয়েছে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তাই তাঁকে 'দর্শন' করার জন্য একত্রিত হয়েছে। আমেদাবাদ থেকে ডাণ্ডী যাওয়ার পথে গান্ধী বৃক্তৃতায় বলেন যে নারীরা সমস্ত মদের এবং বিদেশী দ্রব্য বিক্রয়কারী দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করবে। তিনি নির্দেশ দেন চরকা কাটতে এবং খাদির কাপড় পরিধান করতে। হাজার হাজার রমণী সমুদ্র তীরে যায় এবং নিষিদ্ধ লবণ তৈরী করে ও অকল্পনীয় দামে নিলাম করে অর্থাৎ তারা ও সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করে।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন কিভাবে এই অশিক্ষিত নারীরা সমস্ত ভয় বিপদ অগ্রাহ্য করে আইন অমান্য আন্দোলনকে সার্বজনীন করে তোলেন। তারা প্রত্যেক গৃহকে আইন ভঙ্গকারীদের মন্দিরে পরিণত করেন। সর্বোচ্চ সামরিক শক্তিও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না যেখানে প্রত্যেকটি ঘরেই সেই আন্দোলনের অস্তিত্ব। তারা শোভাযাত্রা করে, বানর সেনা গঠন করে, প্রভাত ফেরীর আয়োজন করে প্রভাতকালে তাদের গানের মাধ্যমে গান্ধীজীর ডাকা আন্দোলনে তারা মানুষকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করে। বিভিন্ন মিটিংয়ে তারা বক্তৃতা করে। সাহিত্যের লেখা বিক্রি করে এবং সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও গ্রেপ্তারীর জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ তাদের ভয় দেখানোর জন্য অনেককে বন্দী করে রাত্রে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়, জলের পাইপ দিয়ে তাদের ভিজিয়ে দেয়, লঙ্কা গুঁড়ো তাদের চোখে ছিটিয়ে দেয় এবং তাদের স্বামীদের অকথ্য ভাষায় অপমান করে ও সন্তানদের ছিনিয়ে নেয়। তাসত্বেও আন্দোলনের প্রথম দশ মাসের মধ্যে প্রায় ১৭,০০০ মহিলা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাদের জেলে পাঠানো হয়।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং অবন্তিকাবাই গোখেল প্রথম মহিলা সদস্যা-যাঁরা বম্বেতে লবণ আইন অমান্য করেন। কমলাদেবীর লেখা থেকে জানতে পারি যে মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে দেখতেন কীভাবে কোন অস্ত্র ছাড়া সাধারণ সূতির শাড়ী পড়ে এই অন্তঃপূর নারীগণ সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে জনসমক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তাদের সংঘর্ষকে একটি কাব্যে পরিণত করেছে। ধন্দোকেস্বব কারভে (প্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) নারীদের এই লবণ আইন ভঙ্গের শোভাযাত্রা দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, বছরের পর বছর ধরে তিনি যা পারেননি, সবরমতীর এই যাদুকর তাঁর একটি ছোঁয়ায় তা সম্ভব করেছেন। ও'মালি মন্তব্য করেছেন যে তাঁর অভিযানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ডাক মহিলাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

কমলাদেবী, সরোজিনী নাইডু, হনসা মেহেতা, জয়শ্রী রাইজী তিলকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১লা আগষ্ট, ১৯৩০ সালে বোম্বেতে একটি শোভাযাত্রা বের করেন। পুলিশ তাদের বাধা দান করলে তাঁরা সারা রাত বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় অবস্থান করেন। হনসা মেহেতা প্রমুখেরা 'দেশ সেবিকা সংঘ' তৈরী করেন। বোম্বেতে পিকেটিংয়ের কাজ এত ভালভাবে চলে যে পুলিশ তা আইন বিরোধী বলে ঘোষণা করে। শহরের চারিদিকে মহিলাদের দেখা যেত। তারা হয় মদের বা বিদেশী কাপড়ের দোকানের বাইরে বসে আছে এবং চরকা কাটছে ও নিঃশব্দে সমস্ত ভারতীয়দের সেইসব দোকান থেকে জিনিস কেনার ব্যাপারে সতর্ক করছে।

মাদ্রাজে লবণ সত্যাগ্রহ টি, প্রকাশনের নেতৃত্বে শুরু হয়। তাঁর গ্রেপতারের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দুর্গাবাই। তিনি একমাস এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন এবং পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে ভেলোরের সেন্ট্রাল জেলে একবছর কারাবন্দী রাখা হয়। অনেক মহিলারা প্যাকেটে নুন বিক্রি করতেন বা টাকা যোগাড়ের জন্য নিলামও করতেন।

গুজরাটে সবরমতী আশ্রমে নারী সত্যাগ্রহীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আমেদাবাদে কস্তুরবা গান্ধী, সরলাদেবী সরাভাই, মৃদুলা সরাভাই প্রমুখ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেন। হাজার হাজার ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং গৃহবধূরা প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করে এবং অনেক 'কৃপান' নিয়ে রাস্তায় ঘুরতেন। গঙ্গাবেইন বৈদ্য ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩১ সালে ১২০০ মহিলাদের নিয়ে বরসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পুলিশ লাঠি চালায়, গঙ্গাবেহেনকে আহত করে কিন্তু তিনি ত্রিরঙ্গা পতকা নিজে আঁকড়ে ধরে রাখেন। কলিকাতায় নারী পিকেটিং বোর্ড গঠিত হয় এবং বিভিন্ন নারী সংস্থা — যথা, রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ, নিখিল জাতীয় নারী সংঘ, লবণ আইন অমান্য করে এবং নারীদের এই আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করে।

দিল্লীতে অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েক শতক রমণী আদালত চত্বরে গিয়ে আইনজীবিদের পদত্যাগ করতে অনুরোধ করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পত্নী সত্যাবতী যমুনা নদীতে স্নানের জন্য যে সব বড় ঘরের মহিলারা আসতেন, তাদের অননুয় করেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে। দিল্লীর নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঞ্জাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয় পাঁচ হাজার নারীর শোভাযাত্রার দ্বারা। প্রভাত ফেরী, মিটিং এবং পিকেটিং দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। লালা লাজপত রায়ের কন্যা পার্বতী দেবী লাহরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পাঞ্জাবে সাগর না থাকায় জওহরলাল নেহেরুর পরামর্শ অনুযায়ী তারা

রবি নদীর তীরে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। অনেক জায়গায় নারীরা কংগ্রেস কর্মীদের আশ্রয় দান করে এবং গোপন খবর আদান প্রদানের দূত হিসেবে কাজ করে।

প্রায় সমগ্র ভারতে একই চিত্র দেখা যায় — নারীরা সদল বলে শোভাযাত্রা করেছে, দেশাত্মবোধক গানের দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিদেশী দোকানগুলিতে পিকেটিং করেছে। জওহরলাল নেহেরু নইনি কারাগার থেকে লিখেছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনে ৮০,০০০ মানুষ কারাবরণ করেছে এবং তার মধ্যে ১৭,০০০ জনই মহিলা। সমস্ত দেশ নারী জাতির এই ভূমিকায় গঠিত। ১৯৩১-শে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে নারীদের জাতীয় আন্দোলনে তাদের ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

একটি সাক্ষাৎকারে মহিলারা জানান যে পুরুষের সাথ কাঁধ মিলিয়ে নারীদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ মহিলাদের সমস্ত ভয় বিপত্তি জয় করতে সাহায্য করেছে এবং নারী মুক্তির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এটি সবচেয়ে বড় অবদান। গান্ধীজীর মধ্যে তারা একজন বিচক্ষণ পিতা ও স্নেহশীল মাতাকে পেয়েছেন-যাঁর ভালবাসার কাছে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ নিমেষে দূর হয়ে যায়। গান্ধীজীর সমালোচকেরা মনে করেন যে নারীদের দ্বায়িত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার আবিষ্কার মহাত্মার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব।

গান্ধীজীকে ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ নেতৃত্ববিহীন। কংগ্রেসের সমস্ত বরিস্ট নেতা তখন কারাগারে বন্দী। চারিদিকে এই খবর ছড়িয়ে পরার সাথে সাথে হরতাল শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজীর 'ডু অর ডাই' স্লোগান মানুষকে উদ্দীপিত করে। কৃষক, শ্রমিক, আইনজীবি, ছাত্র এবং নরনারী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারীরা আগের পন্থাগুলি — যথা, মিছিল বের করা, বক্তৃতা দেওয়া কংগ্রেসের পত্রিকা বিলি করার মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখল না। তারা মাটির তলায় বেতার স্টেশন পরিচালনা করে, বোমা তৈরী করে, পুলিশ থানা লুট করে বা সরকারী অফিস উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্ট করে। আসামে কমলা বরুয়া নামে এক তরুণী পাঁচশো জনের এক মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। বোম্বেতে ঊষা মেহেতা মাটির নীচে বেতার ব্যবস্থা চালনা করেন। আগষ্ট থেকে ১৩ই নভেম্বর প্রতিদিন সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় কংগ্রেসের খবর প্রচারিত হত যতদিন না ঊষা মেহেতা এবং তাঁর সঙ্গিনীরা পুলিশের কাছে ধরা পরে। তাঁকে চারবছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ইয়েরওয়াড়া জেলে ২৫০ জন রাজনৈতিক মহিলা বন্দিনীদের সাথে রাখা হয়েছিল। নারী বাহিনীর উপর পুলিশ কেবল মাত্র লাঠি চালিয়ে ক্ষান্ত হয় না, অনেক জায়গায় তাদের অকথ্য অপমান, আঘাত এবং ধর্ষণেরও শিকার হতে হয়েছিল।

বাংলার মেদিনীপুর জেলাতে ৪২এর আগষ্ট আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কাঁথি, তমলুমক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা থানা ও সরকারী ভবন দখল, রেললাইন ওপড়ানো, ডাক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়ার মত জঙ্গী কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। মেদিনীপুর ছাড়া যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এই আগষ্ট বিপ্লবের জোয়াড়ে ভেসে গিয়েছিল। মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের ধমকানি অগ্রাহ্য করে ত্রিরঙ্গা পতাকা নিয়ে এগিয়ে যান এবং পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। বোম্বাই শহরে ও আগষ্ট বিদ্রোহে পুলিশের লাঠিতে গুরুতর জখম হন সর্বভারতীয় ছাত্রনেত্রী নাগিসি বাটলিওয়ালা।

গান্ধীজী মনে করতেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুরুষের ভূমিকা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে নারীর অবদান। তাঁর সেই আশা ব্যর্থ হয়নি। তারা নিজেদের সর্বস্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাদের

সম্পদ, দক্ষতা, শ্রম, আত্মবলিদান দিয়ে আন্দোলনকে সফল করতে চেয়েছিল। গান্ধীজী একদা বলেছিলেন যে শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনে নারী হয়ত পুরুষ কর্মীদের থেকে এগিয়ে যাবে। তাঁর বিভিন্ন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সেই কথাটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

৭.১.৩ ঃ বিপ্লবী আন্দোলন এবং নারী

যখন হাজার হাজার নারী গান্ধীজির ডাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেছে। তখন তাদের মধ্যে কারো কারো কাছে গান্ধীজীর অহিংস পন্থা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯০৫ সালে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে মহিলারা বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল। সরলাদেবী চৌধুরাণীর ময়মনসিংহের সুহৃদ সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি পাঞ্জাবের বহু জায়গায় নারীদের জন্য আর্য সমাজের মহিলা শাখা চালু করেন। ভারতের বাইরে থেকে ম্যাডাম কে. আর. কমা. বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বিদেশ থেকে বিপ্লবীদের জন্য নিষিদ্ধ বিভিন্ন লেখা এবং অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। তিনি ১৯০৯ সালে 'বন্দেমাতরম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের 'প্রেস অ্যাকট'-এর তার বিরোধিতা করেন। তিনি সাভারকারের 'অভিনব ভারত'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালে 'ইণ্ডিয়ান হাউস' লণ্ডনে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার মধ্যে বিপ্লবীদের ভবিষ্যত কর্মসূচীর বীজ নিহিত ছিল। তিনি মনে করতেন যে সফলতা ততদিন আসবে না যতদিননা পর্যন্ত নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

বিভিন্ন ধরনের নারী সংগঠন, নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শ ও তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, নিষিদ্ধ পুস্তিকা এবং লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবধারা তখন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছিল। আকস্মিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার কবলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেয়েদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না কারণ বাংলাদেশ সবসময় আকৃষ্ট হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে। ১৯২০ সালে তাঁদের অনেকে প্রকাশ্যভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। ১৯২৪ সালে ঢাকাতে লীলা রায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'দীপালি সংঘ' নামে সংগঠন গড়েন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৩০ সালে লীলা রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'জয়শ্রী' পত্রিকা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও নারী জাতির সার্বিক বিকাশ ও শিক্ষার প্রসার এই সংগঠনের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকাতে দীপালি ছাত্রীসংঘের অন্যতম সদস্যা ছিলেন রেণুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দোর, বীণাপাণি রায় প্রমুখ। ১৯২৮ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছাত্রীসংঘ'। বিপ্লবী অনিল রায় ছিলেন 'ছাত্রী সংঘের' প্রধান পরিচালক। দীপালি সংঘ গোপনে নারী কর্মী নিয়োগ করার কাজ করত এবং এদের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করা হত।

তিরিশের দশকে বিপ্লবী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলেজের ছাত্রীরা গুপ্ত সমিতিতে বেশী যোগদান করত। কল্পনা যোশী (দত্ত) এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দোর চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ এর ১৪ই ডিসেম্বর দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিফেন্সকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেন তারই কামরায়। ১৯৩২ এর ফ্রেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস নামে এক তরুণী গভর্ণর স্টানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন এবং গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ এর সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে আক্রমন করে ২১ বছর বয়স্কা তরুণী বীরাঙ্গনা প্রতিলতা

ওয়াদ্দোর এবং তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বহু ইংরেজকে হতাহত করেন। ধরা পড়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর বীরত্ব মেয়েদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে। এইভাবে উজ্জ্বলা মজুমদার, ঊষা সেন প্রমুখরা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৩০-৩২ এর সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েরা ব্যাপক অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজে যে অংশটি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিল তার অধিকাংশই ছিল অল্পবয়সী তরুণী এবং ছাত্রী বা সদ্য ছাত্র জীবন শেষ করা শিক্ষিতা ভদ্র পরিবারের মেয়েরা। মুসলিম পরিবারের মহিলারা বা দরিদ্র পরিবারের রমণীরা বেশির ভাগ সময় অংশগ্রহণ করত না। বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনাপর্বে নারীর ভূমিকা অনেকাংশে ছিল গৌণ এবং তা পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত। তারা পুরুষের সহকারী হিসেবেই সাহায্য করত, নেতৃ হিসেবে নয়। 'অনুশীলন', 'যুগান্তর', 'শ্রীসংঘ', হেমচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স', মাষ্টারদা সূর্য সেন পরিচালিত 'চট্টগ্রাম বিপ্লবী দল' — এইসব গুপ্ত সমিতিতেই নারী সমাজ বা ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ বা সেল গঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে দ্বিতীয় পর্বে নারী সমাজের চেতনা অনেক প্রসারিত হয় এবং তাদের পুরুষের প্রতি নির্ভরতা হ্রাস পায়। পুরুষ বিপ্লবী নেতারা অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী ও সহযোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করে। নারী বিপ্লবীরা মনে করে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা কোন অংশে দুর্বল নয়। বাঙালী হিন্দু পরিবারের যাবতীয় রক্ষণশীলতা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দিল্লীতে শ্রী চন্দ্র শেখর আজাদের কারখানায় ১৭বছর বয়সী রাজবতী জৈন বোমা তৈরী করতেন। সুশীলা দেবী (আরেকজন বিপ্লবী) আঙুল কেটে ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তর কপালে তিলক লাগিয়ে দেন। ভগৎ সিংয়ের সাথে যোগাযোগের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্গা দেবী বোম্বের হ্যামিলটন রোডে পুলিশ সার্জেনকে গুলি করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁকে দিল্লীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

এই তরুণীদের মনে আদর্শবাদ এবং আবেগ একান্ত হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এবং বৈপ্লবিক সাহিত্যে তাদের মনে এক রোমান্টিক ভাবধারার জন্ম দেয়। তারা ইউরোপীয়দের জীবন নাশের জন্য তৎপর হয়। তারা ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির রাজনৈতিক হঠকারিতা পরিত্যাগ করে ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলনের মূল ধারায় ফিরে আসেন।

৭.১.৪ ঃ কৃষক এবং শ্রমিক মহিলাদের আন্দোলন

১৯২৭ সালে সর্বভারতীয় নারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত গঠনে সচেষ্ট হয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে নারীদের আন্দোলনের রাজনীতিকরণ ঘটে এবং কৃষক মহিলারা আন্দোলনে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু কৃষক মহিলারা বেশির ভাগই ছিল অসংগঠিত। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাজনীতি গ্রামীণ জীবনে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করে। মেদিনীপুর জেলায় কন্টাই, তমলুক, রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকেরা কর দিতে অস্বীকার করে। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন মধ্যবিত্ত এবং কৃষক মহিলাদের প্রভাবিত করেছিল। মধ্যবিত্ত মহিলাদের সাথে কৃষক রমণীরাও মিটিং, মিছিলে যোগদান করে, সেচ্ছাসেবী বাহিনীতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে

এবং নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি করে। কৃষকদের উপর নির্মম পুলিশি অত্যাচার চলে। স্বামী বা ভাইয়ের সাথে কৃষক মহিলারাও অত্যাচরিত হয় এবং গ্রাম ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে এই মহিলারা অনেক সময় বন্দীদের আশ্রয় দিত এবং গ্রামে পুলিশ ঢুকলে শঙ্খ বাজিয়ে তারা গ্রামবাসীদের সতর্ক করত। ১৯২৮শে গুজরাটে বারডোলি সত্যাগ্রহর (কৃষকের সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে) সময় কৃষক মহিলারাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৯৪২ সালে মাতঙ্গিনী হাজরা, একজন কৃষক রমণী, তমলুকের দিকে একটি শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সুতাহাটায় গ্রামীণ মহিলারা 'ভগিনী সেনা শিবির' গঠন করে এবং পুলিশ থানা ঘেরাও অভিযানে তারাই নেতৃত্ব দেয়। মহীশাদল, কণ্টাই বিভিন্ন জায়গায় কৃষক, পুরুষ এবং নারী একসাথে পুলিশ থানা আক্রমণ করে এবং গুলিবিদ্ধ হয়।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই অবস্থায় কমিউনিস্ট দলের নারী কর্মীরা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করে। তারা শ্রমিক এবং কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করে। যেহেতু গ্রামীণ মহিলারা সচেতনার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। তাই তাদের সংগঠিত করার কাজ উপর থেকেই হয়েছিল। নেতারা পিছিয়ে পড়া নারীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। গ্রামে কৃষক মহিলাদের সাথে কথা বলা বা আলোচনা করা কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ ঘরের কাজে সারাদিন তারা ব্যস্ত থাকত। এই মহিলারা যখন রান্নাঘরে বা ঢেঁকেতে কাজ করত, তখন বিভিন্ন সংগঠনের মহিলারা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ভূস্বামীদের সঙ্গে কৃষকদের জমির সম্পর্ক নানা ধরনের এবং তা বহু স্তরে বিভক্ত। জমিদাররা পরবর্তীকালে শহরবাসী হওয়ায় বহু মধ্যবর্তী স্বত্বভোগীর সৃষ্টি হল। এদের সুবিধা অনুযায়ী এরা-ও কৃষকের সঙ্গে জমির নানারকম বন্দোবস্ত করতে থাকে। এই সম্পর্কের একটি হলো 'আধিয়ার' বা ভাগচাষ সম্পর্ক। আধিয়ার বন্দোবস্তের মানে হলো — মালিকের জমি কৃষক চাষ করলে ফসল ওঠার পর তা দুভাগে ভাগ হবে — এর একভাগ মালিকের, অন্যভাগ কৃষকের। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যায় যে চাষের খরচটা সম্পূর্ণ কৃষকের ঔপর চাপানো হয়। চাষ করার সময় এই অর্থ কৃষককে ধার করতে হয়। অর্ধেক ফসলের ভাগ ছাড়াও জোতদারকে এই কর্জ শোধ করতে কৃষকের ফসলের অনেকাংশ চলে যেত। এই আধি প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের ন্যায় সঙ্গত বিক্ষোভ বহুদিন ধরেই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ১৯৪৬ সালের শেষদিকে তা ফেটে পড়ে। বর্গাদারদের দাবী ছিল যে জমিতে আইনমাফিক অধিকার দিতে হবে। ফসল তিন ভাগে ভাগ করা হবে — একভাগ হবে চাষীর, একভাগ জোতদারের এবং তৃতীয়ভাগ চাষী পাবে খরচা-খরচ বাবদ অর্থাৎ কৃষক পাবে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। ময়মনসিংহ, মালদা, দিনাজপুর, যশোর, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। কৃষকদের রণধ্বনি হলো — 'জান দেব তবু ধান দেব না'। জমির মালিকের সাহায্যে গ্রামে লাঠি আর বন্দুকধারী পুলিশ ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথম পর্বে ধান কাটা নিয়ে লড়াই চলল। পুলিশের সঙ্গে মালিকপক্ষ গুণ্ডা দিয়ে ফসল তোলা শুরু করল। ভাগচাষী মাঠে নামলে লাঠি গুলি চলতে লাগল। দ্বিতীয় পর্বে যখন কৃষক নিজের গোলায় ধান তুলতে পেরেছে, তখন তার ধান লাঠি ও গুলির সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হত এবং সেটা না পারলে ধানের গোলায় এবং কৃষকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। গোলার ধান বাঁচাতে বহু কৃষক ও কৃষক বধূর প্রাণনাশ হয়েছিল।

মণিকুন্তলা সেন এই প্রসঙ্গে কৃষক মেয়েদের ভূমিকার চিত্র তাঁর 'সেদিনের কথা'য় তুলে ধরেছেন।

প্রথম থেকেই এই ধরনের লড়াইতে কৃষক মেয়েরা দল বেঁধে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামে গ্রামে পুলিশদের মধ্যে কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করার একটা উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল। মেয়েদের এবার সামনের সারিতে দাঁড়াতে হলো। তাদের আদিম অস্ত্র — দা, বটি, ঝাঁটা, লঙ্কার গুঁড়ো প্রভৃতি নিয়ে। পুলিশ আসছে জানতে পারলে মেয়েরাই শঙ্খধ্বনি করে গ্রামবাসীদের কাছে সংকেত পৌঁছে দিত এবং ছেলেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিত। নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটাও মেয়েরাই করত। মেয়েরা পুলিশের হাতে মুখোমুখি লড়াই করত, ধানের গোলায় আগুন লাগলে মেয়েরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নেভাত। তারা অত্যাচারিত হত এবং যা পেত তাই দিয়ে প্রত্যাঘ্যাত করত। কিন্তু পুরুষদের সামনে আসতে দিত না। পুরুষদের না পাওয়ায় পুলিশ এবং গুণ্ডা মেয়েদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে।

'স্বাধীনতা' রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে আন্দোলন চলাকালীন মেয়েদের উপর কিভাবে অত্যাচার করা হত। তাদের বাড়ী থেকে হিঁচড়ে টেনে আনা হত এবং নগ্ন করে বেত মারা হত। অনেক নারীকে শাস্তি স্বরূপ ধর্ষণ করা হত। বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মহিলারা নারী বাহিনী তৈরী করে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ তাদের ঘেরাও ভেঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না। বিমলা মাঝি মেদিনীপুর জেলায় নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে প্রথমে গ্রামের মহিলারা কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পেত। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা ঘরের ভিতর থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল। বিমলা দেবীর নেতৃত্বে জোতদারদের ধানের গোলা নষ্ট করা হল এবং নদীতে চলা ছোট ছোট স্টীমারগুলির কাছে ধান বিক্রি করে দেওয়া হল।

বর্গাদার চাষী বা কৃষক শ্রমিক মহিলারা সবচেয়ে বেশি শোষিত হত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একদিকে তারা ঘরে অত্যাচারিত হত এবং অপরদিকে জমিদার ও জোতদাররা তাদের শোষণ করত। ফলে আন্দোলনের সময় তাদের যোদ্ধা মনোভাব প্রকাশ পায়। তারা নারী বাহিনীর সাহায্যে ফসল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলেও কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। সামন্তপ্রভু বা দেশমুখদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকরা প্রতিবাদ করে। দেশমুখরা কৃষকদের দিয়ে বেগার শ্রম বা 'ভেট্টি চকরী' আদায় করত। এই ভেট্টি চকরী প্রথা গ্রামের মানুষদের প্রায় দেশমুখদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। কৃষক রমণীরা সামন্ত প্রভুদের জমিতে কাজ করত এবং মাঝে মাঝে প্রভু ও তার ছেলেরা মহিলাদের ধর্ষণ করত। 'আরোবাপা' বলে মহিলারা ছিল পুরোপুরি ক্রীতদাস। তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জমিতে কাজ করতে হত এবং কাউকে কাউকে প্রভু তার উপ-পত্নী করে রেখে দিতেন।

কৃষকেরা দেশমুখদের তাদের জমি হস্তগত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। দলে দলে নারী পুরুষ স্লোগান দিতে থাকে — 'জমিদারী প্রথা নিপাত যাক' বা 'বিপ্লব জিন্দাবাদ'। হাজার হাজার কৃষক, ভাগচাষী এবং মহিলারা একত্রিত হয়ে লাঠি নিয়ে দেশমুখদের শস্যভাণ্ডার আক্রমণ করে এবং ধান ভাগ করে নেয়। তারা জমি সংক্রান্ত মিথ্যা দলিলগুলি যার দ্বারা দেশমুখ জমি হস্তগত করতেন, সেইগুলি পুড়িয়ে ফেলে। নারীরা এই বেগার প্রথার বিরুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হয়। তারা জমিদারদের ভিলা ঘেরাও করে রাখে, নিজামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা পুলিশের আক্রমণের জবাব দেয়, লঙ্কা ছিটিয়ে দেয় এবং তাদের স্বামী সন্তানদের গ্রেপ্তার করলে তারা পুলিশের লরিগুলিকে ঘিরে রাখে। অনেক লেখা থেকে জানা যায় যে তারা অনেক সময় পুলিশকে বাধ্য করেছে তাদের স্বামীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য।

উইমেন কমিটি রিপোর্ট (১৯৭৫) থেকে জানা যায় যে, ঔপনিবেশিক আমল থেকে শিল্প এবং কৃষি কাজে (যা ৮০ শতাংশ মহিলাকে নিযুক্ত করত) অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

সাল	মোট শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা (%)
১৯১১	৩৪.৪৪
১৯২১	৩৪.০২
১৯৩১	৩১.১৭
১৯৫১	২৮.৯৮

(সূত্র ঃ স্ট্যাটাস অফ উইমেন কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৫)

সূতী বস্ত্র শিল্পে, চর্মজ শিল্পে, রেশম শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বোম্বেতে সূতী বস্ত্র কারখানায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২৪.৬ (১৮৯২ সাল) শতাংশ থেকে ১৪.৯ (১৯৩৯ সাল) শতাংশে নেমে আসে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ১৯৩১ সালের পর থেকে রাত্রে কাজ করা বৃদ্ধি পায় এবং মহিলাদের সন্ধ্যে সাতটার পর কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া যাদের সন্তান ছিল, তাদের কাজের যোগ্য বলে মনে করা হত না। ধাতু, বনচায়না ব্যবহারের সাথে সাথে গ্রামে মাটির তৈরী জিনিসের চাহিদা কমতে থাকে এবং মেয়েদের অধাতু শিল্পে নিয়োগ হ্রাস পায়। অবশ্য তামাক কারখানায় মহিলাদের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

ফলে শ্রমিক যোগাড় দিত সর্দাররা। শ্রমিক সংগ্রহ করা হত প্রধানত বিহার, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশ থেকে। এইসব শ্রমিকদের মধ্যে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যাও অনেক। পটারী, সিল্ক, বিড়ি তৈরী ইত্যাদি শিল্পে মেয়ে মজুরদের সংখ্যা প্রায় দশহাজারের মত ছিল। সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিকভাবে অত্যাচারিত হত এইসব মেয়ে শ্রমিকেরা, কুলি কামিনরা। চটকল এলাকায় অসামাজিক জীবন জাপানের জন্য শতকরা একশজন মেয়েই যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হত। কলকারখানায় মেয়ে শ্রমিদের বেতন ছিল খুবই সামান্য। কাজের কোন স্থায়িত্ব ছিল না, কাজে রাখার জন্য মাইনের একাংশ দিয়ে সর্দার ও শ্রমিকদের খুশি রাখতে হত। প্রগতিশীল মহিলা নেত্রীদের মধ্যে সন্তোষকুমারী গুপ্ত, চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে মহিলা শ্রমিক নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রভাবতী দাশগুপ্ত ১৯২৮ সালে কলকাতা ও হাওড়ায় ধাঙর ধর্মঘটের এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে চটকল ধর্মঘটে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। শ্রমিকরা তাঁকে ভালবেসে 'ধাঙড় মা' বলত।

৭.১.৫ ঃ আদিবাসী মহিলাদের ভূমিকা

জমিদার জোতদারদের দ্বারা কৃষকেরা শোষিত হত। তবে আদিবাসী এবং কৃষক নারীরা ছিল অত্যাচারের মূল শিকার। তাদের কোনরকম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। জমির মালিক এবং তার লোকের দ্বারা তারা নিপীড়িত হত। জমিদারদের বাড়ীর কাজ এবং মাঠে ধান চাষে তারা সাহায্য করত যদিও তাদের পরিষেবার কোন স্বীকৃতি ছিল না। বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবার বিয়ে ঠিক করত। পশুর মত তাকে হস্তান্তরিত করা হত।

ঘরে এবং বাইরে তারা মানব অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত ছিল। তাছাড়া জোতদার এবং তার পুত্ররা খেয়ালখুশি-মত আদিবাসী রমণীদের ভোগ করত বা ধর্ষণ করত। তাই এককথায় বলা যেতে পারে যে, সামন্ততন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্র তাকে দুভাগে শোষণ করত।

ময়মনসিংহের উত্তরে আদিবাসী প্রতিরোধের সূচনা হয়। তাদের 'টঙ্কা-খাজনা' জমির মালিককে দিতে হত (নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য প্রভুকে দেওয়া)। তাছাড়া বেগার বা 'ননকড়ি' মাধ্যমেও খাজনা শোধ করতে হত। ১৯৩৭ সালে হাজং আদিবাসীরা ঘৃণ্য টঙ্কা প্রথা উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তারা সাময়িকভাবে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। নারীরা পুরুষদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। আরেকটি আন্দোলন শুরু হয় যখন জমিদাররা আদিবাসীদের বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে বাধা দেয়। তারা গুণ্ডা পাঠিয়ে হাজংদের শায়েস্তা করতে চায়। হাজং মহিলারা তাদের চপার দিয়ে আক্রমণ করে।

তেভাগা আন্দোলনে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নারী পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হাজং মহিলাদের নেতৃত্ব দেন একজন মধ্য বয়সি বিধবা মহিলা রাসমণি। তারা পুলিশের হাত থেকে গ্রামকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে। রাসমণি তার নারী বাহিনীদের দিয়ে সরকারী সৈন্যদের আক্রমণ করে যখন তারা জানতে পারে যে গ্রামের তিনজন মেয়েকে সৈন্যরা তুলে নিয়ে গেছে। সৈন্যদের গুলি অস্বীকার করে তার ছোঁড়া দিয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুবরণ করে। তার সেচ্ছাসেবী বাহিনী তিন ঘন্টা যুদ্ধের পরে সৈন্যদের পরাজিত করে। ময়মনসিংহের হাজং মহিলারা বাংলার অন্যান্য আদিবাসী মহিলাদের মত তেভাগা আন্দোলনে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তারা নারী বাহিনীর সাহায্যে শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার প্রতিরোধ করেছিল। ওরাং মহিলারাও জোতদারদের ধানের গোলা আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র পুলিশদের সম্মুখীন হয়। জলপাইগুড়ি দেবীগঞ্জ অঞ্চলে পুণ্যেশ্বরী দেদা, একজন রাজবংশী বিধবা মহিলা পুরুষরা না এগিয়ে আসায় নিজেই মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। লাল পতাকা নিয়ে এই অশিক্ষিত আদিবাসী মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে স্লোগান দিত।

৭.১.৬ ঃ উপসংহার

এইসব বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে মহিলারা গৃহকোণ থেকে রাজনীতি ও ক্ষমতার জগতে প্রবেশ করেছিল — যা ছিল একমাত্র পুরুষদের আধিপত্য। শ্রীমতী ভারতী রায় 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলা দেশের নারী জাগরণ' প্রবন্ধে (বই = ভারত ইতিহাসে নারী) বলেছেন যে, মেয়েদের জীবনে মা বা স্ত্রী হওয়াই তাদের জীবনে চরম পূর্ণতা এনে দেবে, একথা আর সত্যি রইল না। তারা অনুভব করে যে মাতৃভূমির প্রতিও মেয়েদের দায়বদ্ধতা আছে। বিভিন্ন আন্দোলনে তারা প্রমাণ করেছিলেন যে তারা পুরুষদের সমান কঠিন লড়াই লড়তে পারেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল নারীদের আন্দোলন।

৭.১.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Reference Books)

1. Asthana, Pratima : Women's Movement in India, (Delhi, 1974)
2. Custers, Peter : Women in the Tebhaga Uprising, (Kolkata, 1987)
3. (a) Dastur, Aloo J. Mehta, Usha H. : Gandhi's Contribution to the Emancipation of Women (Bombay, 1991)
   (b) Elwin, V.O. : Tribal Women, (Delhi, 1958)
4. Gandhi, M. K. : Women, (Ahmedabad, 1958)
5. Nanda, B R.(ed) : Indian Women from Purdah to Modernity, (New Delhi, 1976)
6. Sen, Sunil : The Working Women and Popular Movement in Bengal, (Kolkata, 1985)
7. Sen Gupta, Sankar : A Study of Women of Bengal, (Calcutta, 1970)
8. চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত) : ভারত-ইতিহাস নারী (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ কলকাতা, ১৯৮৯)
9. দে, বরুণ (সম্পাদিত) : মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯২)
10. সেন, মণিকুন্তলা : সেদিনের কথা।

৭.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। নারী মুক্তি সমন্ধে গান্ধীজীর মতামত আলোচনা কর।

২। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলিতে নারীদের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৩। বিপ্লবী আন্দোলনে নারীরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ?

৪। তেভাগা আন্দোলনে নারীদের অবদান বিশ্লেষণ কর।

৫। বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা আন্দোলন নারী জাগরণকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল ?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫
একক -১৪
Role of Mahila Atmaraksha Samiti (MARS)and the Communist Party & Environmental Movements

উদ্দেশ্য

সূচনা

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উত্থান:

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং তেভাগা আন্দোলন

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা

Environmental Movements

বিষ্ণোই আন্দোলন

চিপকো আন্দোলন

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

Silent valley movement

অ্যাপিকো আন্দোলন

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য:
আপনি এই পর্যায়টি পড়ে জানতে পারবেন
১. মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠন এর পূর্বের প্রেক্ষাপট
২. মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন
৩. তেভাগা আন্দোলনে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূমিকা
৪. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্যকলাপ
৫. স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী পর্বে পরিবেশ কেন্দ্রিক আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে

সূচনা:

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি:

বিংশ শতাব্দীর বাংলার নারী ইতিহাসের অন্যতম এক পর্যায় হিসাবে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কথা উল্লেখ করতেই হয়। অনেকক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ইতিহাসচর্চায় আমরা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলি কীভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে সেদিকে নজর দিতে ভুলে যাই অথবা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কী অবদান রয়েছে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পিছনে সেই ব্যাপারেও পপুলার হিস্ট্রি অনেকসময় উদাসীন থাকে।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক ছিল ঔপনিবেশিক ভারত তথা বিশ্ব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ঔপনিবেশিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এর কথা কম বেশী আমরা সকলেই শুনে এসেছি কিন্ত এই সমস্ত ঘটনাবলীর পাশাপাশি ১৯৪০ এর দশক নারী ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের সূচনার সাক্ষী হয়েছিল। ১৯৪২ এ কলকাতায় স্থাপিত হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এই সংগঠন রাজবন্দীদের মুক্তির দাবির পাশাপাশি মহিলাদের ফ্যাসিবাদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সোচ্চার করতে এবং তাদের আত্মরক্ষা মূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে তৎপর হয়েছিল।

১৯৪২ এ এই সংগঠনের স্থাপনা হলেও, এর ভিত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেই স্থাপন হয়েছিল বলা চলে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় একাধিক মহিলা সংগঠন সম্মিলিত হয়ে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। এই সংগঠন গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কংগ্রেস মহিলা সংঘ। উল্লেখ্য, এঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি আক্রমণ এর হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার্থে তাদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণও প্রদান করে। তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে অন্যতম ছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সংগঠিত করা এবং তাদের নিপীড়ণের হাত থেকে রক্ষা করা। তাদের এই আন্দোলন শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মিটিং এর মধ্যে দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সংগঠিত করার প্রয়াস করা হয়েছিল। প্রথম দিকে সেইরকম সাড়া না পেলেও ক্রমে নাটক, গল্প, গান এর মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই সংগঠন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি রূপে স্থাপিত হয়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উত্থান:

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান রেঙ্গুন দখল করলে, আত্মরক্ষার্থে ব্রিটিশ সরকার উপকূলীয় অঞ্চলের সমস্ত নৌকা ধ্বংস করে দেয় এবং ওই অঞ্চল গুলিতে কৃষিকার্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলস্বরূপ বার্মা থেকে খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি, খাদ্যের দামের দ্রুত বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য মজুতের পাশাপাশি বেকারত্বের হারও বৃদ্ধি পায় এই সময়। এমন চরম বিপর্যয়ের মধ্যে, ব্রিটিশ এবং মার্কিন সেনা যারা ইন্দো-বার্মা ফ্রন্ট পাহারা দিতে এসেছিল এবং রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্থানে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, তারা ক্রমবর্ধমানভাবে নারীদের উপর অত্যাচার করতে শুরু করেছিল। এই খবর অবশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপের কারণে। কিন্তু মুখের কথা এবং গানের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এই গানগুলির মধ্যে দিয়ে জাপানি, মার্কিন এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের দ্বারা নারীদের যৌন হেনস্থা এবং নিপীড়ণের কথা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রাম থেকে শহরে এবং শ্রেণী, জাতি নির্বিশেষে তাদেরকে একত্র হতে সাহায্য করেছিল।

খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি এবং যুদ্ধকালীন সমস্যার দরুন ১৯৪৩ এ বাংলার গ্রামাঞ্চলের লোকজন এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে , এই দুর্ভিক্ষ ছিল man-made অর্থাৎ মানুষের তৈরী করা বিপর্যয়। অনাহারে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হয়েছিল এই সময়। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ কার্যে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন নেত্রীরা। জিরাল্ডেইন ফোর্বস এর মতে, “During the famine years women were visible both as victims and activists.” (Women in Modern India Volume IV, .p.209) ১৯৪৩ এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচতে এবং অন্নের খোঁজে অনেক মানুষ গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে উঠে আসে সেই সময়। দুর্ভাগ্যবশত অন্নাভাব ও দুঃস্থ অবস্থার দরুন তাদের মধ্যে অনেক মহিলাই গণিকাবৃত্তিতে যেতে বাধ্য হয় কিংবা তাদের পতিতালয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। Women in Modern India Volume IV গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ১৯৪০ এর দশকে কলকাতার পতিতালয়গুলিতে মহিলাদের সংখ্যা দ্বিগুন হয়ে গেছিল।

মহিলাদের এইরকম পরিণতির হাত থেকে রক্ষার্থে ১৯৪০ এর দশকের কলকাতায় মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা এগিয়ে আসেন।

কেবলমাত্র কলকাতায় নয় বরং গ্রামে, মফস্বলে এই সময় এক নারী আন্দোলনের সূত্রপাত হতে দেখা যায় । যদিও এই আন্দোলন প্রথমে সংঘবদ্ধ ছিল না বরং এটি scattered বা বিক্ষিপ্ত ছিল তবে বিভিন্ন আঞ্চলিক মহিলা দল ও এর সাথে যুক্ত ছিল। এই বিক্ষিপ্ত গণ-আন্দোলনকে সংগঠিত ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে মহিলা আত্মরক্ষা লীগ হিসাবে। রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন, কমলা চ্যাটার্জি এবং শান্তি সরকার এর মত নেত্রীরা সংযুক্ত ছিল এই সমিতির সাথে। এছাড়াও নাজিমুন্নেসা আহমেদ, রাবেয়া বেগম, মুকসুদা বেগম, লায়লা আহমেদ এবং তাসমিনা খারুন এর কথাও আমরা জানতে পারি।

উল্লেখ্য, মহিলা নেত্রীদের নিয়ে All India Women Congress গড়ে উঠলেও, মণিকুন্তলা সেন এর মতে, AIWC যথেষ্ট ছিল না। যেখানে AIWC মূলত উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত নারীদের প্রাধান্য দিয়েছিল, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী ও কৃষক নারীদের নিয়ে সংগঠন গঠন গড়ে তুলতে ইচ্ছুক ছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন এর পাশাপাশি স্বাধীনতা এবং

দুর্ভিক্ষকবল মানুষের পাশে দাঁড়াতে তৎপর হয়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে রাজবন্দীদের মুক্তি এবং খাদ্যাভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করা ছিল তাদের কর্মসূচির অন্তর্গত।

নারীদের তরবারি চালানো থেকে শুরু করে লাঠি চালানো শেখানো, তাঁত বোনা শেখানো এই সমস্তই ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কার্যকলাপের অংশ। তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী কল্যাণী দাশগুপ্ত এর মতে, আত্মরক্ষা মানে শুধুমাত্র সৈন্যদের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করা নয় বরং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, অসম্মানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা; অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতাও আত্মরক্ষার একটি রূপ। তাই মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন করতেও তারা তৎপর হয়েছিল। এক্ষেত্রে আমরা রংপুরের কথা বলতে পারি, যেখানে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পাঁচিটি শাখা স্থাপিত হয়েছিল, এই অঞ্চলে মহিলারা নিজেদের লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় বুনতে চরখা এবং তুলো চেয়েছিল নেত্রীদের কাছে। উল্লেখ্য রংপুরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রীগন ছিলেন কৃষক। ধীরে ধীরে ১৯৪০ এর দশকে শহর থেকে গ্রামে এবং মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়েছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি।

উল্লেখ্য, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বিস্তার অনেকাংশেই ১৯৪০ এর দশকে সংঘটিত তেভাগা আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তেভাগা আন্দোলনে মহিলা কৃষকদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য এবং মহিলা কৃষকদের নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রীগণ বিশেষ উল্লেখের পরিচয় রাখে।

<u>মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং তেভাগা আন্দোলন:</u>

১৯৪৬-৪৭ সালে জমিদার-জোতদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং ফসলের দুই তৃতীয়াংশ এর উপর ভাগচাষীদের অধিকারের দাবিকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় তেভাগা আন্দোলন। প্রথমে উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন শুরু হলেও ক্রমে তা বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কবিতা পাঞ্জাবি তাঁর গ্রন্থ Unclaimed Harvest - An Oral History of the Tebhaga Women's Movement' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তেভাগা আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হলে, মহিলাদের অবদান উহ্যই থেকে যায়। অথচ কম্যুনিস্ট পার্টি এবং মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেতৃত্বাধীনে আনুমানিক ৫০,০০০ মহিলা কৃষক এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরে মহিলা কৃষকরা ধনী কৃষকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আসছিল, খাদ্যাভাবের করুণ শিকার হতে হয়েছিল তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গকে। অনেকসময় খাদ্যাভাবের দরুণ অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীদের বিক্রিও করে দিয়েছিল।

এই আন্দোলন কেবলমাত্র ফসলের ন্যায্য দাবির আন্দোলন ছিল না বরং স্থানীয় মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন ছিল বলা চলে। তবে তেভাগা আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে উল্লেখ করতেই হয় যে কমিউনিস্ট পার্টি নিজে থেকে সচেষ্টভাবে মহিলাদের আন্দোলনে অন্তর্ভুক্ত করেনি বরং প্রাথমিকভাবে মহিলা কৃষকরাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি উত্তরবঙ্গে লঙ্গরখানা স্থাপন করেছিল এবং সেগুলিতে সাহায্য করার জন্যই অনেক মহিলা নেত্রী শহর থেকে এসেছিল। বলাবাহুল্য খাদ্যাভাবের এবং অনাহারে জর্জরিত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টি এবং মহিলা

আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগদান করেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থানীয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে কার্যরত অবস্থায় তেভাগা আন্দোলনের সময় কৃষক মহিলাদের সংগঠিতও করেছিল।

মণিকুন্তলা সেন তাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তেভাগা আন্দোলনের শুরু থেকেই কৃষক মহিলারা তাদের অধিকারের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি লড়াই করেছিলেন। পুলিশি দমন-পীড়ন বেড়ে গেলে পুরুষদের আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল, এইসময় মহিলারা তাদের নিজস্ব বাহিনী গঠন করে। মহিলারা সফলভাবে পুলিশ, ভাড়া করা গুণ্ডাদের প্রতিহত করেছিল এবং কেবল তাদের ফসল এবং ঘরবাড়িই নয়, আত্মগোপনে থাকা তাদের নেতাদেরও রক্ষা করার জন্য নিরলসভাবে লড়াই করেছিল। তারা যে অস্ত্রগুলি ব্যবহার করেছিল তা ছিল তাদের নিজস্ব - কাস্তে, কাটার বোর্ড, ঝাড়ু, মরিচের গুঁড়া ইত্যাদি। তারা শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের লোকদের রক্ষার জন্য শঙ্খ বাজিয়ে তাদের সতর্ক করতেন এবং শুধু তাই নয় আত্মগোপনে থাকা নেতাদের সাথেও যোগাযোগ করতেন। পুলিশ তাদের ফসলে আগুন দিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফসল বাঁচাতেন তারা। পুলিশি মারধর ও নির্যাতন এর বিরুদ্ধে নিজেদের রক্ষার্থে যা পারতো তাই দিয়েই পুলিশদের আঘাত করত। একাধিকবার অত্যাচারিত এবং নিপীড়িত হলেও, কৃষক মহিলাগণ অন্যান্য পুরুষ এবং নেতাদের রক্ষা করে গেছিল।

আরতি গাঙ্গুলী এর মতে নারীরা শুধুমাত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই কাজ করেনি, বরং জঙ্গি ও কৌশলগত নেতৃত্বের ভূমিকাও গ্রহণ করেছে এবং নারী কর্মীদের দল গঠন করেছে। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল তাদের অঞ্চল এবং ফসল রক্ষা করতে। পুলিশের পক্ষে তাদের প্রতিহত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না।
। এসবের পাশাপাশি শ্রমিকদের আশ্রয় দিয়ে, পুলিশের মোকাবিলা করে এবং পালিয়ে যাওয়া শ্রমিকদের খাবার সরবরাহ করেও সহায়তা করেছিল মহিলা কৃষকরা।

তবে উল্লেখ্য, যেখানে মহিলারা এত তৎপর ছিল নিজেদের আন্দোলনের দাবিতে, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে নীরব ছিল। অবনী লাহিড়ী উল্লেখ করেছেন যে যে দলটি প্রাথমিকভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য অপ্রস্তুত ছিল...খুব সত্যি কথা বলতে, একজন সংগঠক হিসেবে বলতে পারি এটা ছিল আমাদের মানসিক পশ্চাদপদতা। আমরা যারা কৃষক সংগঠনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম তারা নারীর অংশগ্রহণের তাৎপর্য ও প্রভাব বুঝতে পারিনি। অপরদিকে কমলা মুখোপাধ্যায় স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন, এই হাজার হাজার মহিলা রাতারাতি অংশগ্রহণ শুরু করেননি, বা তারা হঠাৎ করেই বিধিনিষেধ ভাঙতে শুরু করেননি। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে তারা মহিলাদের সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষেত্রে বলতেই হয় যে মহিলাদের উত্থানের জন্য বা empowerment এর জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনের চেয়েও আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য মহিলাদের প্রয়োজন ছিল বেশি। দিনাজপুরের রানীসাইনকেলের এক কৃষক মহিলা বকুলের মা (বকুলের মা) এর বিবরণে এটি স্পষ্ট ছিল। তিনি জানান যে তাদের এলাকার পুরুষরা একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে উত্সাহিত করেছিল যাতে দারোগাদের অত্যাচারের (রক্ষীদের) হাত থেকে রক্ষা পায়।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা:

মিঠু ফৌজদারের তার গবেষণা কার্যে উল্লেখ করেছেন, ক্রমে রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে দেশভাগের ফলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিও ভাগ হয়ে যায়। দেশভাগ এবং তার পরবর্তী নৃশংসতায় নারী আন্দোলন অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যেসব নেত্রীগণ ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু যারা ভারতে চলে আসেন, যার ফলে সেখানে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মহিলা সমিতিগুলি বেশিরভাগ গ্রামীণ এলাকায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এইসময় তারা গোপনে তাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়। শেষপর্যন্ত ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্ট মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিকে আইনসিদ্ধ ঘোষণা করে। এর পাশাপাশি এই সময় রাজবন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, এই ধরনের সমস্যার পরে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া কঠিন ছিল। তেভাগা আন্দোলনের সময় ফসলের ন্যায্য দাবি এবং তার আগে মহিলাদের নিজ আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে আন্দোলন হলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ এর দশকে মহিলাদের সমস্যা নিয়ে খুব কমই আলোচনা হতে দেখা যায় ভারতে বা পূর্ব পাকিস্তানে। ১৯৬০ এর দশকে পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট নেতাগণ মূলত উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধীতায় বেশী সরব ছিল এবং তার পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বা জলপাইগুড়ি শহরের মতো শহরাঞ্চলে মহিলা সমিতি টিকে থাকলেও, কাকদ্বীপ বা জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চলে সমিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নড়াইলের অমল সেন, দিনাজপুরের হেলেকেতু সিংহ এবং উত্তরবঙ্গের অবনী লাহিড়ী বিভিন্ন নেতাগণ কমিউনিস্ট পার্টির উদাসীনতা, দলের দুর্বলতাকে দায়ী করেছেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভেঙে পড়ার পিছনে। তাঁদের মতে, কমিউনিস্ট পার্টি সেইসময় মহিলাদের সমস্যাগুলির প্রতি কোনো গুরুত্ব প্রদান করেনি বরং অবহেলা করেছে।

১৯৪০ এর দশকে মহিলাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব প্রদান কেবলমাত্র রাজনৈতিক নয় বরং সামাজিক স্তরেও আলোড়ন ফেলেছিল বলা চলে। তবে দেশভাগের পর তা অনেকাংশেই শহর কেন্দ্রিক হয়ে থেকে যায়। দেশভাগের পর কলকাতায় এসে তৎকালীন অনেক নেতা এবং নেত্রীগণ উদ্বাস্তু আন্দোলন এবং স্কুল শিক্ষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন, বঙ্গ বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন এগুলিতেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

Environmental Movements

ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সংকট এবং সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে ভারতে পরিবেশগত আন্দোলনের সূচনা অনেক আগেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে হয়েছিল। ১৭৩১ সালে রাজস্থানের যোধপুরের কাছে বিষ্ণোই মহিলাদের গাছ রক্ষা থেকে শুরু করে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে একাধিক পরিবেশগত আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত সংকটের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণও উল্লেখের পরিচয় রাখে। বিষ্ণই আন্দোলন ছাড়াও ১৯১৭ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বাধীনে সংঘটিত চম্পারণ সত্যাগ্রহের কথাও উল্লেখ করতে হয় পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে। বিহারের চম্পারণে নীল চাষের অবলুপ্তির পাশাপাশি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের লবন সত্যাগ্রহেও মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। তবে অবশ্যই উল্লেখ্য, উল্লিখিত আন্দোলন গুলিতে আদতে শহরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। মূলত ১৯৭০ এর পর থেকে rural বা গ্রামের মহিলাদেরও পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় সংঘটিত চিপকো আন্দোলনের কথা বলা চলে। ১৯৭২ সালে সুন্দরলাল বহুগুন, বাচনি দেবী এবং গৌরী দেবীর নেতৃত্বাধীনেই শুরু হয়েছিল চিপকো আন্দোলন। এছাড়াও ১৯৭৮ সালে কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালী আন্দোলনেও মহিলা কবি সুগত কুমারীর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। যেখানে চিপকো আন্দোলনে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে গাছ রক্ষার্থে উদ্যত হয়েছিলেন স্থানীয় মানুষজন, অপরদিকে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের দরুন বনভূমি ধ্বংসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন কেরালার পাল্লাকার জেলার মানুষজন। ১৯৮২ সালে environmental activist বন্দনা শিবা সূচনা করেন নবদন্য আন্দোলনের। তিনি নবদন্য নাম একটি NGO প্রতিষ্ঠা করেন এবং মহিলাদের সংগঠিত করে bio diversity বা জীববৈচিত্র রক্ষার কাজে ব্রতী হন। ১৯৮৩ সালে Aapiko movement এর কথাও জানা যায় পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে। Sirsi forest এর ইকোসিস্টেম ধ্বংসের প্রতিবাদে এবং বাণিজ্যিক বননীতির বিরোধীতায় সরব হয়েছিলেন কর্ণাটকের উত্তর কানাড়া জেলার মানুষজন। এই আন্দোলনে গ্রামের মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত। ১৯৮৯ সালে সংঘটিত নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ থেকেও মহিলারা পিছিয়ে ছিলেন না।

বর্তমানে, আরও অনেক পরিবেশকর্মী রয়েছেন যারা পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে পদ্মশ্রী পুরস্কার বিজয়ী সুনিতা নারাইন, যিনি টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত হয়েছেন। আরেক পদ্মশ্রী পুরস্কার বিজয়ী যমুনা তাডু, যিনি ঝাড়খণ্ডের বনের 'লেডি টারজেন' নামে পরিচিত। তিনি 100 জন আদিবাসী মহিলার সাথে গত 20 বছর ধরে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলকে মাফিয়াদের হাত থেকে রক্ষা করছেন। এছাড়াও ২০০৮ সালে রাধা ভট্ট গঙ্গা নদীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের বিরোধিতা করে নদী বাঁচাও অভিযান শুরু করেছিলেন।

বলাবাহুল্য এই উল্লিখিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গঙ্গা নদীর পাশাপাশি এর পার্শ্ববর্তী সমস্ত উপনদীর বাস্তুতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

বিষ্ণোই আন্দোলন:

১৭৩০ সালে বর্তমানে খেজেরালি এবং তৎকালীন জেহনাদে সংঘটিত ভারতের ইতিহাসে অন্যতম পরিবেশগত আন্দোলন বিষ্ণোই আন্দোলনের কথা উল্লেখ করতেই হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য, বিষ্ণই সম্প্রদায়ের কাছে পরিবেশের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী গাছ বা পরিবেশের ক্ষতিসাধন করা থেকে তারা সবসময় বিরত থাকতো।
১৭৩০ সালে তৎকালীন যোধপুরের রাজা অভয় সিং প্রাসাদ নির্মাণের জন্য কাঠের প্রয়োজনে গাছ কাটার নির্দেশ দিলে, জেহানাদের অমৃতা বাই সহ বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের অন্যান্য মানুষজন এর তীব্র বিরোধীতা করতে থাকেন।

অমৃতা বাই সেনাবাহিনীর হাত থেকে গাছগুলি বাঁচাতে, আলিঙ্গন করেন এবং তাকে অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের বাকি মানুষজন গাছ রক্ষার্থে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। গাছ বা পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি, বিষ্ণোই সম্প্রদায় খেজরি গাছকে পবিত্র বলে মনে করত এবং তারা একপ্রকার ঘোষণা করেছিল যে তাদের মাথার দাম বা বলা চলে জীবনের দাম অনেক কম, খেজরি গাছের তুলনায়। তাই যেনতেন প্রকারেণ এই গাছ রক্ষার্থে তারা সোচ্চার হয়েছিল। অমৃতা বাই এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা এই গাছ রক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারান। সেনাবাহিনী কাঠ সংগ্রহের জন্য অমৃতা দেবী সহ মোট ৩৬৩ জনকে হত্যা করে।
অভয় সিং এর কাছে খবর গেলে তৎক্ষণাৎ গাছ কাটা বন্ধ করার আদেশ জারি করেন উনি।

চিপকো আন্দোলন:

১৯৭২-৯৩ সালে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় হিমালয়ের গাছগুলিকে বাণিজ্যিক কাঠ কাটার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা পরিবেশ সংরক্ষনের ইতিহাসে চিপকো আন্দোলন নামে খ্যাত। কাঠুরেদের হাত থেকে রক্ষার্থে আন্দোলনকারীরা গাছের গুঁড়িকে আলিঙ্গন করেছিলেন। *Chipko* কথাটির অর্থ হল আলিঙ্গন করা বা জড়িয়ে থাকা। মূলত বাণিজ্যিক কাঠুরেদের হাত থেকে রক্ষার জন্য স্থানীয় মানুষেরা গাছের গুড়ি আগলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই এই শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা গিয়েছিল উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য হিমালয় অঞ্চলে। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন প্রধানত স্থানীয় পাহাড়ি প্রান্তিক চাষি এবং ভুটিয়া গোষ্ঠীর লোকজন। এরা মূলত ঝুম চাষ এবং পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। ১৯৬২ সালের ভারত-চীনা সীমান্ত সংঘাতের পরে সীমান্তকেন্দ্রিক সমস্যার দরুণ উত্তরাখন্ড এর বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়। তবে বলাবাহুল্য সরকারের তরফ থেকে কৌশলগত পদক্ষেপ হলেও, এর ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর সুযোগসন্ধানী মানুষের কাছে উত্তরাখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের সম্ভার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কর্পোরেট ঠিকাদাররা কাঠ এবং অন্যান্য পণ্য, সিমেন্টে ব্যবহারের জন্য চুনাপাথর থেকে শুরু করে, ম্যাগনেসাইট

এবং পটাসিয়াম বিপুল পরিমাণে সংগ্রহ করে চলে। এর পাশাপাশি ডাইনামাইটের মাধ্যমে পাহাড়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রাস্তা নির্মাণ চলার দরুণ ভূমিক্ষয় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় স্থানীয় মানুষজন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রম উন্নতির পাশাপাশি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, পর্যটকদের অবাধ আনাগোনায় উত্তরাখণ্ডের ভূপ্রকৃতি এবং সেখানকার অধিবাসীগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। এই উন্নয়ন কর্মকান্ডের স্বাভাবিক প্রভাবস্বরূপ ভূমিক্ষয় থেকে শুরু করে বন উজাড় হয়ে যাওয়া, জলের উৎস শুকিয়ে যাওয়ার মত সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। যদিও কাঠ এবং কাঠকয়লা ঠিকাদাররা এই পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ী ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেখানকার অধিবাসীদের উপর বন ধ্বংসের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়।

গ্রামবাসী এবং গান্ধীবাদী সমাজকর্মী এবং কাঠের ঠিকাদার, তাদের কর্মচারী এবং বন-বিভাগের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে, 1972 সালে চামোলি জেলার গোপেশ্বরের কাছে ঘটনাগুলির একটি সিরিজ শুরু হয়। একটি স্থানীয় কোঅপারেটিভকে নির্মাণে এবং সরঞ্জামগুলির জন্য ব্যবহার করার জন্য বারোটি ছাই গাছের ছোট বার্ষিক বরাদ্দ কাটার অনুমতি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সরকার এনকেট ব্যাট এবং টেনিস রাকেট তৈরির জন্য একটি ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারকের কাছে গাছগুলি বিক্রি করেছিল। গ্রামবাসীরা সরকারের কাছে তাদের যুক্তিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই তারা গান্ধীবাদী অহিংস প্রতিরোধ গ্রহণ করেছিল-তারা নিজেদেরকে সংযুক্ত করেছিল, গাছ কুড়াল থেকে তাদের রক্ষা. তারা সফল ছিল, এবং অনুমতি খেলাধুলার সামগ্রী প্রস্তুতকারকের কাছে বাতিল করা হয়েছে। সেই কর্ম থেকে চিপকো পরিবেশ আন্দোলনের উদ্ভব হয়। 1970 এর দশকে সংঘর্ষের এক ডজনেরও বেশি বড় এবং ছোটো ঘটনা ঘটেছিল। প্রতিটি সংঘর্ষই ছিল অহিংস এবং সফল। সাফল্যের ফলে আন্দোলনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার এবং স্বীকৃতি বৃদ্ধি পায়। গ্রামে গ্রামে গিয়ে চিপকো কর্মীরা আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে এবং তাদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিটি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হন।

1973 সালে, যখন উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় সম্পূর্ণ ছাই গাছটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সাইমন কোম্পানিকে বরাদ্দ করা হয়েছিল। একই বনকে গ্রামবাসীরা তাদের কৃষিকাজের হাতিয়ার করার জন্য আবেদন করেছিল যা প্রত্যাখ্যান করেছিল। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সুন্দরলাল বহুগুনা, গুরা দেবী এবং সুদেশা দেবী। গৌরা দেবী গাছগুলিকে তার "মাইকা" (মায়ের বাড়ি) হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন| একইভাবে, সুদেশা দেবী রামপুর বনকে ঠিকাদারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মহিলাদের অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন নারীদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে নিজেদের সংগঠিত করতে সাহায্য করে মহিলা মন্ডল সেরা স্থানীয় নেটওয়ার্ক হয়ে ওঠে। অনেক দিনের প্রতিবাদের পর সরকার কোম্পানির পারমিট বাতিল করে গ্রামবাসীদের অনুমতি দেয়।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ কেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম। ১৯৮৫ সালে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। নর্মদা রিভার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় প্রায় ৩০ টি বড় এবং অসংখ্য ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল নর্মদা নদী এবং এর ৫১ টি উপনদীর উপর। যদিও নর্মদা প্রকল্পের সামগ্রিক পরিবেশগত, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত প্রভাবের কোন

বিশদ বিবরণ নেই বা সেই নিয়ে কোনোরকম সঠিক ধারণা পাওয়া যায়না, তথাপি উল্লেখ করতে হয় যে ১৯৯২ সালের India Today রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, অনুমান করা হয়েছিল এর ফলে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র জুড়ে প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হবে, ৩,৫০,০০০ হেক্টর বন এবং ২০০,০০০ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি জলের তলায় চলে যাবে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে গুজরাটে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে সেখানকার আদিবাসীরা বিরোধীতায় সরব হয়ে উঠেছিল।

এই বিশাল প্রকল্পের জন্য আর্থিক সহায়তা বিশ্বব্যাংক বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে এসেছিল, যা পরিবেশগত-প্রভাব অধ্যয়ন শেষ হওয়ার আগে ১৯৮৫ সালে ঋণ অনুমোদন করেছিল। তবে উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক sustainable development এর পক্ষে ছিল এবং বাঁধ নির্মাণের ফল স্বরূপ বাস্তুচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছিল তারা । তবে এই নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন কারণে ভারত ও রাজ্য সরকার পুনর্বাসন এবং পুনর্বাসন নির্দেশিকাগুলি পূরণ করতে পারেনি এবং সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যাগুলির কোনো সুরাহা হয়নি। ১৯৮৫ সালের পর থেকেই বাস্তুচ্যুত মানুষের দাবিতে এবং বাঁধ নির্মাণের বিরোধীতাস্বরূপ সূচনা হয় নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন। মেধা পাটকরের নেতৃত্বে NBA সংগঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলন মূলত গান্ধীবাদী অহিংসা এবং সত্যাগ্রহের পন্থা অবলম্বন করেছিল। এই প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হওয়ায় বেশ কিছু দিনের প্রতিবাদের পর ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটিতে অর্থ ইনভেস্ট করা থেকে বিরত হয়। প্রথম দিকে ১৯৮০ এর দশকে এই আন্দোলন সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের ফলস্বরূপ বাস্তুহারাদের পুনর্বাসস্থান দেওয়ার দাবিতে শুরু হলেও পরবর্তীকালে সমগ্র নর্মদা উপত্যকা জুড়ে বাস্তুতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সরব হয়ে ওঠে আন্দোলনকারীরা। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাংকের তহবিল প্রত্যাহার নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের জন্য ছিল একটি নৈতিক জয়।

Silent valley movement

পশ্চিমঘাটের দক্ষিণ প্রান্তে কেরালা রাজ্যের স্বল্পোন্নত অংশ মালাবার অঞ্চলে অবস্থিত সাইলেন্ট ভ্যালি, ভারতের কয়েকটি অবশিষ্ট নিরবচ্ছিন্ন রেনফরেস্ট এলাকার মধ্যে অন্যতম। সাইলেন্ট ভ্যালি তার এর বাস্তুতন্ত্রের জন্য আরও উল্লেখের পরিচয় রাখে। অনেক বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ, ফার্ন এবং বিপন্ন প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে এই উপত্যকায় । ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে রাজ্য সরকার আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার জন্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কুন্তিপুঝা নদীর জন্য একটি বাঁধের পরিকল্পনা শুরু করে।

১৯৭৬ সালে, কেরালার পালাক্কাদ জেলায়, সাইলেন্ট ভ্যালির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য একটি পরিবেশগত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আন্দোলন ছিল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে। বাঁধ নির্মাণের ফলে সমগ্র সাইলেন্ট ভ্যালি জলের নীচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গ্রামীণ স্কুল শিক্ষক এবং স্থানীয় নাগরিকদের নিয়ে সংগঠিত কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে সাইলেন্ট ভ্যালি প্রকল্পটি আঞ্চলিক উন্নয়নে সামান্যই অবদান রাখবে। পরিবেশগত সমস্যাগুলিকে তুলে ধরতে শুরু করে তারা এবং বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা, বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের কথা, জল সরবরাহের সমস্যার কথা উঠে আসে তাদের প্রচারের মধ্যে দিয়ে। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন মালয়ালম কবি ও পরিবেশবিদ সুগাথা কুমারী। দীর্ঘদিন আন্দোলনের ফলস্বরূপ ভারত সরকার সাইলেন্ট ভ্যালি প্রকল্পের পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য একটি উচ্চ স্তরের কমিটি নিয়োগ করেন। শেষমেশ এই কমিটিও

প্রকল্পটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দিলে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সাইলেন্ট ভ্যালিতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করে দেন এবং পরে ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী সাইলেন্ট ভ্যালিকে জাতীয় উদ্যান এর মর্যাদা দেন।

অ্যাপিকো আন্দোলন:

অ্যাপিকো আন্দোলন ভারতের বন-ভিত্তিক পরিবেশ আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি। পশ্চিমঘাটের কর্ণাটকের উত্তর কানাডা জেলায় এই আন্দোলন হয়েছিল। যেমন সান্ট্রা (2000: 827-828) নোট করে যে: কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় যা পশ্চিমঘাটের অংশ, 'বন জেলা' নামে পরিচিত। কালো মরিচ এবং এলাচের মতো অর্থকরী ফসলের জন্য একটি সাধারণ মাইক্রো জলবায়ু সহ এই এলাকায় সমৃদ্ধ বন সম্পদ রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে, সমৃদ্ধ বনজ সম্পদ শোষণ করা হয়েছিল; জাহাজ তৈরির জন্য সেগুন গাছ কেটে ফেলা হয় এবং কাঠ ও জ্বালানি কাঠ মুম্বাইতে পাঠানো হয়। স্বাধীনতার পর, সরকারও রাজস্বের জন্য গাছ কাটা শুরু করে এবং বন বিভাগ, যা ঔপনিবেশিক বননীতি অব্যাহত রাখে, বনকে একচেটিয়া সেগুন এবং ইউক্যালিপটাস বাগানে রূপান্তরিত করে। বালেগড্ডে গ্রামের একদল যুবক, প্রতিবাদ করে সেগুন বাগান স্থাপনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে, বন কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি লিখে প্রাকৃতিক বন উজাড় করা বন্ধ করতে বলে। কিন্তু এই আবেদন উপেক্ষা করা হয়। এরপর গ্রামবাসীরা আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। তারা চিপকো আন্দোলনের নেতা সুন্দরলাল বহুগুনাকে আমন্ত্রণ জানায় এবং স্থানীয় লোকজনকে জড়ো করে তাদের গাছ আলিঙ্গন করে গাছ রক্ষার শপথ গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে, যখন কুড়ালওয়ালারা গাছ কাটার জন্য আসে, স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে যুবক এবং নারীরা গাছগুলিকে আলিঙ্গন করে এবং এভাবে 'আপ্পিকো আন্দোলন এর সূচনা হয়।

প্রভিন শেঠ (1997) উল্লেখ করেছেন যে, "অ্যাপিকো আন্দোলন তার উদ্দেশ্যগুলিতে সফল হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে 1. বিদ্যমান বনাঞ্চল রক্ষা করা, 2. ধ্বংসপ্রাপ্ত জমিতে গাছের পুনর্জন্ম, এবং 3. সংরক্ষণের জন্য যথাযথ বিবেচনার সাথে বন সম্পদ ব্যবহার করা। গ্রামবাসীরা অনেকাংশেই বনের উপর নির্ভরশীল থাকতো নিজেদের জীবন যাপনের জন্য, বন ছিল ভরণ-পোষণের প্রধান উৎস। প্রভিন শেঠ আরও উল্লেখ করেছেন যে, আন্দোলনটি পশ্চিমঘাট জুড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে তাদের শিল্প ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করেছিল।

উপরে উল্লিখিত পরিবেশকেন্দ্রিক আন্দোলন গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এগুলি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিভাজন এর উপরে গিয়ে মানুষকে একত্রিত করেছিল পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে। এছাড়াও আন্দোলন গুলিতে নারীদের নেতৃত্ব এবং তাদের ভূমিকাও উল্লেখের পরিচয় রাখে। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এবং নর্মদা উপত্যকায় বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী সমাজের মধ্যে মহিলাদের উচ্চস্থান, সংসারের ভরণ পোষণে তাদের দায়িত্ব এবং অবদান অনেকাংশে তাদেরকে বনের উপর নির্ভরশীল বানিয়েছিল এবং পি.পি. করনের মতে, এই নির্ভরশীলতা ছিল পরিবেশকেন্দ্রিক আন্দোলনে মহিলাদের অংশগ্রহণ এর অন্যতম কারণ। বন থেকে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করেই তাদের জীবন যাপন হত বলা চলে, তাই পরিবেশের রক্ষার্থে তারা দ্রুত সরব হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন সময়ে। বলাবাহুল্য, পরিবেশের উপর এই নির্ভরশীলতার জন্যই হয়তো পরিবেশকে নিজের মায়ের সাথে বা মাইকার সাথে বারংবার তারা একাত্ম করে ফেলেছে এবং সেই পরিবেশ রক্ষার্থে সরব হয়ে উঠেছে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Upama Saikia, Role Of Women In Environmental Movement In India, Ilkogretim Online - Elementary Education Online, 2021; Vol 20 (Issue 6): pp. 2473-2478

2. P. P. Karan, Environmental Movements in India, Geographical Review , Jan., 1994, Vol. 84, No. 1 (Jan., 1994), pp. 32-41, Taylor & Francis, Ltd.

3. Kavita Punjabi, Unclaimed Harvest - An Oral History of the Tebhaga Women's Movement, Zubaaan Academic, 2016

4. Geraldine Forbes, Women in Modern India Volume IV, Cambridge University Press, 1999.

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Discuss activities of Mahila Atmaraksha Samiti during 1940s.
2. How did women play crucial role in protecting environment in colonial and post-colonial India?
3. What is the contribution of Mahila Atmaraksha Samiti in Tebhaga movement?

সমাজেও নারীর প্রথাগত অধিকার ও সামাজিক অবস্থানে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যেমন পিতৃকুলানীশারী (Patrineal) ও পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় তেমনি মাতুকূলানুশারী (Matrilineal) উপজাতির সংখ্যাও কম নয়। মাতৃকুলানুশারী উপজাতি সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান কোন ভাবেই অবদমিত বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় উপজাতি সমাজে প্রচলিত প্রথা ও নিয়মকানুন নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করে।

কিন্তু উপজাতি সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার বিশেষ করে ডাইনি সন্দেহে হত্যা (Witch Hunting), বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় বিধি অনেক ক্ষেত্রেই নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে লংঘন করে। তবে Poliandry, bride money ও Matrileneal tradition উপজাতি নারীকে তথাকথিত অউপজাতির ভারতীয় মূল সংস্কৃতির নারীর থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত আসন দান করেছে। কিন্তু উপজাতি সমূহের ব্যপকহারে সংগঠিত ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) গ্রহণ করার ফলে ঐ সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রচলিত নারী অবদমনের প্রথা সমূহ ব্যপকহারে প্রবেশ করেছে ভারতীয় উপজাতি নারীর মধ্যেও। তবে ইতিপূর্বে আলোচিত নারী প্রগতির ব্যবস্থাসমূহ ভারতীয় উপজাতিয় নারীর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। তাছাড়া Scheduled tribe হিসাবে সংরক্ষণ সহ তপশীল এলাকায় (Scheduted area 5th and 6th Schedule) নানা রকম উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভারতীয় উপজাতি নারী সমাজ ভোগ করেছে।

৭.৪.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Basham A. L. : The Wonder that was India.

২। Chopra P.N., Puri B.N., Das M.N. : A Social Cultural and Economic History of India, Vol. II (Delhi), 1924.

৭.৪.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় নারীর অধিকার আলোচনা কর।

২। স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর আইনগত অধিকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল?

৩। উপজাতি সমাজে নারীর অবস্থান কি রকম ছিল?

————

ভারতে সমান কাজের জন্য সমান বেতন প্রদানের পাশাপাশি The Maternity Benifit Act 1961, চাকরীতে নিযুক্ত বিবাহিত মহিলাদের Advance stage of pregnancy ও সন্তান প্রসবের পরে সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করেছে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে আইনাটি প্রযোজ্য। পাশাপাশি Employees State Insurance Act 1948, The Factorin Act 1948, Apprentic Act 1956, Mines Act 1952 ও Plantation labour Act. 1951. ও মহিলাকর্মীদের সহায়ক কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া *The Hindu Succession Act* হিন্দুদের নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করেছে।

নারীর মযার্দার পক্ষে অসম্মানজনক কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত বহুবিবাহ (poligamy) কে Special Marriage Act 1955-এর দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। এই আইন বিয়ের বয়স, মানসিক ইচ্ছা ইত্যাদিকে বিশেষগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956-এ পুরুষকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হয়েছে। Indian Penal Code (IPC) এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে Muslim code of conduct বহুবিধানকে স্বীকার করে। Muslim personal law তাই ভারতীয় মুসলীম নারীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছে।

IPC ভারতীয় নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে দমিয়ে রাখার জন্য কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন, অবৈধ উপায়ে মহিলাদের সম্মানহানি ও অপহরণ সম্পর্কে IPC তে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যেমন—

(i) কোন মহিলাকে অপহরণ করে জোরপূর্বক বিয়ে করা বা অবৈধ যৌন সংযোগ স্থাপন করা।

(ii) ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সী কোন কিশোরীকে ফুসলিয়ে অন্য কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া বা বিয়ে করা।

(iii) ২১ বছরের নীচে কোন মহিলাকে ভারতে নিয়ে এসে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা।

(iv) ১৮ বছরের নীচের কাউকে কেনা বেচা করা বা যৌন ব্যবসায় নিযুক্ত করা ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণে ঘটিত অপরাধ IPC ধারামতে কঠোর শাস্তিযোগ্য। IPC-র Section 312, 313, ও 316 অবৈধ সম্পর্কস্থাপন করে গর্ভপাত করানোর শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

৭.৪.২.৩ : উপজাতি সমাজে নারীর অবস্থান

তথাকথিত মূল ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতীয় উপজাতীয় (Tribal society of India)

human rights and fundamental freedoms in the political economic, social, cultural, civil or any other feild. এই UNDEVW এ আরো বলা হয়েছে যে সকল রাষ্ট্রই নারীর বিরুদ্ধে ঘটিত হিংসা বা তাদের বঞ্চনার অবসান ঘটাবে এবং প্রয়োজনে আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

UNO নারী প্রগতির জন্য আরো কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 1956 সালে গৃহীত The supplementary slavery convention (SSC) নারীর সম্মতি ব্যতীত তাদের নিয়ে কোন রকম ব্যবসা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। SSC 1950 সালে UNO কর্তৃক গৃহিত UN convention for the suppression on Traffic in Persons and Exploitation of Praotitution of others (UNCSTPEPO) দ্বারা UNO বেশ্যাবৃত্তি ও নারী পাচার বন্ধের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকেই নির্দেশ দেয়।

SSC এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে 1956 র 9ই আগষ্ট ভারত The suppression of Immoral traffic in Women and Girls Act (1956) গ্রহণ করেছে। পরবর্তী কালে 1978 ও 1986 খ্রীষ্টাব্দে এই আইন সংশোধন করে শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। 1986 সালে এই আইনটির নাম হয় Immoral traffic (Prevention) Act 1956. এই আইনটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জোর করে কাউকে যৌন ব্যবসার কাজে (Sexual exploitation or abuse of persons for commercial purpose) নিয়োগ করাকে বন্ধ করা। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে বা অন্যকোন স্থানে যেকোন রকমের যৌন লাঞ্ছনা বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে আইনগত ও প্রসাশনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা বন্ধ করার জন্য ভারতে কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা তথা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভপাত (abartion) স্বীকৃত থাকলেও লিঙ্গ নির্ধারনের পর কন্যা ভ্রুণের গর্ভপাত (Prenatal abortion of females by sex ditermination) আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত The Prenatal Diagnestic Techniques prevention of Misure Act 1994 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইনটিকে 2003 সালে সংশোধিত করে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে On vitro Fertilization (ITV) পদ্ধতিতে গর্ভসঞ্চারের পূর্বেই পূত্রভ্রুণ তৈরী করার প্রচেষ্টাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইনগুলিকে ভারতীয়দের genetic demand for male child কে বন্ধ করার প্রয়াস বলা যেতে পারে।

ভারতীয় নারীর অধোগতির একটা জলন্ত সূচক হচ্ছে পণপ্রথার ধারাবাহিকতা। পণের দাবীতে বধূনির্যাতন, বধূহত্যা তথা পণ ছাড়া বিয়ে না হওয়া ভারতীয় নারীর অতি পরিচিত বিষয়। এই অবস্থাকে কাটিয়ে উঠার জন্য ভারত Dowry Prohibition Act. 1961 গ্রহণ করেছে। এই আইনে পণ দেওয়া ও নেওয়াকে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে পণের দাবীতে বধূ নির্যাতনকে কঠোর শাস্তিযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে এই আইন যা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সংবিধানে কতগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental) ও স্বাধীনতা (Liberty) বিধিবদ্ধ করা হয়। পুরুষ নাগরিকের পাশাপাশি ভারতীয় নারীও এই সমস্ত অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে।

সংবিধানের 14 নং ধারায় জাতি ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে আইনের চোখে সমান (Equality before law) বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে 15 নং ধারায় বলা হয় যে the state shall not discriminate any citizen on the ground of sex. এই ধারার 3 নং উপধারা (1513)য় বলা হয় যে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বিশেষ ব্যবস্থা (affirmative action) গ্রহণ করতে পারে। এমনকি নারী প্রগতির জন্য সরকারকে আলাদাভাবে আইন প্রনয়ণের অধিকারও দেওয়া হয়। পাশাপাশি 16 নং ধারায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে কেবলমাত্র লিঙ্গ পরিচিতির জন্য চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কোনরকম বৈষম্য মূলক নীতি গ্রহণ করতে পারবে না। একইভাবে 42 নং ধারায় কর্মক্ষেত্রে কর্মোপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা এবং নারীর মাতৃত্বের জন্য ছুটি (Maternity leave)-র কথা বলা আছে। সর্বাপরি নারীর সম্মান বজায় রাখা সকল নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য বলে 15A (C) নং ধারায় বলা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি তার Directive Principles of the State Policy জনকল্যানকারি ভারতীয় রাষ্ট্রের মূখ্য উদ্দেশ্যগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছে। 14 বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, সমান কাজের জন্য সমান বেতন ইত্যাদি কতগুলি নির্দেশমূলক নীতি নারী সচেতনতা বৃদ্ধির কতগুলি সাংবিধানিক রক্ষা কবচ।

ভারতীয় সংবিধান একদিকে যেমন ভারতীয় নারীকে আইনগতভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে তেমনি আন্তর্জাতিক গ্রহণ করা হয়েছে নারী প্রগতির জন্য। 1948 খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্র সংঘ (The united Nations Organisations) কর্তৃক গৃহিত Universal declaration of Human Rights এ বলা হয়েছে- all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and eonscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. এই UNDHR এ নারী পুরুষ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্ববাসীর কতগুলি মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অন্যদিকে 1966 সালে আরো দুটো International Codes of Human Rights গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুটি কোড্ হল - International covenant on Economic, social and cultural rights & ICESCR) এবং International cevenant on civil and political rights (ICCPR) এই দুটি কোড নারী পুরুষের সমানাধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে নারীর অধিকার আইনগতভাবে সুরক্ষিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণ UNO কে চিন্তিত করে তোলে। আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। ফলে 1993 সালে UNO -র সাধারণ সভা UN declaration on the Elimination of violence Against women (UN DEVW) গ্রহণ করে। এর ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে Women are entitled to the equal enjoyment and protection of all

ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় অসংখ্য ভারতীয় নারী অংশ গ্রহণ করেন। এগুলি নারী সচেতনতা বৃদ্ধির যোগান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এক্ষেত্রে ভিকাজি কামা, সাবিত্রী বাই (ফুলে), পণ্ডিতা রামাবাই মহারাণী সুনীতি দেবী, প্রিতিলতা ওযাদ্দেদার, বিজয়লক্ষী পণ্ডিত, রাজকুমারী অমৃত কাউর, অঞ্জলী, অরুণা আসফ আলী, সুচেতা কৃপালনী, মুতুলক্ষী রেড্ডী, দূর্গাবাই দেশমুখ, লক্ষী সায়গল, সবোজিনি নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা, রাণী গুইদিলিও (মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড), প্রভৃতি স্বনামধন্যা নারীর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ নারীর শিক্ষার অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করে। তাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই পুণরুজ্জীবিত করে। তাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই একাধিক পেশায় নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নারীমুক্তি আন্দোলনের ফলস্বরূপ কতিপয় মহিলা সংগঠনেরও জন্ম হয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে 1917 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের একদল মহিলা রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে Secretary for state -এর সঙ্গে দেখা করেন। অন্যদিকে 1927 খ্রীষ্টাব্দে পুনেতে অনুষ্ঠিত All India Women Eduction ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকারকে উদ্দিপিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে নানাবিধ কারণে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও এবং মহিলাদের আইনগত অধিকারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটলেও কতগুলো মৌলিক সমস্যা থেকেই যায়। বিশেষ করে কন্যা সন্তানের প্রতি অভিবভাকদের অসম আচরণ ও অবহেলা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদি নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী ছিল।

৭.৪.২.২ : স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর আইনগত অধিকার

1947 খ্রীষ্টাব্দের 15 ই আগষ্ট ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন ভারতের জন্ম ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা ও আইনগত অধিকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। স্বাধীন ভারতের সূচনা পর্ব থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অংশ গ্রহণ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এই মর্যাদা বৃদ্ধির পেক্ষাপট হিসাবে ভারতীয় সংবিধান, রাষ্ট্র সংঘের Universal Declaration of Human Rights (1948), বিভিন্ন International Convention, ভারতের নারী প্রগতি বিষয়ক আইনগত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর রচিত ভারতের সংবিধান গৃহিত হয় 1950 খ্রীষ্টাব্দের 26 শে জানুয়ারী। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার , (justice) চিন্তাভাবনা, মতপ্রকাশ ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Liberty) এবং সৌভাতৃত্বের (Fraternity) বিকাশের কথা বলা হয়েছে।এই মহৎ উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য

Presidency গুলোতেও সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে (Native state) সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত 1846 সালে জয়পুরে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন গ্রহণ করা হয় যা ভারতীয় নারীর বঞ্চনার এক অংশের আইনগত অবসান ঘটায়। তবে ভারতীয় মনন থেকে সতীদাহ চিরতরে বিলুপ্ত হয়নি।

সতীদাহ নিবারণের পাশাপাশি নারীর সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের আরেকটা পদক্ষেপ ছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে গৃহিত বিধবা বিবাহ আইন (Widow Remarriage Act 1856)। এই আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। এই আইনের দ্বারা হিন্দু বিধবা নারীর পুনঃ বিবাহ আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চবর্গীয় (Higher Caste) বিধবা নারীর পুনঃ বিবাহের জন্য আইনের প্রয়োজন হলেও তথাকথিত নিম্নজাতি (Lower Caste) বা অন্ত্যজ জাতির মধ্যে বিধবাদের পুনঃবিবাহের সামাজিক অধিকার লংঘিত হয়নি। কিন্তু নিম্নজাতি সমূহের মধ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করার প্রবণতা বা সংস্কৃত্যায়ন ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে তাদের মধ্যে সামাজিক আচার আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। ফলে উচ্চবর্গীয় নারীর সামাজিক বঞ্চনা তাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল।

ভারতীয় নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘনের সবচেয়ে অভিশপ্ত দিক ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বয়ঃসন্ধির পূবেই কন্যা সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করার শাস্ত্রীয় বিধান ঔপনিবেশিক আমলেও তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হারায়নি। তাই বাল্যবিবাহ বন্ধ করার আইনগত প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 1872 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের একান্ত প্রচেষ্টায় গৃহিত The Brahma Swamaj Marriage Act বা Act III of 1872 অনুযায়ী ব্রাহ্ম সামাজের অনুগামীগণ বিবাহযোগ্য পাত্রীর বয়স 14 হিসাবে স্বীকার করে নেন। কিন্তু Brahma Marriage Act অব্রাহ্মদের উপর প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু এই আইনটি 1955 সালের Special Marriage Act এর পথিকৃত ছিল।

1891 সালে B. M. Malabari র নেতৃত্বে Age of Consent Bill উপস্থাণিত হলে অনেক ভারতীয় নেতা এর বিরোধিতা করেন। এক্ষেত্রে বাল গঙ্গাধর তিলকসহ আরো অনেকেরই যুক্তি ছিল যে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা জাতীয়তাবাদী কর্ত্তব্য। যাইহোক 1929 খ্রীষ্টাব্দে The Child Marriage Restraint Act 1929 গ্রহণ করার মাধ্যমে বিবাহযোগ্য পাত্রীর বয়স ন্যুনতম 14 ঠিক করা হয়। এই আইনকে সারদা আইনও বলা হয়।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি বিংশ শতকের গোড়া থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্রুত বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতীয় নারীর অংশ গ্রহণ তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রাযোগ করেছিল। সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ, আইন অমান্য ও

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের আকর্ষণ বিশেষত উদারনীতিবাদ (Liberalism) সাম্য (equality), স্বাধীনতা (Liberty), ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism), ইত্যাদি ভারতীয় নারীর অধিকার ভোগ ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগী হয়েছিল। তাছাড়া উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় নেতৃবর্গের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন নারীর সমানাধিকার (equal rights) ভোগের বিষয়টকে ঔপনিবেশিক সরকার তথা ভারতীয় জনগণের সম্মূখে তুলে ধরে।

উনবিংশ শতকে সতীদাহ (সহমরন), বিধবাদের প্রতি অবিচার, বিধবা বিবাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সম্পত্তি ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চনা প্রভৃতি দূর করার জন্য ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ আন্দোলন শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাদেব গবিন্দ রানাডে, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, লোকহিতবাদী, দূর্গারাম ও আরো অনেকেই ভারতে নারী অধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন যদিও দয়ানন্দ সরস্বতী বা অ্যানি বেশান্তের মত আরো অনেকেই বৈদিক যুগের আদর্শে ফিরে যাওয়ার কথা বলতেন।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একটি ইতিবাচক ফল ছিল বহুকাল ধরে উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের মধ্যে চলতে থাকা অমানবিক *সতীদাহ* বা সহমরণ প্রথার প্রতি আইনগত নিষেধাজ্ঞা (1829)। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষিতভাবে চলতে থাকা সতীদাহ বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর (1556-1605) ও ঔরঙ্গজেব (1658-1707)। গোয়ার পর্তুগীজ শাসকগণ 1515 খ্রীষ্টাব্দেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন যদিও গোয়াতে সতীদাহ প্রথা আদৌ ছিল কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওলন্দাজ ও ফরাসীগণ তাদের অধিকৃত অঞ্চল বিশেষ করে চুঁচুড়া ও পণ্ডিচেরিতে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন। তবে শ্রীরামপুরের দিনেমার অধিকৃত অঞ্চল ও প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশে সতীদাহ প্রথা উনবিংশ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রিটিশ অধিকারিকই সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সোচ্চার ছিলেন। ব্রিটিশরা সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন 1778 খ্রীষ্টাব্দে ঐবছর কলকাতা শহরে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হয়। তবে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে খ্রীষ্টান মিশনারী William Carry ও William Wilberfarce সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে 1813 খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী Bengal Presidency তে সতীদাহের ঘটনার পরিসংখ্যান শুরু করে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায় (1772-1833) 1812 খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য তার আন্দোলন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত 1829 খ্রীষ্টাব্দের 4ঠা ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণর Lord William Bantinc বাংলায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এই আইনের বিরুদ্ধেও পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের Privy Council এই আইনের পক্ষে মত দেয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য

নারীর সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার অবনমন ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছিল। বিশেষ করে **স্ত্রীধনে** নারীর অধিকার সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে পরিবারের সম্পত্তি করার সমতুল বলে ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রকারগণ। কিন্তু সম্পত্তির অধিকারে শাস্ত্রের আইনগণ ব্যাখ্যা বাস্তবে কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার ও সুবিরা জয়সওয়াল।

প্রাচীন যুগের নারীর অধিকার আলোচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকাশ নারীর অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। স্ত্রী ও মা হিসাবে নারীর অবস্থান বৌদ্ধ সাহিত্যে অসম্মানীয় ছিল না। নর্তকী ও ভিক্ষুণী হিসাবেও বৌদ্ধ নারীর অবস্থান সম্মানীয় ছিল। তবে বৌদ্ধ সংঘে ভিক্ষুণীর অধিকার পিতৃতান্ত্রিক তা থেকে সুরক্ষিত ছিল না।

কিন্তু নারীর অধিকার খানিকটা প্রশস্ত হয়েছিল মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের বিকাশের ফলে। ভক্তিবাদের প্রচারকগণ ইহজগতের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির জন্য মধ্যবর্তী কোন সত্তা পুরোহিত বা পণ্ডিতের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেননি। এমনকি সংস্কৃত (দেবভাষা) ভাষার পরিবর্তে মানুষের ভাষার মাধ্যমে ভক্তিরস প্রচারে জোর দিয়েছিলেন তারা। তাই উত্তর ভারতে মীরা ও লাল্লা, দক্ষিণ ভারতে অন্দল ও অক্কা মহাদেবী ও পশ্চিম ভারতে বহনবাঈ -এর মতো কবির প্রচার অনেক সহজ হয়েছিল। কিন্তু এরা কেউই নারীর অধিকার লংঘনের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

৭.৪.২.১ : ভারতীয় নারীর অধিকার ঃ ঔপনিবেশিক আমল

পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক থেকে ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্র ধরে ক্রমাগত ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভারতে আগমন ভারতীয় নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার অর্জন করার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। 1498 খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামার জাহাজ নোঙর করার পর ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে পর্তুগীজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। একে একে দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও ভারতে উপস্থিত হয়। তবে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতে ইংরেজ শক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ভারতে ঔপনিবেশিকতা বাদের ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি মূদ্রা ব্যবস্থার আধুনিকিকরণ, কৃষির বাণিজ্যিকিকরণ ও শিল্পজাত পণ্যের ব্যবহার ইত্যাদি ভারতীয় সমাজে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করে। কিন্তু প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জাতি ব্যবস্থার (Caste system) বিলুপ্তি ঘটেনি। তবে এখানে উল্লেখ্যনীয় যে ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি ভারতীয়দের নতুন আদর্শ বিশেষ করে মুক্তিবাদ (rationalism)-এর পরিচিত করে।

থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীনকালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্র (Law books) গুলো নারীসহ বিভিন্ন সামাজিক সত্তা বিশেষ করে নিম্নজাতিয় সম্প্রদায়ের (Lower caste communities) অবদমিত অবস্থানের স্বাক্ষ্য বহন করছে। এই শাস্ত্রগুলো মুলত পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃকুলানুশারী (Patriarchal patrilinial) সমাজ, পরিবার বয়জ্যোষ্ঠ পুরুষ ব্যক্তির কর্তৃত্ব এবং নারী ও জাতির অবদমনের ব্যবস্থাকে বহুমুখী ব্যাখ্যার দ্বারা বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি *শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়* বৈশ্য ও শুদ্রজাতি এবং নারীকে সামাজিক মর্যাদায় সমগোত্রীয় হিসাবে ব্যাখ্যা করে ঐ কুল সমূহে মানুষের জন্মকে পূর্বজন্মের পাপের পরিণতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *পরাশর* স্মতিতেও নারী ও শুদ্রকে হত্যা করার শাস্তি সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে নারীর স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে কতগুলো বাধা ছিল। কন্যা সন্তানের জন্ম বৈদিকযুগে অসম্মানীয় না হলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে তা পিতা মাতার শংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষায় নারী ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথাগত শিক্ষালাভ করার সূচনা নারী ও শুদ্রের ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক সময় দেখা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর আর প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্যদিকে অষ্টম শতকের মধ্যে মেয়েদের বিয়ের বয়স ৯ থেকে ১০ এর মধ্যে নেমে আসে। যার ফলে নারীর শিক্ষালাভের সুযোগ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি প্রাক্-বয়োসন্ধি (Prepuberty) বিয়ের প্রথা নারীর স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক বিকাশের পথও বন্ধ হয়েছিল।

তবে অভিজাত ও শাসক পরিবারের মেয়েরা প্রথাগত শিক্ষা ও সামরিক শাসন সহ শিল্প চর্চার কিছু অধিকার ভোগ করতেন। তাই প্রাচীন কালে গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী বা অম্রাপলীর মতো স্বনামধন্যা নারীর অস্তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। একইভাবে মধ্যযুগীয় ভারতীয় নারী মীরা বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু এরা ছিলেন ব্যতিক্রম। প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্গীয় নারী মূলত পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী ছিলেন। স্বাধীন স্বত্ত্বা হিসাবে নারীর অধিকার ভোগ করার অধিকার প্রায় ছিলনা বললেই চলে। **মনুসংহিতার** বিধানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে নারী কন্যা হিসাবে তার পিতা, স্ত্রী হিসাবে স্বামী ও বিধবা হিসাবে তার পুত্রের অধীন থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃকুলানুশারী সমাজে নারীকে কূল রক্ষার প্রধান বাহন হিসাবে দেখা হতো। জাতি ব্যবস্থার পবিত্রতা রক্ষায় নারীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাই অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ের পাশাপাশি স্বজাতি (own caste) ও অনুলোম বিবাহ প্রথা নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘনের স্পষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি প্রতিলোম বিবাহ প্রথা নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘনের স্পষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের নারীর নিম্নবর্গীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহের প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। উচ্চবর্গীয় বিধবা নারীর অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ। তার পুনঃ বিবাহের অধিকার ছিল না। জীবনের সবরকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে তাকে পরিবারের দুর্ভাগ্য হিসাবে দেখা হতো।

৭.৪.২.০ : ভূমিকা

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ তথা মানব সমাজের মূল ধারক 'নারীদের নিয়ে আজকের সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসে আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অধিকার লংঘনের অমোঘ সত্য। সারা বিশ্বের বহু জাতি, বর্ণ, ভাষা ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত 'নারী সমাজকে' কয়েকটি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অঞ্চল ও দেশ ভেদে তাদের প্রথাগত প্রচলিত অধিকার (customary rights) এবং আইনগত অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতের মত বিস্তৃত এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বতা (Cultural Plurality) - র দেশে নারীর প্রচলিত অধিকার ও আইনগত অধিকারে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতার মূল চালিকা শক্তি হল ভারতের সাংস্কৃতিক বত্বতা বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। ফলে ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মীয় পরিচিতির ভিন্নতার জন্য আইনগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা ভোগ করে আসছে। পাশাপাশি ভারতের উপজাতীয় সমাজে হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর (Tribal Communities) নারীর নিজস্ব কতগুলি প্রচলিত নিয়মকানুন আছে যা ঐ সমাজের নারীদের তথা কথিত ভারতীয় সমাজের মূল সংস্কৃতির (Main Stream Culture) নারীদের থেকে আলাদা (Other) হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আলোচ্য এককে ভারতীয় নারীর প্রথাগত অধিকার ও আইনগত মর্যাদা নিয়ে ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় উপজাতি নারীর (Tribal Women) অধিকারের উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অধিকার নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের ভারতীয় নারীর অবস্থান একটু পর্যালোচনা করা দরকার। বেশীরভাগ ঐতিহাসিক প্রাক্ ঔপনিবেশিক Pre-colonial ও ঔপনিবেশিক আমলের ভারতীয় নারীর অবস্থান আলোচনা করেছেন ঐ সমাজের বস্তুগত সম্পত্তি (Material Culture) ও সামাজিক গঠনের Forms of the society প্রেক্ষিতে। ভারতীয় নারী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) এর মাপকাঠির উপর আলোকপাত করেছেন। সুবিরা জয়স্বয়াল মনে করেন যে বৈদিকযুগে ভারতীয় জনগোষ্ঠীগুলি ছিল মূলত পশুচারণের উপর নির্ভরশীল এবং তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। ফলে ঐ সময় অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত উৎপাদন (Surplus generation) সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সামাজিক স্বত্তার (Social Categories) প্রথাগত অধিকার ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। বৈদিকযুগে তাই শিক্ষা ও ধর্মাচরণে নারীর অধিকার ছিল সুরক্ষিত যা বর্ণ ব্যবস্থার হাত ধরে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ (caste based social classes) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অরক্ষিত হতে থাকে। নারীর প্রথাগত অধিকারের এই অবনতি মোটামোটিভাবে খীষ্ট্রপূর্ব ৫০০ অব্দ

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

CUSTOMARY AND LEGAL STATUS

একক - ২

(a) Colonial India

(b) Post-Independence

(c) Tribal Societies

বিন্যাসক্রম :

৭.৪.২.০ : ভূমিকা

৭.৪.২.১ : ভারতীয় নারীর অধিকার : ঔপনিবেশিক আমল

৭.৪.২.২ : স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর আইনগত অধিকার

৭.৪.২.৩ : উপজাতি সমাজে নারীর অবস্থান

৭.৪.২.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.২.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

5. সেন, ক্ষিতিমোহন : প্রাচীন ভারতে নারী (শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৯৮২)

6. হাবিব, ইরফান (সম্পাদিত) : মধ্যকালীন ভারত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা, ১৯৯৩, ২০০০)

7. Chopra, P.N., Puri B.N., Das M.N. : A Social Cultural and Economic History of India, No. 1-11 (Delhi 1924)

৭.৪.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. Write a note on women's education is ancient India. Do you think that the vedic tradition regarding women's education continued in later times as well ?
2. Evaluate the legal and customary rights of women in the Vedic period.
3. How did the Smritis depiet the Position of women in the family circle during the ancient period ?
4. Critically analyse women's right to property in ancient India.
5. Discuss different aspects related to customary and legal status of women within the family in medieval India.
6. Critically discuss the purdah System and the position of the widows in medieval society.

———————

অন্তঃপুরবাসিনী হলেও এ যুগে অনেক বিদুষী মহিলা ছিলেন, যারা শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা করতেন, কেউ কেউ রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতেন। সুলতানি যুগে সুলতানা রাজিয়া, পদ্মিনী, মীরাবাঈ, দেবনারানী প্রমুখ এর গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত। মুঘল রাজপরিবারের মহিলাদের আত্মসম্মানবোধ ও মর্যাদাজ্ঞান প্রখর ছিল। গুলবদন বেগম, নূরজাহান, জাহানারা, জেব-উন্নিসা প্রমুখরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন ও সাহিত্য সাধনা করেছেন। মহারাষ্ট্রে রামদাস স্বামীর শিষ্যা আকাবাঈ এবং কেনাবাঈ সাহিত্য চর্চা করতেন। ভক্তি সাহিত্যে মীরাবাঈ ছাড়াও ছিলেন তামিল মহিলা কুমারীমল্লা, মারাঠী মহিলা মুক্তিবাঈ প্রমুখরা।

বস্তুতঃ নারীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি অবহেলিত ছিল না অন্ততঃ উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির ক্ষেত্রে। মেয়েদের আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। গৃহেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোত। রাজপরিবারের নারীরা অনেকেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। মুঘল অন্তঃপুরবাসিনীরা অনেকেই কোরান পড়তে পারতেন। বাদশাহের পাশাপাশি তারাও গুণীজনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জাহানারা 'মুখফি' ছদ্মনামে সাহিত্য রচনা করতেন। রোশোনারা দিল্লীতে এক সাহিত্যসভা গড়ে তোলেন। জেব-উন্নিসা ও জিনাত-উন্নিসা কবিতা রচনা করতেন।

কোন কোন অভিজাত বংশীয় নারী রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতেন যেমন, আহমেদনগরের চাঁদবিবি, গন্ডোয়ানার রানি দুর্গাবতী প্রমুখ। সুলতানি যুগে রাজিয়া সুলতানা বা মুঘল যুগে নূরজাহান, জাহানারা প্রমুখরা ছিলেন ওই সময়ের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। মহারাষ্ট্রে এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর পুত্রবধূ তারাবাঈ, যিনি মারাঠাদের সংকটময় সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

সুতরাং মধ্যযুগে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান বিভিন্ন দিক থেকে সীমাবদ্ধ থাকলেও, সমাজ জীবনের কিছু ক্ষেত্রে তাঁরা সাফল্যের সাথে অংশ গ্রহণ করেছেন, তা বলা যেতে পারে।

৭.৪.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Basham, A.L. : The Wonder that was India. (Calcutta, 1987)
2. Majumdar, R.C. (ed) : The Vedic Age, (Bombay, 1988)
3. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ : ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট (কলকাতা, ১৯৯৯)
4. ভট্টাচার্য, সুকুমারী : প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য (কলকাতা, ১৪১১)

কাউকে সতী করার চেষ্টা হলে, তা রোধ করতে হবে। দিন-ই-ইলাহীতে আকবরের সতীদাহ প্রথা বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। কখনও আকবর ব্যক্তিগতভাবে অনিচ্ছুক বিধবাকে সতী হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন বলে জানা যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় পর্যটকরা, যথা পেলসার্ট, ট্যাভারনিয়ার প্রমুখ, সতীদাহের ক্ষেত্রে সরকারী অনুমতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এই আইনের পরিবর্তন করেননি। এরা এই সতীদাহ প্রথা সমর্থন করতেন না ও মুসলমানদের এই প্রথা থেকে দুরে রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর সাম্রাজ্য থেকে পুরোপুরি সতীদাহ প্রথা তুলে দিতে আইন প্রণয়ন করেন (১৬৬৪)। তবে এই আইন ফলপ্রসূ হয়নি।

রাজপুত সমাজে 'জহর ব্রত' নামে এক প্রথার প্রচলন হয়েছিল। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত হয়ে গেলে শত্রুপক্ষের হাত থেকে সম্মান বাঁচানোর জন্য সাধারণতঃ রাজপুত অভিজাত মহিলারা আগুনে আত্মাহুতি দিতেন। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে চান্দেরী দুর্গাধিপতি মেদিনীরাও-র পরাজয় ও জহরব্রত পালনের এক মর্মস্পর্শী ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সমগ্র মধ্যযুগে রাজস্থানের ইতিহাসে জহরব্রত পালনের বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে।

মধ্যযুগে কন্যা, পত্নী ও বিধবা হিসাবে নারীর স্থান যাইহোক না কেন, মাতা হিসাবে তাঁর সমাজে একটি শ্রদ্ধার আসন ছিল। সমসাময়িক সূত্রগুলি থেকে জানা যায় যে মুঘল শাসকরা তাঁদের মায়েদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মুঘল সাম্রাজ্যে সম্রাটের পত্নী, প্রথম নারী (first lady) ছিলেন না (ব্যতিক্রম নূরজাহান ও মমতাজমহল) — ছিলেন সম্রাটের মাতা বা ভগ্নী। মাতাকে সম্মান দেওয়ার ব্যাপারটি সমাজের সবস্তরেই ছিল।

নারীর সম্পত্তিতে অধিকারের প্রশ্নে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। মুসলিম নারী সম্পত্তির একটি সুনির্দিষ্ট অংশ উত্তরাধিকার হিসাবে পেতেন, যা তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারতেন। বিবাহের পরেও মুসলিম রমণীর এই অধিকার বজায় থাকত, যা হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে ছিল না। মেহের (Mehr/mahr or ante-nuptial settlement) ব্যাপারটিও মুসলিম রমণীর স্বার্থরক্ষা করত। অন্যদিকে হিন্দু রমণীর কোন আইনগত অধিকার স্বামীর পিতামাতার সম্পত্তির উপর ছিল না। হিন্দু-মহিলা অলংকার, পোষাক ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি ও ভরণপোষণের অধিকার পেতেন। উচ্চবিত্ত বা উচ্চবংশীয় মহিলারা অন্তঃপুরেই বিচরণ করতেন। তাঁরা কোন অর্থকরী বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন না। নিচের স্তরে কৃষক ও শ্রমজীবী মহিলারা বিভিন্ন অর্থকরী বৃত্তির সাথে যুক্ত থাকতেন ও অর্থোপার্জনের মাধ্যমে পরিবারকে সাহায্য করতেন। নৃত্যগীত, ধাত্রীবৃত্তির সাথেও নারীরা জড়িত ছিলেন। শিক্ষিকার ভূমিকাতেও নারীদের দেখা যেত।

যে, সাধারণ উপার্জনকারী কোন ব্যক্তি একের বেশী পত্নী বিবাহ করতে পারবেন না, যদি পত্নীর কোন সন্তান না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ করা যেতে পারে। ধনী মুসলমানদের মধ্যে অবশ্য বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল — তারা বেশীর ভাগই একইসাথে তিনজন বা চারজন পত্নী রাখতে পারতেন। হিন্দুদের ক্ষেত্রে অবশ্য, রাজপরিবার ও ধনী শ্রেণী ব্যতীত, পুরুষদের একটি বিবাহই প্রচলিত ছিল। পত্নীর সন্তান না থাকলে, দ্বিতীয়বার বিবাহ করা যেত। বাংলাদেশে কুলীনরা অবশ্য বহুবিবাহ করতেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যেও পুরুষরা বহুবিবাহ করতেন।

সমাজে নারীদের ক্ষেত্রে অবরোধ প্রথা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও বাল্যবিবাহের কারণে, বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার সম্মতি দানে প্রশ্নটি উঠত না বললেই চলে। স্বামীগৃহে তাঁকে সবার অনুগত হয়ে থাকতে হতো, নতুবা হিন্দু পরিবারে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠত, আর মুসলমান পরিবারে বিবাহবিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকত। এসব সত্ত্বেও, গৃহে সাধারণভাবে নারীর একটা সম্মানের আসন ছিল। জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে লিখেছেন যে, সামাজিক জীবনে হিন্দুরা যে কোন শুভকার্যে পত্নীর অংশগ্রহণ ও উপস্থিতির উপর গুরুত্ব দিতেন। অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আশা করা হতো যে স্ত্রী যেন চিন্তায় ও কাজে স্বামীর অনুবর্তিনী হয়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মানের ব্যাপারটি অনুপস্থিত ছিল না। কর্নেল টড রাজস্থানের অভিজাত পরিবারের রমনীদের উচ্চ মর্যাদার কথা বলেছেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ মুসলমান নারীদের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও হিন্দু নারীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ছিল। নিম্ন জাতিগুলি বাদে, মধ্য যুগে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হতো না। উচ্চবিত্ত হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইবনবতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দিল্লির সুলতানরা আইন জারি করে বলেছিলেন, সরকারী অনুজ্ঞাপত্র ছাড়া সুলতানের রাজ সীমার মধ্যে কোন বিধবাকে জীবন্ত দগ্ধ করা যাবে না। উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষত রাজস্থানে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্যেও এই প্রথা ছিল। বিজয়নগরের শাসকরা সম্ভবত এই প্রথা বন্ধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হননি। মধ্যযুগে মহম্মদ বিন তুঘলক-ই (১৩২৫-১৩৫১) হয়ত প্রথম শাসক যিনি এই প্রথা বন্ধে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার রাজত্বে সতীদাহ অনুষ্ঠিত করতে গেলে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হত। এই আইনের মাধ্যমে অনিচ্ছুক বিধবাকে সতী হওয়া থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। এই আইন পরবর্তীকালেও প্রচলিত ছিল। হুমায়ুনের আমলে যখন সিদি আলি রেইস (১৫৫৩-১৫৫৬) ভারতে আসেন, তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, সতীদাহ হবার সময় সুলতানের কর্মচারীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতেন, যাতে বলপূর্বক বিধবাকে সতী না করা হয়।

মুঘল শাসকদের মধ্যে আকবর, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি এই প্রথাটিকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করেননি, তবে কোতোয়ালদের নির্দেশ দেওয়া ছিল যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে

তেমন প্রচলন ছিল না। রাজপুত মহিলারা পারদর্শী ছিলেন ও বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করতেন। দক্ষিণ ভারতেও কয়েকটি অভিজাত মুসলমান পরিবার ব্যতীত পর্দাপ্রথা ছিল না। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে — মহিলারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতেন। নূন্যিজের মতে, মহিলারা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অনেক ক্ষেত্রে চাকরিতে নিযুক্ত হতে পারতেন।

এ যুগেও কন্যা সন্তানের জন্মকে সুনজরে দেখা হতো না। আকবরনামাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি পত্নী দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু কন্যাসন্তানই জন্ম দিতে থাকেন, তবে তাকে ঘৃণা করা হতো। এমনকি কোন কোন সময় বিবাহ বিচ্ছেদও হতো। এ ধরনের মনোভাব থেকে রাজপরিবারগুলিও মুক্ত ছিল না। কন্যা জন্মালে কেবল অন্তঃপুরের মহিলারা আনন্দ করতেন, আর পুত্র জন্মগ্রহণ করলে পুরো রাজ দরবার উৎসব করত। কন্যাদের বাল্যবিবাহ তখন রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণত, ছয় থেকে আট বছরের মধ্যেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। ষোড়শ শতকে মুকুন্দরাম লিখেছেন যে যদি কোন পিতা তাঁর কন্যার বিবাহ কন্যার ন বছর বয়েসেই দিতে পারতেন, তাহলে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান ও ঈশ্বরের কৃপাধন্য বলে মনে করতে পারতেন। পুত্রদেরও অল্প বয়েসেই বিবাহ হতো। বাল্যবিবাহ হতো। বাল্যবিবাহ ব্যাপারটি এতটাই প্রচলিত ছিল যে, পাত্র কিংবা পাত্রী, কেউই নিজ পছন্দ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী পছন্দ করার সুযোগ পেতেন না। পিতা বা পরিবারের সদস্যরাই বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করতেন। পণ দাবি করা হোত। কখনও কখনও বিবাহে পণই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াত। কোন কোন অঞ্চলে, কোন কোন জাতির মধ্যে কন্যাকে অর্থের বিনিময়ে পিতা বিবাহ দিতেন। সমাজে বরপণও বহুল প্রচলিত ছিল। অনেক সময় অর্থের আশায় কোন যুবক তার থেকে অনেক বেশী বয়েসী মহিলাকে বিবাহ করতেন। এই ব্যাপারটি এত বেড়ে গিয়েছিল যে, আকবর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি পাত্রীর বয়স, তার স্বামীর চেয়ে ১২ বছরেরও বেশী হয়, তাহলে সেই বিবাহকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে। আকবর চেয়েছিলেন যে বিবাহের ক্ষেত্রে পিতামাতার সম্মতির পাশাপাশি পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক সম্মতিও আবশ্যিক করা হোক। কিন্তু তার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। তবে কর্নেল জেমস টডের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে রাজস্থানের অভিজাত পরিবারের মহিলারা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন।

উভয় সম্প্রদায়েরই নিচের স্তরে নারী - পুরুষের একবার বিবাহই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এফ. ডব্লিউ. টমাস, মুসলিম বিবাহ রীতির উপর হিন্দু প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে মুসলিম শাস্ত্রের বিধানে প্রকৃত মুসলমানদের চারটে পর্যন্ত বিবাহ করার অধিকার স্বীকৃত এবং বিবাহ-বিচ্ছেদেরও সহজ অনুমোদন আছে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানরা অধিকাংশই এক-পত্নীর জীবন যাপন করত এবং বিবাহ বিচ্ছেদ প্রায় অজ্ঞাত ছিল। আকবরের সময়ে, ইবাদত খানায় উলেমারা এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, একজন মুসলমান 'mutah'-র মাধ্যমে যত খুশী বিবাহ করতে পারেন ও 'nikah-র মাধ্যমে মাত্র চারবার বিবাহ করার অধিকারী। আকবর এই সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব না দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন

ব্যক্তিরূপে স্থান পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল। আর্থিক স্বাধীনতাও তাঁর ছিল না। কোন অর্থকরী বৃত্তির শিক্ষা বা ব্যবহার উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত স্তরের মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রায় ছিল না। একেবারে সমাজের নিচের স্তরের মহিলারা কিছু অর্থকরী বৃত্তির সাথে যুক্ত থেকে হয়ত কিছুটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতেন। এমনতাবস্থায় সামাজিক ও আর্থিকভাবে নির্ভরশীল নারীরা সম্পত্তির অধিকার কতটা বাস্তবে পেতেন ও পেলেও সেই সম্পত্তি কতটা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারতেন, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

৭. ৪.১.৬ : মধ্যযুগে ভারতের নারীর প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান ও মর্যাদা

প্রাচীন ভারতে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান ও মর্যাদা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগে এই ক্ষেত্রে কিছু নূতন উপাদান যুক্ত হয়েছিল ঠিকই, তবে সমাজে নারীর অবস্থানের যে সামগ্রিক চিত্র প্রাচীনকালে দেখা যায়, তার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এ যুগে আসেনি। এ সময়েও পরিবারই ছিল সামাজিক জীবনের মূলভিত্তি। হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক সমাজজীবন হলেও, পিতাই যে পরিবারের কর্তা, তা উভয় সমাজেই স্বীকৃত ছিল। তবে মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ রীতি, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি হিন্দু সমাজে অভিনব ছিল। অবশ্য উভয় সমাজই কিছু সাধারণ পিতৃতান্ত্রিক রীতি মেনে চলত। নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য; কন্যা সন্তান অপেক্ষা পুত্র সন্তানের অধিক কদর ইত্যাদি উভয় সমাজেই স্বীকৃত ছিল। উভয়ক্ষেত্রেই নারী ছিলেন মূলতঃ অন্তঃপুরবাসিনী।

প্রাক্-মধ্যযুগ থেকেই ভারতীয় সমাজে নারীর ক্ষেত্রে অবরোধ প্রথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে এই অবরোধ প্রথা আরও বিস্তৃতি ও কঠোরতা লাভ করে। মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথা বহু পূর্ব থেকেই ছিল। ভারতে মুসলিম শাসন আরম্ভ হলে হিন্দু সমাজেও পর্দাপ্রথার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে মেয়েদের 'ঘোমটা' দেওয়ার রীতি থাকলেও, মধ্যযুগে হিন্দু রমণীদের পর্দা প্রথার ব্যাপারটি মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে হয়েছিল, বলা যেতে পারে। আকবরের মতো উদার শাসকরাও পর্দা প্রথার সমর্থক ছিলেন।

অভিজাত মুসলমান সমাজে পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় — হিন্দু উচ্চবিত্ত সমাজেও এই প্রথা বিস্তার লাভ করে। উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাতবর্গের মধ্যে পরিবারের মহিলাদের অবরোধ ব্যবস্থার মধ্যে রাখা একটি সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নবিত্তদের মধ্যে, বিশেষত হিন্দু কৃষকরমণীদের বা শ্রমজীবী রমণীদের মধ্যে অবশ্য পর্দা-প্রথার প্রচলন ছিল না। তারা স্বামীর পাশাপাশি উৎপাদনে অংশগ্রহণ করতেন।

পর্দাপ্রথার প্রচলনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক তারতম্যও ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমদিকে পর্যটক বারবোসা বঙ্গদেশে পর্দাপ্রথার ব্যাপক প্রচলন দেখেছিলেন। অন্যদিকে রাজপুত পরিবারগুলির মধ্যে এর

পতিগৃহে যাবার সময় প্রাপ্ত ধনকে 'অধ্যাবাহনিক' বলা হতো। মনুর মতে, অধ্যাগ্নি, অধ্যাবাহনিক, প্রীতিবশত পতির কাছে প্রাপ্ত, ভাইয়ের কাছে, মায়ের কাছে, বাপের কাছে প্রাপ্ত — এই ছয় প্রকারে প্রাপ্ত ধনই স্ত্রীধন। নারদীয়-মনুসংহিতাতে, যাজ্ঞবল্ক্যেও এই ব্যবস্থা দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রের মতে, বৃত্তি অর্থাৎ ভরণপোষণের জন্য ধন এবং অলংকারাদি হল স্ত্রীধন। সাধারণতঃ বিবাহের সময় কন্যাকে দান ও যৌতুক দেওয়া হতো। মহাভারতে দেখা যায়, নারীরা বিবাহকালে শ্বশুরাদি গুরুজনের কাছে প্রীতিউপহার বা প্রীতিদায় স্বরূপে ধনরত্নাদি লাভ করতেন।

বৌদিক যুগে কন্যাদের গবাদি অস্থাবর সম্পত্তি ও বসন ভূষণ অলংকারাদি দিয়ে পতিগৃহে পাঠান হত। ভূ-সম্পত্তি দেবার ব্যাপার তখন ছিল না। পরবর্তীকালে মৈত্রায়নী সংহিতায় বলা হয় যে পুত্র উত্তরাধিকার পাবে। কন্যা পাবে না। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়, পুত্র থাকলে পুত্র বা ধর্মবিবাহে জাতা কন্যা উত্তরাধিকারী হবে। পুত্র না থাকলে, কন্যা অধিকারী — এ কথা মনুস্মৃতিতেও রয়েছে। মনুর সিদ্ধান্ত অনুসারে পুত্রেরা যা পাবে, তার চারভাগের একভাগ প্রত্যেক ভাই কন্যাদের দেবেন। পুত্রদের একচতুর্থাংশ কন্যা পাবেন— এটিকে যাজ্ঞবল্ক্যও সমর্থন করেন। তাঁর মতে, স্বামীদত্ত বা শ্বশুর দত্ত স্ত্রীধন না থাকলে সম্পত্তি ভাগ করার সময় পত্নীদেরও সমান অংশ থাকা উচিত। যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলেন, পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগকালে মাতাও সমান অংশ পাবেন। বৃহস্পতিও বলেন, মায়ের ভাগ সমান, কন্যার ভাগ একচতুর্থাংশ। কাত্যায়নও অবিবাহিতা কন্যার এক চতুর্থাধিকারই সমর্থন করেন। সামান্য সম্পত্তি থাকলে কন্যা ও পুত্রদের ভাগ সমান হবে। বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে, অপুত্রা সাধ্বী পত্নীর স্বামীর পিণ্ডদানের ও সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। পত্নী না থাকলে কন্যাকেই শাস্ত্রবিহিত উত্তরাধিকারিনী বলা হয়েছে, কারণ পুত্রাভাবে দুহিতাই পুত্র।

স্ত্রীধনের উপর স্বামী বা শ্বশুরকুলের কোন অধিকার নেই বলে, স্মৃতিগ্রন্থে বলা হয়েছে। তবে কোন কোন স্মৃতির মতে দুর্ভিক্ষে, বন্দীদশায়, রোগে এবং ধর্মার্থে স্বামী তার স্ত্রীর স্ত্রীধন গ্রহণ করতে পারেন। এখানে কাত্যায়ন বলেন, স্ত্রীধনে স্বামী-পুত্র, পিতা-ভ্রাতা কারোর কোন অধিকার নেই। যদি এদের কেউ বলপূর্বক তা ভোগ করেন, তবে তা দন্ডনীয় ও সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য। তবে এদের কেউ বিপদগ্রস্ত হলে স্বত্বধিকারিনীর আজ্ঞানুসারে, স্ত্রীধনের কিছু অংশ ব্যবহার করতে পারেন। তবে সমর্থ হলেই সেই মূল্যধন তিনি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে বিরুদ্ধ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও নারীরা তাদের স্ত্রীধন থেকে বঞ্চিত হত না। স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তার কন্যা সন্তানরা পাওয়ার অধিকারী ছিল। তবে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর যদি স্ত্রী, শ্বশুরের বিনা অনুমতিতে অন্যত্র বিবাহ করে, তাহলে তিনি শ্বশুরের ও পতিদত্ত ধন পাবেন না।

তবে ধর্মশাস্ত্রকাররা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীকার করলেও, এই অধিকার বাস্তবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কতটা পরিমাণে নারীরা ভোগ করতে পারতেন, তা নিয়ে সংশয় আছে। সমাজে স্বতন্ত্র

নারী। নারী সহমরণে গেলে পুণ্যার্জন করবেন, এই ধারণা ছিল। তবে সতীপ্রথার ব্যাপক প্রচলন এই যুগে বোধহয় ছিল না। ফা-হিয়েন সতীদাহ প্রথার উল্লেখ করেননি। আর, সতীদাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন থাকলে এই সময়ের শাস্ত্রকাররা বৈধব্য জীবনে নারীর অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে বেশী আলোচনা করতেন না।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় (কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল) নারীর প্রথাগত ও আইনগত অধিকার পুরুষদের তুলনায় সীমাবদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদের যুগের প্রথম দিকে নারীদের যে অধিকারসমূহ ছিল, পরবর্তীকালে তা খর্ব হয়। নারীকে প্রধানতঃ অন্তঃপুরবাসিনী করে রাখা হয়, যদিও অন্তঃপুরের বাইরেও বিভিন্ন ভূমিকায় নারীকে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। তবে নারীজাতির খুব সামান্য অংশেই পরিবারের বাইরে সম্মানীয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পেতেন। প্রাচীন ভারতের সমাজে এমন কিছু নারী ছিলেন, যাদের পারিবারিক সম্পর্কের দ্বারা কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। পারিবারিক জীবনবৃত্তের বাইরে অনেক নারী ধর্মচর্চা করতেন বা সন্ন্যাসিনী হতেন। নারীদের স্বাভাবিক জীবনধারার বাইরে ছিলেন গণিকা, দেবদাসী প্রমুখরা। বৈদিক সাহিত্যে গণিকাবাচক কয়েকটি শব্দ পাওয়া যায়। বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে যে নারীকে মূল্য দিয়ে পাওয়া যায় তাকে গণিকা বলা হয়েছে। তবে এই শ্রেণীর নারীদের শ্রেণীবিভাগ আছে। অনেক সময় গণিকাকে এই বৃত্তিতে নিযুক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলা হয়েছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে বলা হয়েছে, যারা চৌষট্টিকলায় পারদর্শিনী, রূপ ছাড়াও বিদ্যা ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, তারা গণিকা। গণিকার নীচে এই বৃত্তিতে আরও স্তর ছিল। কৌটিল্য গণিকাধ্যক্ষ নামক রাজকর্মচারী নিয়োগের কথা বলেছেন, যার দায়িত্ব ছিল, তাদের দেখাশোনা করা ও সুরক্ষা প্রদান করা। রাষ্ট্র গণিকার শিক্ষার ব্যয়বহন করত, তার আয় থেকে নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করত। অর্থশাস্ত্রে বার্ধক্যে তাকে কিছু বৃত্তি দেবার কথাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ গণিকাদের কিছু দায়িত্ব ও অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদানে গণিকাবৃত্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দেবদাসীদের কাজ ছিল পূজার বিশেষ বিশেষ সময়ে মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গনে দেবতার উদ্দেশ্যে নৃত্য করা, যার বিনিময়ে তারা বৃত্তি ও ভরণপোষণ পেতেন মন্দির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। মন্দির পুরোহিত রাষ্ট্র থেকে বৃত্তি পেতেন, তা দিয়ে তিনি দেবদাসীদের ভরণপোষণ করতেন, কখনো কখনো দেবদাসীরাও বৃত্তি পেতেন।

৭৪.১.৫ : প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্পত্তির অধিকার

ঋগ্বেদের যুগ থেকে ধর্মসূত্রের যুগ পর্যন্ত নারীর সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না। তবে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি প্রভৃতিতে সম্পত্তিতে নারীর কয়েকটি অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নারীদের সম্পত্তি স্ত্রীধন নামে পরিচিত। পিতৃগৃহ থেকে প্রাপ্ত ধন এবং পতি যা স্ত্রীকে বিশেষ করে দিতেন, তা হল স্ত্রীধন। এই স্ত্রীধনে নারীর নিজস্ব অধিকার ছিল। বিবাহের সময় অগ্নির সম্মুখে পিতৃকুল থেকে

গুপ্তযুগে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে রাজপরিবারের মহিলারা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা ও বাকাটক বংশের রাণী প্রভাবতী গুপ্তার কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবক হিসাবে বাকাটক রাজ্য শাসন করতেন বলে শিলালেখ থেকে জানা যায়। সাধারণভাবে রাজমহিষীর স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্তযুগের অল্পকাল পরে কাশ্মীর, ওড়িশা ও অন্ধ্রদেশে রানীরা প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতেন। কানাড়া অঞ্চলে নারীরা প্রদেশ ও গ্রাম শাসন করতেন। সমাজের উচ্চস্তরের গৃহী মহিলাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিতা ছিলেন। সমসাময়িক সাহিত্য; লেখগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামসূত্রের প্রণেতা বাৎসায়ন লিখেছেন যে তখন শাস্ত্রজ্ঞান মেয়েদের মেধাকে শাণিত করত। তিনি আদর্শ পত্নীর যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট যে, তাঁকে শিক্ষিতা হতে হতো এবং সংসারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরি করতে হতো। সংসারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব আদর্শ স্ত্রী-র উপরই বাৎসায়ন অর্পন করেছেন। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে দেখা যায়, নারীরা অনেকেই শাস্ত্র ও কাব্য চর্চা করতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে একত্রে শিক্ষালাভ করত। গুপ্তযুগের রচনা, অমরকোষে, বৈদিক মন্ত্রের শিক্ষিকা, আচার্যের উল্লেখ আছে।

পূর্ববর্তী যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এ যুগের রচয়িতারাও আদর্শ পত্নীর চিত্র অঙ্কন করেছেন। বাৎস্যায়ন লিখেছেন যে, একজন আদর্শ স্ত্রী তাঁর স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করবেন ও স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করবেন। কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে স্ত্রী কখনো স্বামীকে পরিত্যাগ করবে না। স্বামীর জীবদ্দশায় তার সেবা করবেন ও স্বামীর মৃত্যুর পর পবিত্র জীবন যাপন করবেন। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকেও কন্বমুনি আশ্রম থেকে শকুন্তলাকে বিদায়ের মুহূর্তে, তাঁকে স্বামীর প্রতি সর্বদা অনুগত হবার উপদেশ দিয়েছেন। গুপ্তযুগের আরেকটি রচনা বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'য় অবশ্য নারীদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে — সমাজে স্ত্রী বা নারীদের যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা স্বীকার করা হয়েছে।

এ যুগের স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে নারীদের বৈধব্য জীবনে কঠোর সংযম মেনে চলার বিধান দেওয়া হয়েছে। পুত্রহীনা বিধবার স্বামীর সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারের কথা যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু ও কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে কিছু স্মৃতিশাস্ত্র ও গ্রন্থে বিধবা বিবাহের ইঙ্গিত রয়েছে। অমরসিংহের অমরকোষে কেবল পুনর্বিবাহিতা বিধবা ('পুনর্ভু') ও তার স্বামীর উল্লেখ আছে তাই নয়, ঐ বিধবাকেই পরবর্তী স্বামীর প্রধানা স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাৎসায়ন অবশ্য 'পুনর্ভু'কে বিবাহিতা স্ত্রীর সামাজিক মর্যাদা দানের বিরোধিতা করেছেন। যাইহোক, বৈধব্য জীবনের অস্তিত্ব থাকলেও গুপ্তযুগে সতীদাহ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না, তা বলা যায় না। বস্তুতঃ সতীদাহের প্রথম নিশ্চিত প্রমাণ গুপ্তযুগেই পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এরাণ শিলালেখ-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ যুগের অন্যতম স্মৃতিশাস্ত্রকার বৃহস্পতি বিধবাদের সতী হবার নির্দেশ দিয়েছেন। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় সতীপ্রথার প্রশংসা করেছেন। সতী কথার আক্ষরিক অর্থ পুণ্যবতী

গ্রন্থাদিতেও ব্রহ্মবাদিনী নারীদের উল্লেখ আছে। গানের সংকলন, থেরিগাথা ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের রচনা। জৈনগ্রন্থে কৌশাম্বী রাজকন্যা জয়ন্তীর কথা আছে, যিনি ধর্ম ও দর্শনচর্চার জন্য আজীবন অবিবাহিতা ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ও নাটক রচয়িতা হিসাবে ও নারীরা ছিলেন। তৎকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে কিছু নারী চরিত্র আছে, যারা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন ও সঙ্গীত রচনা করতে পারতেন।

নারীদের ধর্মীয় অধিকার, সীমাবদ্ধ হলেও, ছিল। অশোকের লেখ থেকে নারীদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়। একটি লেখতে অশোকের দ্বিতীয়া পত্নী কারুবাকির ধর্মীয় দানের উল্লেখ আছে। সংঘমিত্রা মহেন্দ্রের সাথে সিংহলে ধর্মপ্রচারে গিয়েছিলেন। সাতবাহন বংশের বিধবা রানী গৌতমী বলশ্রীর ধর্মীয় জীবনের কথা নাসিক প্রশস্তিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের যুগে সাধনার বিভিন্ন পথে নারীদের গতিবিধি দেখা যায়। পুরুষদের মতো নারীরাও সংসারধর্ম পালন করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারতেন। শেষজীবনে ধৃতরাষ্ট্রের সাথে গান্ধারীও বনে গিয়ে তপস্যা করেন। সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণও বানপ্রস্থ আশ্রয় করেছিলেন। নারীদের এই তপস্যার অধিকার জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যেও অব্যাহত ছিল। থেরীগাথায় বহু নারীর নানা বিষয়ে গভীর সাধনা ও বিদ্যার পরিচয় মেলে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনীতিতেও নারীরা অংশগ্রহণ করতেন। রাজমহিষীগণ তাঁদের নাবালক পুত্রদের হয়ে রাজকার্য পরিচালনা করছেন, এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সাতবাহন বংশীয়রা নাগনিকার নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নারীদের সামরিক ঐতিহ্যও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ সালে মেগেসা অবরোধকালে ভারতীয় নারী যোদ্ধার কথা কার্টিয়াস উল্লেখ করেছেন। মেগাস্থিনিস খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নারী রক্ষিবাহিনীর কথা বলেছেন। আর্যশাস্ত্রে এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়।

যাইহোক, প্রাচীন বৈদিক যুগে নারীদের যে কিছু অধিকার ছিল, তা এ যুগে খর্ব হয়। স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ বিশেষত মনুস্মৃতিতে তার নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায়। নারীর স্বাধীন সত্ত্বা স্বীকার করা হয়নি। তাঁকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা পরিবারের অধীন করা হয়। নারীদের প্রধান দায়িত্ব ছিল বিবাহ, স্বামী সেবা এবং সন্তান পালন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নারীদের ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে ঠিকই তবে তা সামগ্রিকভাবে নারী সম্পর্কে পুরুষ প্রধান সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করতে পারেনি।

৭.৪.১.৪ : গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগ

মনুসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতিশাস্ত্রগুলির অনুশাসন গুপ্ত যুগেও প্রচলিত ছিল। কিছু পরিবর্তন অবশ্যই দেখা যায়। বাৎস্যায়নের কামসূত্র (খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক), বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা (খ্রীষ্টীয় পঞ্চ ম-ষষ্ঠ শতক), বৃহস্পতি ও কাত্যায়নস্মৃতি, এ যুগের সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাসের কাব্য ও নাটক ইত্যাদি থেকে নারীর স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়।

কৌশোরের পরে নারীর বিবাহ বাধ্যতামূলক বলে গণিত হতে থাকে। মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে যে নারীর পক্ষে বিবাহ হল উপনয়ন, পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস বং পতিসেবা হল বেদাধ্যয়ন।

মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণ করে আটরকম বিবাহের কথা বলেছেন — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ। এই আটরকম বিবাহের মধ্যে প্রথম চাররকম বিবাহকে ধর্মীয় বিবাহ মনে করা হত। বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ এই বিবাহগুলিতে ছিল না। গান্ধর্ব বিবাহের একটি বিশেষ রূপ ছিল স্বয়ম্বর প্রথা। মহাকাব্যদুটিতে এর কয়েকটি উদাহরণ আছে —যেমন সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী ও রাম-সীতার বিবাহ। নিয়ারবাসের বক্তব্যে স্বয়ম্বরের আভাস আছে। অবদান শতকের কাহিনীতেও এক ধরনের স্বয়ম্বরের উল্লেখ আছে। এ থেকে তখনও বিবাহের ক্ষেত্রে নারীরা কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা পেত — তা বোঝা যায়।

নারীদের দৈহিক পবিত্রতাকে ক্রমশ খুব বড় করে দেখা হত বলে বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা নিয়োগ প্রথাকে উৎসাহিত করা হত না। তবে এগুলি একেবারে অপ্রচলিত হয়ে পড়েনি। নিয়োগ প্রথার অনেক উদাহরণ মহাভারতে আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ স্বীকার করে নিলেও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য, বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত দেননি, যদিও কৌটিল্য, পরাশর স্মৃতি, অগ্নিপুরাণে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে অনুমোদন আছে। মহাভারত ও গ্রীক লেখকদের রচনায় বিধবাদের সহমরণ প্রথার উল্লেখ আছে। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রথা অনুমোদিত নয়। মনু স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাকে আত্মসংযমী ও শুদ্ধ জীবন যাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারের কথাও কৌটিল্য বলেছেন। স্বামী বর্তমানেও স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্ত্রকাররা অনুমোদন করেছেন। মনু একস্থানে বলেছেন যে, কোন নারীর প্রথম স্বামীর সন্তান ও দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান থাকলে, প্রথমোক্তগণ প্রথম স্বামীর এবং দ্বিতীয়োক্তগণ দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না থাকলে উভয়ের মধ্যে আইনত বিবাহ-বিচ্ছেদের কথাও বলেছেন।

স্মৃতির যুগে, মনুর সময়ে নারীদের শিক্ষার অধিকার অনেকটা সংকুচিত দেখা যায়। মনু বলেছেন নারীদের বেদমন্ত্র দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বৈবাহিক বিধিই তাঁদের বৈদিক সংস্কার। যজ্ঞে নারীরা চালক হতে পারেন না বা তাঁরা যজ্ঞে আহুতি দিতে পারেন না। তবে মনু অন্যত্র বলেছেন পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি কন্যাকেও একইরকম শিক্ষা দিতে হবে — "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"— এবং অতি যত্নে পালন করতে হবে। মহাভারত নারীদের কোথাও কোথাও 'অশাস্ত্রা' বললেও বহুস্থলে নারীদের শিক্ষাদীক্ষার কথা বলেছেন। মহাভারতে দ্রৌপদীকে 'পণ্ডিতা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শান্তিপর্বে তাঁকে ধর্মজ্ঞা ও ধর্মদলিনী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কুন্তী বৈদিক মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেছিলেন। ধর্মপ্রাণা গান্ধারীর নীতিশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান ছিল। তাছাড়া শাণ্ডিলী, অরুন্ধতী, সুলভা, গৌতমী প্রমুখের কথা পাওয়া যায়, যাঁরা জ্ঞানে, ধর্মে ও তপস্যায় অধিকারিনী ছিলেন। ক্ষত্রিয়কন্যা বিদুলাও বহু বেদ অধ্যয়ন করে তপস্বিনী হয়েছিলেন। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ১৩৩ থেকে ১৩৬ পর্যন্ত পুরো চারটি অধ্যায়েই তাঁর বীরবাণী রয়েছে। বৌদ্ধ এবং জৈন

উচ্চশিক্ষা থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়। এমতাবস্থায় অনিবার্যভাবেই বৈদিকযুগের শেষ পর্বে নারী মর্যাদার অবনমন ঘটেছিল।

৭.৪.১.৩ : মৌর্য এবং মৌর্যোত্তর যুগ

এই সময়ের সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রধানত গ্রীক উপাদান, অর্থশাস্ত্র, অশোকের লেখ, পাণিনি ও পতঞ্জলির ব্যাকরণ গ্রন্থ, দুইটি মহাকাব্য, বৌদ্ধ, জৈন ও সংস্কৃত সাহিত্য, বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। এই উপাদানগুলি সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হওয়ায়, সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে এগুলি মিশ্র ধারণা তুলে ধরেছে।

এই সময়ের ধর্মশাস্ত্রগুলিতে দেখা যায় যে, বৈদিক যুগের প্রথমদিকে নারীদের যে উপনয়ন সংস্কার হত, তা কালক্রমে বন্ধ হয়ে গিয়েছে, বেদপাঠের অধিকারও তাঁরা হারিয়েছেন। ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিধান অনুযায়ী বিবাহই ছিল নারীদের একমাত্র সংস্কার। সাধারণত পিতা অথবা তাঁর অবর্তমানে অন্য অভিভাবক কন্যার বিবাহের আয়োজন করতেন। পাত্র-পাত্রীকে একই বর্ণের, কিন্তু ভিন্ন গোত্র এবং প্রবরের হতে হত। অভিভাবক কন্যার বিবাহ দিতে না পারলে, কিংবা কন্যা যদি অভিভাবকহীন হতেন, তাহলে মনু এবং মহাভারত অনুসারে সেই কন্যা স্বয়ং পাত্র নির্বাচন করতে পারতেন। বৌধায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে যে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা তিন বছর পিতৃ শাসনের প্রতীক্ষা করবেন, এরপর নিজেই উপযুক্ত পতি গ্রহণ করতে পারবেনা। বোধায়ন ধর্মসূত্র বিবরণকার গোবিন্দ স্বামী এটিকে স্বয়ম্বর অধিকার বলেছেন। যেখানে গুরুজন কন্যাকে বিবাহ দিতে সচেষ্ট নন, সেখানে বোধায়ন ধর্মসূত্র কন্যাকে শুধু পতি নির্বাচনের অধিকারই দেয়নি, সুযোগ্য পতি না-পাওয়া গেলে অল্পগুণ সম্পন্ন পতিবরণ করার অধিকারও দিয়েছেন। অথচ এই বোধায়ন ধর্মসূত্রই কৌমারে পিতাকে, যৌবনে স্বামীকে, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রকে নারীর অভিভাবকত্ব দিয়েছেন এবং নারীকে স্বাধীনতা না দেবার ব্যাপারে মনুর সাথে সহমত পোষণ করেছেন।

মহাকাব্যদ্বয়ে মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বিবাহের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয় রমণী দ্রৌপদী, কুন্তী, উত্তরা এবং ব্রাহ্মণ রমণী দেবযানী, তার অন্যতম উদাহরণ। তবে ধর্মশাস্ত্রসমূহে মেয়েদের বিবাহযোগ্য বয়স কমিয়ে আনা হয়েছে — এমনকি বয়ঃসন্ধির পূর্বেই বিবাহের কথা বলা হয়েছে। মনুস্মৃতিতে এর সমর্থন রয়েছে। তবে মনু এও বলেছেন যে, সুযোগ্য পাত্র না পেলে কন্যার আজীবন পিতৃগৃহে বাস করা সমীচিন। যাজ্ঞবল্ক্য যৌবনলাভের পূর্বে মেয়েদের বিবাহের কথা বলেছেন। অন্যদিকে পরবর্তীকালের নারদস্মৃতিতে প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের বিবাহের কথা বলা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যেও এ ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়। অনেকের মতে, স্মৃতিশাস্ত্রে অল্প বয়েসে মেয়েদের বিবাহের যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা শুধু ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? যাইহোক গুপ্ত-পূর্ব যুগে, এই প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করেনি ও প্রাপ্ত এবং অপ্রাপ্ত, দুই বয়সের মেয়েদেরই বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা এ সময় ছিল স্বল্প। ক্রমে

মধ্যে অনেকেই ছিলেন শ্লোক রচয়িতা। এঁরা শাস্ত্র অধ্যাপনার সাথেও যুক্ত ছিলেন। ঋগ্বেদে আচার্যা-র উল্লেখ রয়েছে। পাণিনিতে আচার্যা, উপাধ্যায়া শব্দের বুৎপত্তিতে অধ্যাপনায় রত নারীর উল্লেখ আছে। কালিকাভাষ্যে কালকৃৎস্না ও আপিললার নাম উল্লিখিত হয়েছে মীমাংসা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ছিলেন বলে। উচ্চশিক্ষিতা নারী বলে বাক্, গার্গী, মৈত্রেয়ী, শাশ্বতীও পরিচিত ছিলেন। এদের পাশাপাশি ছিলেন সদ্যোদ্বাহ নারীরা, যাঁরা বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যয়ন করতেন। তবে কিছু নারী শিক্ষার সুযোগ পেলেও, বৈদিক সাহিত্যের বিশেষত পরবর্তী যুগের নজির দেখলে বোঝা যায় যে নারীর শিক্ষার অধিকার ক্রমেই সংকুচিত হয়ে এসেছে। এই কারণে তৈত্তিরীয় আরণ্যক শিক্ষিতা নারীর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে নারী হয়েও তারা পুরুষ। এখানে পরোক্ষভাবে এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে শিক্ষা ব্যাপারটি একান্তভাবে পুরুষদের। সুতরাং বৌদিক যুগের একেবারে প্রথম পর্বের পরে শিক্ষাতেও নারীর অধিকার কমে যায়। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদে উপনয়নে নারীর অধিকার না থাকায় নিজে মন্ত্র উচ্চারণে বা হব্যদানেও নারীর অধিকার ছিল না। যেহেতু শাস্ত্রচর্চা মন্ত্র দিয়ে করতে হতো, শাস্ত্রচর্চাও নারীর পক্ষে করা সম্ভব হতো না। অনুমান করা যেতে পারে অমন্ত্রক বিদ্যা অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রশিল্প ইত্যাদি কিছু নারী চর্চা করতেন, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যা থেকে নারী বঞ্চিত ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদূষী কন্যা লাভের জন্য পিতামাতার আচরণীয় অনুষ্ঠানের কথা আছে ঠিকই, কিন্তু তা ব্যতিক্রম -- সামগ্রিক চিত্র নয়। ঋগ্বেদের সময়ে নারী জনসভায় অংশগ্রহণ করতেন, পরবর্তীকালে তা ছিল না। মৈত্রায়নী সংহিতায় বারবার বলা হয়েছে যে নারীর সভায় যাবার অধিকার নেই - ধন অর্জন বা স্বাধীনভাবে ভোগ করার অধিকারও তাঁর নেই। মৈত্রায়নী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, নারীর নিজের সম্পত্তি থাকত না, পিতা বা স্বামীর ধনে তার কোন অধিকারও স্বীকৃত ছিল না। স্বনির্ভর জীবন ধারণের উপযোগী কোন বৃত্তির শিক্ষা নারী লাভ করতে পারতেন না। ফলে বেঁচে থাকার জন্য তাকে পিতা, স্বামী বা পুত্রের অধীনে থাকতে হতো। বশিষ্ঠ ধর্মসূত্রের মতে, নারীকে কুমারী অবস্থায় রক্ষা করবেন পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্ররা। অর্থাৎ নারীর স্বাতন্ত্রের অধিকার এখানে স্বীকার করা হয়নি, সব অবস্থাতেই সে পুরুষের অধীন। যদিও ঋগ্বেদে যোদ্ধা নারীদের (যেমন মুদ্যালিনী, বিশপনা, বধ্রিমতী) কথা পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের প্রথম যুগের পরে প্রকাশ্য সমাজ জীবনে নারীকে আর দেখা যেত না। নারীকে শুধুমাত্র অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এজন্য নারীকে বলপূর্বক দমন করার নির্দেশ রয়েছে শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদে।

সুতরাং ঋগ্বেদের সময়ে নারীদের যে স্থান বা মর্যাদা ছিল, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে নারী যে স্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। নারীকে সর্বতোভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অধীন করে রাখা হয়েছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে, সর্বগুণান্বিতা শ্রেষ্ঠ নারীকেও অধমতম পুরুষের থেকে হীন আখ্যা দেওয়া হয়। নারীকে সন্তান তথা পুত্রের জননী এবং ভোগ্যবস্তু হিসাবে দেখা হতে থাকে। ভোগবস্তু হিসাবে নারীকে দক্ষিণার তালিকায় রাখা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নারীর ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর পরাধীনতা ছিল। শিক্ষা, বিশেষত

নারীর উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে, স্ত্রী হলেন স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, ব্রাহ্মণ সমূহে স্ত্রীর সঙ্গে 'পত্নী' শব্দটির নিয়মিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যা থেকে বোঝা যায় যে, স্বামীর জীবনে সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে স্ত্রী সমান অংশীদার ছিলেন। কিন্তু ধর্মাচরণে নারীর কোন স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়নি। গৌতমধর্মসূত্রে বলা হযেছে "অস্বতন্ত্রা ধর্মে স্ত্রী"। অন্যদিকে স্বামীর ধর্মাচরণেও স্ত্রী ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। যজ্ঞে স্বামীর পাশে পত্নী থাকতেন ঠিকই, তবে নিষ্ক্রিয়ভাবে। নারীর উপনয়ন নেই বলে, তার হোম করার অধিকার ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে যদিও বলা হয়েছে যে যজ্ঞের পূবার্ধ যজমান, উত্তরার্ধ যজমানপত্নী, কিন্তু যজমানপত্নী যজ্ঞে কোন অংশগ্রহণ করার অধিকারী ছিলেন না।

বস্তুতঃ পরবর্তী বৈদিক সমাজে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও সামাজিক বিবর্তনের কারণে, জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। গোষ্ঠী (tribe) ও কৌমে (clan) বিভক্ত সমাজ-এর পরিবর্তে যৌথ ও বৃহৎ পরিবারই সমাজের প্রাথমিক সংগঠন হিসাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসবের সাথে উৎপাদন ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি যখন প্রধান হয়ে উঠল, তখন নারীকে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস দেখা গেল। উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছিল। কৃষির প্রসারে বলদ ও লাঙলের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় শারীরিক কারণে নারী প্রত্যক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনে থাকতে পারতেন না। বস্ত্রবয়ন ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনেও নারীর ভূমিকা ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ে। গৃহকর্ম ভিন্ন কোন বৃত্তি কুলনারীর ছিল না। যে দু-একটি কাজের উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল বয়ন। গৃহকর্মে স্ত্রীর পরিশ্রম ও দায়িত্ব যথেষ্ট থাকলেও যেহেতু তিনি স্বয়ং অন্ন উৎপাদন করেন না বা অর্থ উপার্জন করেন না, তাই তাকে 'ভার্যা' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা ভরণীয়া হিসাবে উল্লেখ করা হতে থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর গতিবিধি, বৈবাহিক ও ব্যক্তিজীবন নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে পরিবারের স্বার্থে। নারীর বহুপতিত্ব সমাজে নিষিদ্ধ হয়ে যায় কারণ তাতে সন্তানের পিতৃপরিচয় অনিশ্চিত থেকে যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে নারীর দ্বিপতিত্ব নিষিদ্ধ করা হয় ও অন্যদিকে পুরুষকে দুটি স্ত্রী গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে এক পুরুষের বহু পত্নীর কথা বলা হয়েছে। আর যজুর্বেদের সময় থেকেই রাজারা বৈধভাবেই চারজন পত্নী রাখতে পারতেন। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র অনুসারে পত্নীর প্রধান প্রয়োজন হল সে সন্তানের জননী এবং তার প্রধান কর্তব্য হল পুত্রসন্তানের জন্ম দেওয়া। তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে কোন মানসিক বা সামাজিক কারণে নয়, সন্তানজন্মের জরুরি প্রয়োজনেই নারী পুরুষের অপরাধ। ঋগ্বেদের যুগে কিছু নারী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলেও পরবর্তীকালে সে সুযোগ আরও সংকুচিত হয়ে আসে। ঋগ্বেদে কিছু ঋষিকার নাম পাওয়া যায় যেমন, বিশ্ববারা, ঘোষা, অপালা ও গোধা। এঁরা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ঋষিপদ অর্জন করেছিলেন। শ্লোক রচনার পাশাপাশি বিশ্বঝরা ঋত্বিক রূপে যজ্ঞে আহুতি দেবারও অধিকারী ছিলেন। শিক্ষিতা নারীর মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। ব্রহ্মবাদিনী নারীরা শাস্ত্র ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী ছিলেন। এঁদের

উত্তরাধিকারী হিসেবে পরিগণিত হওয়ায় পুত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তবে কন্যাসন্তান একেবারে অবহেলিত ছিল না। কন্যা সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল ও তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিবাহে আবদ্ধ হতেন। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বা শিশুবিবাহের কথা ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। উপযুক্ত বয়স হলে নারীরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন — স্বামী নির্বাচনে তাদের স্বাধীনতা ছিল। পরবর্তীকালে বিবাহ যেমন নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল ঋক-বৈদিক যুগে তা ছিল না, তবে নারী-পুরুষের বিবাহ কাম্য ছিল। ঋক-বেদের দশম মণ্ডলে বিবাহের যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা থেকে বোঝা যায় যে, নারী ও পুরুষ পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ প্রচলিত ছিল। বিবাহে কন্যাপণের কথা পাওয়া যায়। যুক্তিবদ্ধ বিবাহের আভাসও ঋগ্বেদে আছে। বিবাহ বহির্ভূত নারীপুরুষের প্রেম ও মিলনের উল্লেখ কিংবা নারীর ইচ্ছাক্রমে বা অনিচ্ছাক্রমে নারীহরণের কথাও ঋগ্বেদে মধ্যে মধ্যে আছে।

বিবাহিতা নারী গৃহে উচ্চসম্মানের অধিকারী ছিলেন— তাঁকে কল্যাণী ও পবিত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে সহমরণ বা সতীদাহের উল্লেখ নেই। বিধবা বেঁচে থাকতেন কখনও দেবরের সাথে তার বিবাহ হত, কখনো আর বিয়েই হত না। দেবর ছাড়া অন্যকেও বিবাহের কথাও পাওয়া যায়। সুতরাং সহমরণ, এমনকী কঠোর বৈধব্যযাপন ঋগ্বেদে দেখা যায় না। তবে ঋগ্বেদের প্রথমাংশ রচনার পরে, যে কারণেই হোক না কেন, অথর্ব বেদে সহমরণের কথা পাওয়া যায়। এখানে জীবিত নারীকে মৃতের বধূ হতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া এই প্রথাকে প্রাচীন রীতি বলেও বলা হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে এই প্রাচীন রীতি কথাটির অর্থ হল প্রাগার্য সময় থেকেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল, যা বৈদিক সমাজে প্রবেশ করে, কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় অন্য সভ্যতাগুলিতে সহমরণের কথা পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও বিধবা নারীর জীবিতাবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অথর্ববেদে নারীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা রয়েছে। তবে বিধবা বেঁচে থাকলেও তাঁর জীবন সর্বদা সুখের হত না। এই কারণে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কোন নারীকে প্রার্থনা করতে দেখা যায় যে তিনি যেন ইন্দ্রানির মত অবিধবা হন।

নারী ও পুরুষের একাধিক বিবাহ ঋগ্বেদের যুগ থেকে প্রচলিত ছিল। পুরুষের বহুবিবাহের ফলে নারীর সপত্নী যন্ত্রণা স্বাভাবিকভাবেই বিরাজমান ছিল। এজন্য ঋগ্বেদের কয়েকটি সূত্রে সপত্নী কণ্টক উদ্ধারের জন্য নারীকে দেবতাদের দ্বারস্থ হতে দেখা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদেরও বহুবিবাহ হত। অথর্ববেদে উল্লেখ রয়েছে যে কোন নারীর দশটি পতি থাকলেও, যখন ব্রাহ্মণের পত্নী হয় তখন সেই ব্রাহ্মণই তার পতি, রাজন্য বা বৈশ্য পতিরা পতি নয়। যদিও এই উল্লেখের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ পুরুষের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা, তবে কোন নারীর পক্ষে দশটি স্বামী গ্রহণের স্বীকৃতিও এতে আছে।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন স্তোত্র থেকে নারীর অবস্থান ও অধিকার সম্বন্ধে যা জানা যায়, তা থেকে ঋগ্বেদ উত্তর পর্বে অবনমন হয়েছিল বলে মনে হয়। এটা ঠিকই যে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে

৭.৪.১.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) বৈদিকযুগে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান এবং মর্যাদা।

(২) মৌর্য যুগ ও গুপ্ত যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা।

(৩) প্রাচীন ভারতে নারীর সম্পত্তির অধিকার।

৭.৪.১.১ : ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে সমাজব্যবস্থা, বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। প্রাচীন যুগের সমাজব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান ও মর্যাদা ও নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে বিবর্তিত হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের প্রাথমিক পর্বে নারীরা, পুরুষদের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করত। কৃষিকার্য, পশুপালন, মৃৎপাত্র তৈরী, বয়ন শিল্প প্রভৃতিতে নারীদের ভূমিকা ছিল কখনও একক, কখনও তা পুরুষের পাশে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তনের প্রকৃতি আলোচনার মাধ্যমে আমরা এই সময়ের নারীদের প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান এবং মর্যাদা সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি।

৭.৪.১.২ : বৈদিক যুগ

বৈদিক যুগ বলতে সাধারণতঃ যে যুগে বৈদিক সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তাকেই বোঝায়। এ সাহিত্য প্রধানত সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ নিয়ে গঠিত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের সমন্বিত রূপ হল বেদ। বেদের সহায়ক গ্রন্থগুলি হল সূত্র বা বেদাঙ্গ। প্রাচীনতম বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতক থেকে দশমের শেষ বা নবমের শুরুর রচনা বলে মনে করা হয়। ঋগ্বেদে সরাসরি নারীর স্থান সম্বন্ধে বিশেষ কোন উক্তি নেই, তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে নারীর মর্যাদা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে।

ঋক-বৈদিক সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল সব থেকে ক্ষুদ্র সামাজিক একক অর্থাৎ পরিবার। এই পরিবারগুলি সাধারণত ছিল বৃহদায়তন যৌথ পরিবার, যার অভিভাবক ছিলেন কর্তা বা পিতা। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার হওয়ায় পুত্র-সন্তান, কন্যা সন্তান অপেক্ষা অধিক কাম্য ছিল। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পরিবারের দায়িত্বভার লাভ করতেন। রীতি অনুসারে পুত্র, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের অধিকারী ও সম্পত্তির

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

CUSTOMARY AND LEGAL STATUS

একক - ১

প্রাচীন ভারতে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান এবং মর্যাদা

Customary and Legal status of Women in Ancient India

বিন্যাসক্রম :

৭.৪.১.০ : উদ্দেশ্য

৭.৪.১.১ : ভূমিকা

৭.৪.১.২ : বৈদিক যুগ

৭.৪.১.৩ : মৌর্য এবং মৌর্যোত্তর যুগ

৭.৪.১.৪ : গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগ

৭.৪.১.৫ : প্রাচীন ভারতে নারীদের সম্পত্তির অধিকার

৭.৪.১.৬ : মধ্যযুগে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অবস্থান ও মর্যাদা

৭.৪.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৭.৪.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী